যেন ভুলে না যাই

॥ পরিবেশক ॥
পপুলার লাইব্রেরী
১৯।১বি, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

॥ বাংলা অনুবাদ ॥

যেন ভুলে না যাই

॥ ইংরাজী সংস্করণ ॥

Lest we Forget

অ্যাদল্ফ্ রুদ্নিচ্কি কর্তৃক
সম্পাদিত। ওয়ারশস্থিত
পোলোনিয়া বৈদেশিক ভাষার
প্রকাশনাভবন কর্তৃক প্রকাশিত
এবং পোলাণ্ডে মুদ্রিত

॥ প্রকাশক ॥

নির্মল বোস
নির্মল বোস এণ্টারপ্রাইজ
২৭।এ জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোড
কলিকাতা-২০

॥ মুদ্রাকর ॥

শ্রীহেমন্তকুমার পোদ্দার
পোদ্দার প্রিন্টার্স
৪এ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

গ্রন্থ পরিচিতি

শ্রীনির্মল বসু ১৯৫৩ এবং ১৯৫৫ সালে ইউরোপের পূর্ব ও পশ্চিমের কিছু কিছু দেশ ও নয়াচীন ইত্যাদি পরিভ্রমণ করিয়াছেন। অর্থাৎ আধুনিক ইউরোপ সম্পর্কে মোটামুটি তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। দুই মাস কাল তিনি পোল্যাণ্ডে ছিলেন এবং সেই সময় পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পোল্যাণ্ডের কি ভয়াবহ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা আমাদের দেশে অনেকেরই জানা নাই। নাৎসী অধিকৃত পোল্যাণ্ডে হিট্‌লারী জহ্লাদেরা বিভিন্ন বন্দীশালায় যেভাবে লক্ষ লক্ষ পোলিশ নরনারীকে হত্যা করিয়াছে, মানুষের ইতিহাসে তার কোন নজীর নাই। শ্রীনির্মল বসু সম্পাদিত "যেন ভুলে না যাই" অনুবাদ গ্রন্থে সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমি নিজেও কিছু তথ্যানুসন্ধান করিয়াছিলাম এবং পশ্চিমবঙ্গের শান্তি সংসদের মুখপত্র 'আন্তর্জাতিক'-এর ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ সংখ্যায় পোল্যাণ্ড সম্পর্কে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধ হইতে পোল্যাণ্ডের উপরে ফ্যাসিষ্ট অত্যাচার সম্পর্কে আমি উদ্ধৃতি দিতেছি। কারণ, ইহা দ্বারা অত্যাচারের কিছুটা নমুনা পাওয়া যাবে:—

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ডের যে ভাগাভাগি হইয়াছিল, তাহা বেশীদিন কার্যকরী ছিল না। কারণ ১৯৪১ সালের ২২শে জুন জার্মানী এই সীমান্ত ধরিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড অভিযান চালাইল; তার ফলে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সমস্ত পোল্যাণ্ড জার্মানীর দখলীকৃত ও পদানত রহিল। কিন্তু কেবল পদানত নয়, পোল্যাণ্ডকে যেভাবে ধ্বংস করার চেষ্টা হইয়াছে, তার তুলনা নাই। রাজধানী ওয়ারশ' যাহা ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির

একদা পীঠভূমি ছিল এবং বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতকার, ভাস্কর ও দেশপ্রেমিকের জন্মদান করিয়াছিল, তার অস্তিত্ব পর্যন্ত গুঁড়া গুঁড়া করিয়া ধূলায় মিশাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে আধুনিক 'বিজ্ঞান সম্মত' পদ্ধতি ও পরিকল্পনার দ্বারা। পশ্চিম ইউরোপের সুপ্রীম কম্যাণ্ডার জেনারেল আইসেনহাওয়ার (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে) ১৯৪৫ সালে ওয়ারশ' পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "জীবনে আমি ওয়ারশ'র মত শোচনীয় (ট্রাজিক) কিছু দেখি নাই।" প্রাচীন যুগের ইতিহাসে একমাত্র কার্থেজ ধ্বংসের সঙ্গেই ইহার তুলনা করা যাইতে পারে, অথবা বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পাই নগরী ধ্বংসের কথা মনে করা যাইতে পারে।

কিন্তু একমাত্র নগর, জনপদ ও জীবন ধারণের অজস্র উপকরণ ধ্বংসই বিবেচ্য নয়। তার চেয়েও সহস্রগুণ বীভৎস ব্যাপার ঘটিয়াছে পোল্যাণ্ডে—মানুষের ইতিহাসে যার কোন নজীর নাই। পোল্যাণ্ডের বৈষয়িক ক্ষতির পরিমাণ মোটামুটি স্থির হইয়াছে— ১২৫০ কোটি পাউণ্ড! এক পাউণ্ডের বিনিময় মূল্য ১৩।৶০ আনা ধরিলে অঙ্কটা আকাশের অগণিত গ্রহনক্ষত্র ছাড়াইয়া যাইবে। কিন্তু অগণিত নরহত্যার কি কোন নৈতিক বা বৈষয়িক মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায়? এবং সেই হত্যাও এমন পৈশাচিক ভাবে করা হইয়াছে যে, সেই কাহিনী সুস্থ চিত্তে পাঠ করা পর্যন্ত কঠিন!—গা রী রী করিতে থাকে, একটা অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা হৃদয়বান পাঠককে আচ্ছন্ন করে। ইংরাজীতে এই হত্যাকাণ্ডকে বলা হইয়া থাকে 'জেনোসাইড' কিম্বা পাইকারি গণ-হত্যা। ১৯৩৯ সালের সমগ্র পোলিশ জন সংখ্যার শতকরা ২২.২ ভাগ হত্যা করা হইয়াছে। যদি যুদ্ধরত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই হারে হত্যাকাণ্ড ঘটিত, তবে, মৃতের সংখ্যা দাঁড়াইত ৩ কোটি ৮০ লক্ষের অধিক! যুদ্ধের উন্মত্ততায় পোল্যাণ্ড আক্রমণের সময় এই পাইকারি হত্যা ঘটে নাই, মোট নিহতের শতকরা মাত্র ৫ ভাগ রণক্ষেত্রে প্রাণ হারাইয়াছে। কিন্তু দেশ দখলের পর ধীরেসুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হইয়াছে একমাত্র ওয়ারশ

শহরের ১৩ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৭ লক্ষকে খুন করা হইয়াছে। জার্মান অধিকৃত পোলিশ অঞ্চলের ২ কোটি ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৬০ লক্ষ লোককে সাবাড় করা হইয়াছে। একমাত্র জার্মান সৈন্যবাহিনীর কায়িক পরিশ্রমের কাজে কর্মে লাগিতে পারে এমন মানুষ ছাড়া আর বাকী যাকে ধরিতে পারা গিয়াছে, তাকেই হত্যা করা হইয়াছে। বিশেষভাবে বাছিয়া আবার ইহুদী এবং বুদ্ধিজীবীদিগকে মারা হইয়াছে। ৩৫ লক্ষ পোলিশ ইহুদীর মধ্যে ৩২ লক্ষ ইহুদীকেই হত্যা করা হইয়াছে। আজ পোল্যাণ্ডে ইহুদীর সংখ্যা মাত্র ৭০।৮০ হাজারের মধ্যে। "কোন ইহুদীর বাঁচার অধিকার নাই, পোলিশ জাতির বাঁচার অধিকার নাই এবং কোন পোলিশ বুদ্ধিজীবীরও বাঁচিবার দাবী নাই"— এই ধরণের শ্লোগান বিভিন্ন নাৎসী অধিনায়ক ঘোষণা করিয়াছিল।

কিন্তু এই গণ-হত্যাও আবার কেবল গুলিতে ফাঁসিতে ঘটে নাই। নাৎসী বর্বরতার অভাবিতপূর্ব পৈশাচিক প্রক্রিয়ারূপে এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। যে কোন রকমের পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকা ও শিশুকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হইয়াছে। পোল্যাণ্ডের ইতিহাসে Ghetto এবং Auschwitz (পোলিশ ভাষায় Oświecim)—এই নাম দুইটি চিরকাল আতঙ্ক সৃষ্টি করিবে। ফ্যাসিষ্ট ক্রূরতার সর্বাধিক উগ্রতা দেখা গিয়াছে এই দুইটি তাঁবুতে বা বন্দীশালায়। মেয়েরা যেমন রন্ধনশালার জ্বলন্ত উনুনের উত্তপ্ত কড়াইতে বেগুন বিম্বা মাছ ভাজে তেমন করিয়া দলে দলে হাজার হাজার মানুষকে একত্রে ফার্ণেসে ফেলিয়া গ্যাস চেম্বারে ঢুকাইয়া জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছে, কিম্বা শ্বাস রোধ করিয়া মারা হইয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে যেন খেলাচ্ছলে পাখী মারার মত গুলি করিয়া মারা হইয়াছে, কিম্বা নর্দমার ম্যানহোলের মধ্যে জীবন্ত ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হত্যার আগে দলে দলে স্ত্রীলোকদিগকে সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ করিয়া স্নান করানো হইয়াছে এবং তারপর সেই অবস্থায় সন্তান ক্রোড়ে "নবজীবনের সন্ধানে" লইয়া যাওয়া হইয়াছে বন্দীশালার উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে এবং সেখানে বিবস্ত্রা স্ত্রীলোকদিগের উপর হিংস্র শিকারী

কুকুর লেলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গগনবিদারী আর্তনাদে যখন বাতাস পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিয়াছে, তখন নাৎসী অফিসারেরা ধীরে সুস্থে তাহাদিগকে রুদ্ধদ্বার কক্ষে পুরিয়া গ্যাসের সাহায্যে শ্বাস রোধ করিয়া মারিয়াছে। মৃতের স্তূপের আড়াল হইতে দৈবক্রমে কোন বালিকা বাহির হইয়া আসিলে জার্মান ডাক্তাররা তাহাকে খাদ্য ও ঔষধ দিয়া চাঙ্গা করিয়া তুলিয়াছে এবং তারপর বন্দুকের গুলি দিয়া তাকে হত্যা করা হইয়াছে। যুবতী মেয়েদের সমস্ত লজ্জা ও আবরণ কাড়িয়া নিয়া তাদের যৌন অঙ্গের অভ্যন্তরে গ্যাসোলিন্ সিক্ত 'সাপোজিটার' ঢুকাইয়া দিয়া স্ত্রী-অঙ্গে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে! (মার্কিণ সাংবাদিক জন্ গান্থারের বর্ণনা)।

মধ্যযুগের নাদির শা বা তৈমুর লঙের সঙ্গে এই প্রকার অবর্ণনীয় বর্বরতার কোন তুলনা হয় না। কারণ, তাদের আমলে এত যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি জানা ছিল না এবং একটা গোটা জাতিকে স্ত্রীলোক ও শিশুসহ সাবাড় করিবার কোন প্ল্যান তাদের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। নাৎসী অফিসার, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞগণ এই পৈশাচিক নারকীয় হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। লাল ফৌজ কর্তৃক পোল্যাণ্ড উদ্ধারের পর অজস্র মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। বড় বড় ট্রাক ভর্তি কর্তিত মুণ্ড কিম্বা ছিন্নাঙ্গ নরনারীর দেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ওয়ারশ'তে অন্তত ৪০ হাজার শব রাবিশের ভিতর হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। আমরা চল্‌তি ভাষায় অত্যাচারের একটা বর্ণনা শুনি 'চামড়া দিয়া ডুগডুগি বাজানো'—সত্য সত্যই হিট্‌লারী এক্সপার্টরা পোলিশ নর-নারীর চামড়া দিয়া আচ্ছাদন তৈয়ার করিয়াছিল। মৃতদেহ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সাবান প্রস্তুত করিয়া (এবং গন্ধযুক্ত সাবান!) জার্মানরা সপরিবারে স্নানের সময় ব্যবহার করিত। যে কোন সভ্য মানুষের কাছে এই সমস্ত কাহিনী আজগুবি মনে হইতে পারে! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই নারকীয় উন্মত্ততা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, ভাষায় যার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নহে।

আমাদের দেশে এখনও হিট্‌লার সম্পর্কে কিছু কিছু মানুষের

উচ্চ ধারণা আছে। কিন্তু এই হিট্‌লারী চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা বুঝা যাইবে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ হইতে। 'আউশ্‌ভিৎস' ক্যাম্পে মোট ৪০ লক্ষ লোককে হত্যা করা হইয়াছে। প্রতিদিন হাজার হাজার লোককে মারা হইত। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসের এক দিনের সংখ্যা সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করে। ঐদিন বন্দীশালার ক্রিম্যাটরিয়ামে ২৪ হাজার মানুষকে পোড়াইয়া মারা হইল। এজন্য হিট্‌লার ক্যাম্পের কম্যাণ্ডাণ্টকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করিয়া সাধুবাদ জানাইলেন—'for distinguished services on the civil front! চিঠিটি এখনও রক্ষিত আছে।

এই বর্বর মনোভাবের কি কোন তুলনা আছে?

উপরের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতেই বীভৎসতার স্বরূপ কিছুটা উপলব্ধি করা চলবে। দৈবক্রমে যে মুষ্টিমেয় নরনারী হত্যাকাণ্ডের নরক হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, তাঁদের নিজেদের মুখের বর্ণনা "যেন ভুলে না যাই" গ্রন্থে পাওয়া যাবে। ফ্যাসিজ্‌ম্‌ ও হিট্‌লারের পৈশাচিক মনোবৃত্তি জার্মাণীর মত জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত একটা জাতিকে কি নিদারুণ অধঃপতনের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল, পোল্যাণ্ডের এই সমস্ত ঘটনা তারই অতি মর্মান্তিক নিদর্শন। পৃথিবীতে যাহাতে আর যুদ্ধ এবং যুদ্ধমঞ্চতে নারকীয় তাণ্ডব না ঘটে, তার জন্য প্রত্যেক চিন্তাশীল নরনারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। আলোচ্য পুস্তকটি পাঠ করিলে সেই থেকে আমরা প্রেরণা পাইব। আন্তর্জাতিক শান্তি আন্দোলন কিম্বা যুব আন্দোলনের যাঁরা কর্ম্মী, তাঁদের কাছে এই পুস্তকের গুরুত্ব ও মূল্য আছে। পুস্তকের অনুবাদ যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। আমি শ্রীনির্মল বসুকে এজন্য সাধুবাদ জানাইতেছি এবং আশা করিতেছি এই বই জনসমাজে সমাদৃত হইবে।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৪.১.৫৭.

মুখবন্ধ

আউশ্‌ভিৎজ আমি যাইনি কিন্তু তারই স্বগোত্রীয় বুকেনভাল্ড টেরেৎসীন, ইত্যাদি নাৎসী কন্‌সেন্ট্রেশন ক্যাম্প আমি দেখেছি এবং ইউরোপে ১০ বছর থাকা কালে বহু লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে যাঁরা কন্‌সেণ্টেশন্‌ শিবিরগুলো থেকে আকস্মিকভাবে বেঁচে ফিরে এসেছেন। এঁরা কেউ ডাক্তার, অধ্যাপক, সাংবাদিক, কেউ বা শ্রমিক বা কৃষক। কেবলমাত্র ইহুদী বলে, বা রাজনৈতিক কারণে, বা নাৎসীবিরোধীতার দরুণ, বা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বা পারস্পরিক কারণে উচ্চপদস্থ নাৎসী কর্মচারীর বিরাগভাজন হওয়ার ফলে বন্দী হয়েছিলেন !

এই রকম বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আলাপ করা ছাড়া স্বচক্ষে দেখেছি বুকেনভাল্ডের ক্যাম্প জার্ম্মানীর ভাইমার সহরের পাশে—যেখান থেকে অতীতে গোয়েটের বাণী প্রচারিত হয়েছে। সেই ক্যাম্পে দেখেছি মানুষ পোড়াবার গ্যাস চুল্লী, ফাঁসী দিয়ে মারবার পরপর সাজানো ফাঁস, মুগুর দিয়ে মাথা ফাটিয়ে মারার মুগুরগুলি এবং মৃতদের দাঁত থেকে সোনা ইত্যাদি মূল্যবান অঙ্গাবরণ খুলে নেবার জন্য টালি দিয়ে বাঁধানো এক বেদী। তাছাড়া সেখানে রয়েছে আর এক ঘর যেখানে বন্দীদের ব্যাঙের মত ত্রিভঙ্গ করে বেত লাগানো হোত এবং পাশের ঘর থেকে জিপ্‌সীগানের কনসার্ট বা বীটোফেনের সিম্ফোনী বাজত পাছে কর্তাদের শান্তির ব্যাঘাত হয় নির্য্যাতিতদের আর্তনাদে। আরো দেখেছি ক্যাম্পের মিউজিয়ামে মানুষের উল্কী বসানো হাতের চামড়ায় তৈরী টেবিলল্যাম্পের শেড, মানুষের চর্বিতে তৈরী সাবান, ইত্যাদি।

নাৎসীদের সুশৃঙ্খলার পরিচয় শুধু হত্যা ও নির্য্যাতনের থেকে পাইনি। মানুষের জীবন নিয়ে কিভাবে তারা ব্যবসা করেছে তার প্রমাণ থেকে গেছে বুখেনভাল্ড ক্যাম্পে। বিশ্ববিশ্রুত জার্মান কেমিক্যাল কোম্পানী এবং ক্যাম্পের কর্তৃপক্ষের পরস্পরকে লিখিত কয়েকটি চিঠি পড়লাম এই ক্যাম্পের মিউজিয়মে। তার বিষয়বস্তু হচ্ছে, মানুষ মারার

যে সব গ্যাস কোম্পানীতে তৈরী হচ্ছিল যুদ্ধের সময়ে তার কার্যকারীতা পরীক্ষার জন্য কোম্পানীর পক্ষ থেকে অনুরোধ এসেছিল ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের কাছে বন্দীদের পাঠাতে। নীতিগত কোন বাধা ক্যাম্পের কর্তৃপক্ষ জানাননি, তবে বন্দী পিছু যে টাকা কোম্পানী দিতে চাইছিলেন তাই নিয়ে দর কষাকষি চলে কয়েকটা পত্রে। নিষ্পত্তি হওয়ার পর চাহিদা মাফিক এক এক দল বন্দী পাঠানো হোত কোম্পানীর কাছে পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষা হোত কতো কম খরচে কত বেশী লোক কতো ছোট ঘরে মারা যায়, ইত্যাদি।

এই রকমের প্রমাণ পাওয়ার পর এবং যেসব বন্দী কোনরকমে এই সব ক্যাম্পের থেকে বেঁচে ফিরেছেন তাঁদের অনেকের কাছ থেকে ক্যাম্পজীবনের কাহিনী শোনার পর Lest We Forget পড়ে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইনি।

তবে আশ্চর্য্য লেগেছিল যে জার্মানীতে অনেকের কথায় যে তাঁরা ক্যাম্পগুলির অবস্থান জানলেও সেখানে যা'হতো তা বিশ্বাস করেন না। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষনায় নিযুক্ত ছাত্র বলেছিল যে ওসব ঐতিহাসিক myth। আবার জার্মানীতে এমন কিছু লেখক-এর সঙ্গেও আলাপ হয়েছে তাঁরা সবই জানতেন এবং বলেন যে প্রাচ্যের লোক এর কার্য্য কারণ জানতে পারবে না। তাঁদের আপশোষ তাঁদের কাজ এখনও শেষ হয়নি। এখনো অনেক আছে যারা হয় ইহুদী আর না হয় নীতিগতভাবে ফ্যাসী-বিরোধী।

জার্মানীর এ দ্বন্দ্ব, বা ইউরোপে যে সংঘর্ষ আজো চলেছে তার নিষ্পত্তি করবেন সেখানকার জনসাধারণ। তবে মনে হয় যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আমরা গড়ে উঠেছি এবং যে সামাজিক প্রেরণা নিয়ে আমরা ভারতবাসীরা এগিয়ে যাচ্ছি তাতে যা ঘটে গিয়েছে তার মর্মার্থ বুঝতে আমাদের কষ্ট হবেনা এবং আমরা ঠিক পথ বেছে নেব।

১৫।৯।৫৭ **রামকৃষ্ণ মুখার্জি**, পি, এইচ, ডি. (কেম্ব্রিজ) :
বার্লিন হামবোল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইন্দলজি'র প্রাক্তন অধ্যাপক

নিবেদন

১৯৪৫ সালে সারা পৃথিবী জুড়ে ফ্যাসিবাদের সামরিক পরাজয় ঘটেছিল। কিন্তু পরমাণবিক অস্ত্রাদি প্রয়োগ করে এক অ-ঘোষিত মহাযুদ্ধ বাঁধিয়ে মানবসভ্যতার সমস্ত সত্যকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র পৃথিবীর বেশ কিছু অংশে আজও চলছে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এর বিরুদ্ধে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আজ সতর্ক ও সজাগ।

বৃটেনের স্যার হার্ট্‌লী শক্রসের হিসাবে নাৎসীরা এককোটি বিশলক্ষ প্রাণকে মৃত্যুকারখানায় পিষেছে; পোল্যাণ্ডের ত্রিশলক্ষ ইহুদীর মধ্যে সাড়ে উনত্রিশ লাখকে নৃশংসভাবে হত্যা করতে তাদের অনেক খরচ হয়েছে। একমাত্র আউশ্‌ভিৎস্‌ মৃত্যুশিবিরেই তা'রা ত্রিশলাখ নিরপরাধ মানুষকে স্তব্ধ করেছে অনেক আড়ম্বর করে। এবারকার নয়া-নাৎসীরা সংখ্যায় অনেক কম। মাটিতে দাঁড়িয়ে মানবসভ্যতাকে দগ্ধ ও বিকলাঙ্গ করা কঠিন হ'বে বলে তারা অন্তরীক্ষের আশ্রয় নিয়েছে; মৃত্যুশিবিরের চাইতে আরও ভয়ানক হাতিয়ার তাদের হাতে। সেদিনকার মৃত্যুশিবির-পাণ্ডারা আজ আণবিকবোমাবাহী বিমানপোতের ষ্টিয়ারিং ধরে বসেছে।

পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একসাথে দাঁড়ালে সে হাত পঙ্গু করা সহজ। পঞ্চশীলের রাখিবন্ধনে যুদ্ধজোটের বেষ্টনী খসে পড়ুক। মৃত্যু-পসারীদের হাতে প্রাণ দিয়ে যাঁরা জীবনের গান গেয়ে গেছেন তাঁরা দেবতা নন, মানুষ। তাঁদের যেন ভুলে না যাই। যেন ভুলে না যাই সেই নরপশু মৃত্যুপসারী হিট্‌লার-অনুচরদের ও তা'দের আধুনিক সংস্করণদের। এদের পাণ্ডা ছিল অনেক; তার মধ্যে বড় ভাগীদার ছিল জার্মাণ হাইকমাণ্ড ও জেনারলষ্টাফ্‌। এদের যুদ্ধাপরাধী বল্‌তে নুরেনবুর্গ আন্তর্জাতিক আদালতের কিছু ধুরন্ধরদের মুখে বেঁধেছিল। হিট্‌লারী জঙ্গলী-নীতি আজও বেশ কিছু দেশে শাসকগোষ্ঠীর বরাভয়। ব্যক্তি, জাতি ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের কণ্ঠরোধে আজ তা'রা

নতুন বর্বর-নীতি অনুসরণ করছে ; আন্তর্মহাদেশীয় রকেট দিয়ে তারা সভ্যতার অগ্রগতিকে রুদ্ধ করতে চায়। গ্যয়েটে, বীতোফেন, শীলার, শুম্যান, মার্কস্, ম্যানের দেশে ফ্যাসিষ্টরা বই পুড়িয়ে সংস্কৃতির মুখাগ্নি করতে চেয়েছিল ; তাদের উত্তরাধিকারিরা সে অভ্যাস এখনও ছাড়েনি, একথা যেন আমাদের স্মরণে থাকে। মূল বইটির বাংলা অনুবাদে অংশ গ্রহণ করেছেন শ্রীচিত্ত গুহঠাকুরতা, শ্রীবেদুইন চক্রবর্তী, অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুশীল রায় এবং শ্রীমতী স্মৃতি মিত্র। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই শ্রীনির্মল ভট্টাচার্যকে যাঁর সহযোগিতা না পেলে এত তাড়াতাড়ি বঙ্গানুবাদটি পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হ'ত না। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক, শান্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা "যুগান্তর" সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে—অনুবাদের "গ্রন্থপরিচিতি" রচনা করার জন্য। সর্বশেষে ধন্যবাদ দিই "পোলোনিয়া পাবলিশিং হাউস"কে ফটোগুলি পাঠানোর জন্য।

১৭।৯।৫৭ নির্মল বসু

ইংরাজী সংস্করণের ভূমিকা

পাইকারী হারে মানুষ মারত, রুদলফ হেস্; সে ছিল আউশভিৎসের (পোলিশভাষায় অস্ভিয়েচিম্এর) পাণ্ডা; সর্বোচ্চ জাতীয় বিচারকমণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে গ্যাসঠাসা কুঠুরিগুলোতে ঠিক কতগুলি নরনারী নিশ্চিহ্ন হয়েছিল তার সংখ্যাটি নিয়েই কেবল সে আপত্তি তুলল। জোর গলায় সে বলতে সুরু করে যে পঁচিশ নয়, পনের লাখ মানুষকে সে পুড়িয়ে মেরেছে! কেননা তার ভাষায় "আউশভিৎসের একটা সীমাবদ্ধতা ছিল"। অধ্যাপক বাতাভিয়ার সাথে কথাবার্তাকালে বা, যেসব কারারক্ষী তাদের হাতে উল্কিমারা ক্যাম্পএর রেজিষ্ট্রী নম্বর দেখাচ্ছিল তাদের সাথে আলাপের সময়, এবং আদালতের সামনে, হেস্ একটা ব্যাপার জোর দিয়ে বলে যে তা'র কবলে যারা পড়েছিল তা'দের উপর তার কোনো ঘৃণাই ছিল না। যাদের সে গ্যাসকুঠুরিতে হত্যা করেছিল তাদের সম্পর্কে ঘৃণাপূর্ণ একটি কথাও তার লেখা ডায়রী থেকে পাওয়া যায় না। বরং কিছু কিছু বন্দী সম্পর্কে তা'র ডায়রীতে বেশ কিছু পৃষ্ঠা ভরে আছে সহানুভূতি, সহৃদয় বিস্ময় এবং দার্শনিকসুলভ ধ্যান।

ইহুদিদের উপরও হেস্এর কোনো ঘৃণা ছিল না, যদিও "ইহুদি সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান" এর কাজে সে-ও এক পাণ্ডা ছিল। তাদের সম্পর্কে বেশ কয়েকপাতা দর্শন আউড়েছে, ডায়রীতে! প্রথম 'খ' ঘূর্নীবায়ুর পরীক্ষা সোবিয়েৎ বন্দিদের উপর চালালেও হেস্ তাদেরও প্রতি কোনো ঘৃণা অনুভব করত না। পাইকারী—হত্যা'র অসুবিধাও ছিল বেশ! আহতরা উন্মত্ত চীৎকারে এদিক্ ওদিক্ পালাত, যারা জহ্লাদের কাজ করত তাদের মধ্যে প্রায় উন্মাদনা ও আত্মহত্যার হিড়িক পড়ত! এদিকে গুলি মেরে হত্যা করায় খরচও ছিল প্রচুর, গোলমালও হত প্রচুর আর খুব কাজও হ'তনা; এসব থামিয়ে অগত্যা গ্যাস দেওয়া সুরু হ'ল।

হুকুম ছিল তা'র কাছে সাক্ষাৎ আইন; আর এই আইন তা'কে জোগাতো শক্তি, উৎপীড়ন চালাবার জন্য। তা'র কাছে চিন্তা ছিল এক, ঈশ্বর ছিল এক—সে হ'ল হুকুম।

তৃতীয় রাইখের তখন অন্তিমদশা; ক্যাম্পগুলো ছেড়ে চলে যাওয়া সুরু হয়েছে। হেস্ ইঁদুরের মত বুঝতে পারছে তখন, যে তা'র শেষদিন এগিয়ে আসছে। যাত্রাপথে একটা কুঠিতে সে (হিটলারের) ফুয়েরারের মৃত্যুখবর পেল। নিজের ও স্ত্রীর জন্য তা'র কাছে বিষ ছিল। সন্তানরা থাকায় সে সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। শেষে, সিল্ট দ্বীপে ফ্রান্‌ৎজ্ লাংগ্ নামে মাঝির ছদ্মবেশে থাকাকালীন তা'র আরাধ্যদেবতা হিম্‌লারের মৃত্যুসংবাদ এল। দ্বিতীয়বার সে বিষ খেতে গেল। কিন্তু কেন সে খেলনা তা সে পরে কারণ বলেনি। ফিল্ড্ সিকিউরিটি পুলিশ যখন তাঁকে পাকড়াও করে তখন তার কাছে বিষ ছিল না; দু'দিন আগে বিসের কৌটা চূর্ণ হয়ে যায়। তার ডায়েরীতে এই অনুচ্ছেদটি একেবারে নির্জলা মিথ্যা বলে মনে হয়। একটা লোক পঁচিশ লক্ষ মানুষকে দগ্ধ করতে পারে কিন্তু সেই সঙ্গে একথা সহ্য করতে পারে না যে মৃত্যুর পরে তাকে কোনোক্রমে কাপুরুষ বলে সন্দেহ করা হ'বে।

হেস্ সায়নাইড্-পান করা যে পেছিয়ে দিল তা শুধুমাত্র এই ভেবেই নয় যে নিজকে হত্যা করার থেকে পঁচিশ লাখ মানুষকে খুন করা সহজ; বা, কাপুরুষতা দেখা দিল এবং বাঁচবার বেপরোয়া কামনা চাড়া দিল, শুধুমাত্র এই-ই নয়। এ-ও কারণ ছিল যে সে-ও আশা ছাড়েনি। তীব্র দৃষ্টিতে সে যেন বর্তমান সময়টিতে পৌঁছে গিয়ে দেখতে পেল যে পঁচিশ লাখ দগ্ধ মানুষের সংখ্যাটা বেশ শুক্‌নো এবং পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে, আর মৃত্যুশিবিরবিশারদের খোঁজ পড়েছে, চাহিদা আবার উঠেছে!

আণবিক অস্ত্রের পরবর্তী আবিষ্কারের পূর্ববর্তী আস্বাদন হ'ল আউশ্‌ভিৎশ্। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ পাপ হ'ল আউশ্‌ভিৎশ্। তার সঙ্গে বর্তমান সময়ে তুলনা চলে সেই মারণাস্ত্র গুলির

যা শুধু কয়েকলাখ্ নয় কয়েক কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে। উদ্‌যানবোমা নিক্ষেপ করে যে বৈমানিক, তারসঙ্গে ইতিহাসের কোনো সৈনিকের তুলনা না দিয়ে বরং আউশ্‌ভিৎশ্ মৃত্যুশিবিরের কোনো ঝানু কর্তাকেই মনে পড়ে। ঐ মৃত্যুশিবিরের পাণ্ডা হেস্ যেমন হুকুমের কাছে মাথা নীচু করার মিষ্টিক ভাবের সাফাই দিত, উপরোক্ত বৈমানিকও ঠিক্ তাই দেবে। কিন্তু মানবসমাজের পক্ষে সে মিষ্টিকভাব দেখালে বেঁচে থাকতে আর হ'বেনা, ঝাড়েবংশে উৎসন্ন হয়ে যা'বে যদিনা বেশী দেরী হ'বার আগেই হাতের সমস্ত পন্থা প্রয়োগ করে বজ্র নির্ঘোষ সৃষ্টি করা যায় পৃথিবীর সর্বত্র—"সাবধান"। এই সতর্ক-বাণীই 'সম্ভাব্য' ধ্বংসের বিরুদ্ধে এক প্রাচীর তুলতে পারে।

মৃত্যুশিবিরের নগ্নসত্য উৎঘাটনকারী এই সমস্ত বই পড়া এবং পড়ানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ; অন্যান্য করনীয়গুলির মধ্যে এটির গুরুত্ব সম্পর্কে আমার দৃঢ়প্রত্যয় জন্মেছে। কিছু লোক যে বইগুলিকে এড়াতে চায় তা না করে বরং সাধারণভাবে এগুলিকে পরিচিত করা দরকার; বড় বড় সহরে; বড় বড় ষ্টেডিয়ামে চেঁচিয়ে এগুলি পড়া দরকার যাতে হাজারে হাজারে লোক গভীর মৌনতার সঙ্গে শোনে। আমাদের প্রিয়জনেরা অমানুষিক উৎপীড়ন ভোগ করে গেছেন যাতে আমরা শান্তিতে বাঁচতে পারি। এদের কাহিনী আছে ঐসব বইয়ে; এগুলির মশ্‌লা আর উৎকর্ষতা শিল্পের মাপকাঠিতে মাপা হয়; যাবেনা এগুলি ভালও নয়, মন্দও নয় কিন্তু এমন—যা পড়িয়ে নৃশংসতার বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগাবে। এর ফলে মানুষ শিখবে, তা'র সামনে যে নতুন অজানা এবং কঠিন কর্তব্য রয়েছে তার মুখোমুখী হ'বার উপযোগী ধৈর্য্য এবং শুভবুদ্ধি। এই কর্তব্যের ওপারে আছে আগে ধরিত্রী দেখেনি এমন আঁধার রাত্রি, আর নয়ত অদেখা এক ঔজ্জ্বল্য।

ওয়ারশ — আদল্‌ফ্ রুদ্‌নিচ্‌কি।



১৯৫৫ সালে পোলাণ্ড সফরকালে আউশ্‌ভিৎজ্‌ বন্দীশিবিরের অভ্যন্তরে প্রধানমন্ত্রী নেহরু।



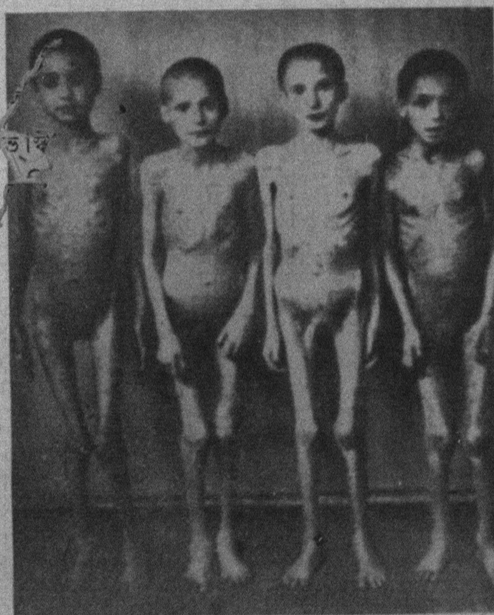
দারুণ ঠাণ্ডার মধ্যে মাউতাউজেন্ মৃত্যুশিবিরে অনাহার পীড়িত উলঙ্গ সোবিয়েৎ বন্দীদের অমানুষিক খাটাবার আগে নাম্ ডাকা হচ্ছে। রোলকল্।



হাটে বাজারে অসামরিক নরনারীদের হত্যা করে নাৎসীরা মৃতদেহগুলি সাজিয়ে রেখেছে।



গ্যাসচেম্বারের দগ্ধ নরনারীর অস্থিচূর্ণগুলি নাৎসীরা পালাবার সময় সরাতে পারেনি।



যে 'ঘেটো' বা খোঁয়াড়এ নাৎসীরা ইহুদীদের আটক করে রেখেছিল সেখানকার অনশনক্লিষ্ট, নগ্ন,



WRZESZCZ (ভ্র্জেস্চ্) সাবান কারখানায় মানুষকে খণ্ড খণ্ড করে একটা টবে মজিয়ে সাবান তৈরীর চর্বি বার করা হত।



পিছনদিক থেকে মাথার খুলীতে গুলীকরে খাদের মধ্যে মৃতদেহ জড়ো করা হ'ত।

বন্দীরা দল বেঁধে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়—রাত ঘনিয়ে এলো।

বহুক্ষণ বাদে পাভ্লভ্স্কি একটুখানি চেতনা ফিরে পেলো। পিঠের দিকটা সামান্য কেঁপে উঠছে। স্মোলা নড়ে উঠে এক দৃষ্টিতে তার পিঠের দিকে তাকিয়ে আছে। পাভ্লভ্স্কি মাটির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছিলো—কোন স্পন্দন নেই, খুব আস্তে আস্তে গোঙাচ্ছে। একটু পরে আবার সে শব্দ করলো। ঠিক সে সময় ক্রয়েৎস্মান ও নাদ্ল্নি মাঠের একপাশে এসে হাজির। স্মোলা প্রায় ঝুঁকে পড়েছিলো পাভ্লভ্স্কির ওপর। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।......ঠাণ্ডা আর উত্তেজনায় তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে কিন্তু দৃষ্টি তখনো পাভ্লভ্স্কির দিকে। আবার গোঙানি শোনা গেলো, এবার একটু জোরে।

'জাহান্নমে যাও' পাশ থেকে কে যেন বলে উঠলো।

গোঙানি আর থামছে না। পেছন থেকে একটা চাপা ক্রুদ্ধ স্বর স্মোলা শুনতে পেলো।

"বোকাটাকে চুপ করিয়ে দাওনা, 'ওরা শুনতে পাবে।"

স্মোলা একটুও নড়লো না।

"ওহে শুনতে পাচ্ছো—তুমি কি চাও ওরা এখানে আসুক।"

স্মোলা লোকটার দিকে ফিরে তাকালো। একটু দূরে সে দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষ্য করলো লাইনের মধ্যে থেকে কতগুলি মৃতপ্রায় নির্জীব চোখ তীব্র ঘৃণা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। একবার মনে হলো এই চাউনিকে আঘাত করে, কিন্তু কিছুই সে করলো না।

স্মোলা ভাবছে "আমি তো নিজেও শেষ হতে বসেছি।" ভীষণ অসুস্থ বোধ করছে সে, বুঝতে পারলো আর বেশীক্ষণ পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। নির্জীব আর ঘোলাটে হয়ে আসছে ওর চিন্তাশক্তি—

"আমি যদি এখন মারা না যাই তবে ওদের দশাই হবে"। জ্বরতপ্ত স্নায়বিক উত্তেজনায় চোখ বন্ধ করে সে এলিয়ে পড়ে।

পাশ থেকে হঠাৎ শ্রোয়েডার-এর গলা শুনতে পেলো। স্মোলা চোখ খুলে সোজা হয়ে উঠলো। কাজ দেখাশোনা করার সর্দারটি ঠিক তার সামনেই দাঁড়িয়ে।

মাকভ্স্কিকে দেখিয়ে জিগ্যেস করলো—"ওর কি অবস্থা? ও কি বেঁচে আছে?"

"মারা গেছে"—স্মোলা উত্তর দিলো।

সর্দারটি পাভ্লভ্স্কির দিকে তাকিয়ে বললো "আর এর অবস্থা?" উত্তর দেবার আগেই মাটিতে পড়া মানুষটি আর্ত্তনাদ করে উঠলো। শ্রোয়েডার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তার মুখে সব সময়ই দৃঢ় বিরোধীভাব ফুটে উঠতো কিন্তু চাউনিতে ছিল উদ্বিগ্নতা, অবসন্নতা। শেষ পর্যন্ত কারও দিকে না তাকিয়ে শিথিল ভাবে ও বলে—

"সমস্ত জীবন্ত বন্দীকেই সার দিয়ে দাঁড়াতে হবে—এই হলো আদেশ।" সবাই চুপ করে রইলো।

"হাঁ সকলকেই"—আবার সে বললো।

হঠাৎ স্মোলার দিকে তাকিয়ে আদেশ করলো, "ওকে তুলে ধরো।" স্মোলা ঝুঁকেপড়ে মৃতপ্রায় মানুষটির বগলের নীচে ধরলো। অল্পক্ষণের জন্য পাভ্লভ্স্কিকে সে তুলতে চেষ্টা করলো, কিন্তু নিজেই সমস্ত শক্তি হারিয়ে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লো। পাশ থেকে কে যেন ওর কম্পিত দেহটাকে ধরে ফেললো।

শ্রোয়েডার একবার শুধু তার দিকে তাকালো—কোন কথাই বললো না। নিজেই ঝুঁকে পড়ে পাভ্লভ্স্কিকে তুলতে গেলো কিন্তু সে গড়িয়ে পড়লো।

........হঠাৎ ওরা শুনতে পায় কে যেন চিৎকার করে বলছে—'ক্রয়েৎস্‌মান্‌ এদিকেই আসছেন।'

শ্রোয়েডার-এর কাঁধের ওপর রয়েছে পাভ্‌লভ্‌স্কির মাথাটি, ঠেসান দেওয়া শরীরটি খুব আস্তে আস্তে কাঁপছে। শ্রোয়েডার চোখ বুঁজলো। মৃতপ্রায় মানুষটিকে ধরে রেখে তাকেও দেখাচ্ছে মৃতেরই মতো। ঘন কুয়াশায় বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে, ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। মাটি থেকে ধোঁয়া উঠছে যেন একটু আগেই আগুন লেগেছিলো।

তিন নম্বর ব্যারাকের বন্দীরা দেখলো পাভ্‌লভ্‌স্কির দেহটিকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে শ্রোয়েডার তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো। মরণোন্মুখ মানুষটি তার হাত চেপে ধরেছে। হঠাৎ মনে হলো সর্দারটির মুখ থেকে একটা আবরণ খসে পড়েছে যে আবরণের আড়ালে এতদিন সব সময় নিজেকে সে ঢেকে রাখতো। দায়িত্বশীল অফিসারের সেই তীব্র রুক্ষতার ছাপ তার মুখে আর ছিলো না। এক আশ্চর্য সুন্দর, অকৃত্রিম মনত্ববোধ ওই কঠিন শক্ত মুখটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলো দুঃস্থ মানুষের প্রতি একটা সহানুভূতির আভায়।

চাপা গলায় সে ডাকলো—"কমরেড।"

পাভ্‌লভ্‌স্কি ঝুঁকে পড়া মানুষটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তার হাতটিকে শক্ত করে চেপে ধরলো। মনে হলো শ্রোয়েডার শুধু নিবে যাওয়া মানুষটির মুখই দেখতে পাচ্ছে আর সমস্ত পৃথিবীই তার কাছ থেকে সরে গেছে। ক্রয়েৎস্‌মান্‌ এর কণ্ঠস্বর খুব কাছে থেকেই শোনা যাচ্ছিলো।

একটু জোরে সে ডাকলো—"কমরেড"

পাভ্‌লভ্‌স্কি আকুল ভাবে তাকালো, জীবনের শেষ শিখাটুকু জ্বলছে তার চোখে। শ্রোয়েডার খুব আস্তে আস্তে বললো—"কমরেড আমাদের ভরসা রাখতে হবে অনাগত ভবিষ্যতের ওপর, বিশ্বাস করতে হবে চূড়ান্ত জয়ে আর মুক্তিতে।

পাভ্‌লভ্‌স্কির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—ঠোঁট দুটি তার কাঁপছে। শ্রোয়েডার আরও একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলো-"কি বলছো বন্ধু ?"

পাভ্‌লভ্‌স্কি নিবে আসা চোখ নিয়ে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। আবার তার ঠোঁট দুটি নড়ছে। শেষ পর্যন্ত ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললো—"মুক্তি"

তারপর সব শেষ।

"রোল-কল" থেকে—ইয়ার্সি আঁদ্রেইভ্‌স্কি।

কে যেন চীৎকার করে উঠলো—"আবার গাড়ী আসছে"। সকলেই উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। মালগাড়ীটি বাঁক ঘুরে আসছে—এঞ্জিন পেছন থেকে ঠেলে আসছিলো। রেল কর্মচারিটি প্ল্যাটফরমে বেরিয়ে এসে হাত নাড়লো, তারপর হুইসেল বাজালো। এঞ্জিন থেকেও এলো তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তর। গাড়ী আস্তে আস্তে ষ্টেশনে ঢুকলো। ছোট জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে অনিদ্রায় অবিন্যস্ত ফ্যাকাশে মানুষের মুখ আর আলুথালু চুল নিয়ে ভীত মেয়েদের দল। সব চেয়ে তাজ্জব ব্যাপার—ওদের মাথায় এখনো চুল রয়েছে। তারা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। নীরবে ষ্টেশনের দিকে তাকিয়ে আছে। একটু বাদেই গাড়ীর ভেতর থেকে কাঠের দেওয়ালে ধাক্কাধাক্কি সুরু হ'লো।

"একটু জল! একটু বাতাস"—আকুল চীৎকার ভেসে আসতে লাগলো। জানালা দিয়ে মুখ বেরিয়ে এলো,—হাঁ করে উন্মত্তের মত একটু বাতাস নেবার জন্যে। একটুখানি বাতাস টেনে নিয়েই একজন জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে, অপর জন ঠেলাঠেলি করে জায়গা করে নিচ্ছে। চেঁচামেচি আর অস্থির ধাক্কাধাক্কির শব্দ ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো।

সবুজ পোষাক পরা, বুকে সবার চেয়ে বেশী পদক ঝোলানো একজন অফিসার বিরক্তিতে মুখটা কুঁচকে নিলেন, তারপর সিগারেটে টান মেরে ফেলে দিয়ে হাতব্যাগটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে বদল করে রক্ষীর কাছে এগুলেন। শান্ত্রীটি কাঁধ থেকে হাল্কা মেশিনগান নামিয়ে নিশানা করে প্রতিটি গাড়ীর ওপর গুলি চালালো। চারিদিকে নীরবতা নেমে এলো। ইতিমধ্যে লরীগুলোকে কাছে এনে প্রত্যেকটির পেছনে মই লাগানো

হয়েছে। কর্মচারীরা নিখুঁতভাবে লরীর পাশে দাঁড়ালো, অফিসারটি হাত নেড়ে বললেন—

"খাওয়ার জিনিষ ছাড়া সোনাদানা বা অন্য কোন জিনিষে যদি কেউ হাত দাও তাহ'লে রাইখের সম্পত্তি চুরির দায়ে তাকে গুলি করা হবে। সবাই বুঝতে পেরেছো তো ?"

"হ্যা-হুজুর"—সবাই অসন্তুষ্ট, কিন্তু অনুগত স্বরেই উত্তর দিলো।

"তাহ'লে কাজে নেমে যাও"।

ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে গাড়ীর দরজা খুলে গেল। একঝলক বিশুদ্ধ বাতাস ঢুকে পড়াতে লোকগুলো চমকে উঠলো—মনে হ'লো তারা যেন বিষাক্ত কারবন্‌ মনোক্সাইড গ্রহণ করছে। বিশ্বাস করা যায়না এমনিভাবেই গাদাগাদি করে রয়েছে তারা, তার ওপর অসংখ্য মালের চাপে থেঁতলে গেছে। হরেকরকম মাল—স্যুটকেস, এটাচি, র‍্যাকস্যাক, বিভিন্ন ধরণের বাণ্ডিল। (তারা সাথে নিয়ে এসেছে সব কিছু যা দিয়ে একদিন পুরানো জীবন সুরু করেছিলো, আজ আবার তাই দিয়ে যেন নুতন জীবন সুরু করবে)। খুব অল্প জায়গার মধ্যে কুঁকড়ে বসে আছে সবাই—অসহ্য গরমে অনেকে মূর্চ্ছা গেছে, ভীড়ের চাপে অনেকের শ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে। এখন খোলা দরজার কাছে সকলে এগিয়ে এলো—জল থেকে মাছ তুললে যে অবস্থা হয় সেভাবে হাঁপাতে লাগলো তারা।

"সবাই উঠে পড়—যা কিছু মাল আছে সব কিছু নিয়ে নেমে এসো। তোমাদের সম্পত্তিগুলো গাড়ীর পাশে জমা করো, এখন গরম কাল—কোটটাও জমা দাও। তারপর বাঁ দিকে এগিয়ে চলো। বুঝতে পেরেছো তো ?"

"হুজুর আমাদের কি হবে ?" সবাই তারা উদ্বেগ নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে মালগাড়ী থেকে প্লাটফরমে নেমে পড়লো

"কোথেকে আসছো তোমরা ?"

"সোস্‌নোভিচ্‌," "বেনজিন্‌" থেকে"—ক্লান্ত চোখে নূতন পরিবেশকে লক্ষ্য করতে করতে তারা নিজেদের ভবিষ্যত ভাগ্যের কথা জানবার জন্য বার বার জিগ্যেস করতে লাগলো।

"আমি জানিনা, পোলিশ ভাষা আমি বুঝি না।"

ক্যাম্পের একটা নিয়ম ছিলো যারা মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে তাদের শেষ পর্য্যন্ত ভোলাতে হবে। আইন অনুযায়ী দয়া প্রদর্শনের এটাই ছিলো একমাত্র নমুনা। অসহ্য গরম, একেবারে মূর্চ্ছা যাবার অবস্থা। সূর্য ঠিক মাথার ওপরে। আগুনে পোড়া আকাশ কাঁপছে—মাঝে মাঝে যে বাতাস বইছে সে শুধু আগুনের হল্‌কা। ঠোঁটগুলো আগেই ফেটে গেছে, রক্তের নোনা স্বাদ আসছে। সূর্যের নীচে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। একটু যদি খাবার জল পাওয়া যেতো। বদ্ধ নদী যেমন নূতন ধারার পথ খুঁজতে আছড়ে পড়ে তেমনি বিভিন্ন রঙের মানুষের স্রোত মালপত্র নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো গাড়ী থেকে। টাটকা বাতাস আর সবুজ গাছ-পালার গন্ধের মাঝে এসে নিজেদের সম্বিৎ ফিরে পাবার আগেই তাদের হাতের মালপত্র কেড়ে নিল, কাঁধ থেকে কোট গেল, ছিনিয়ে নেওয়া হ'লো মেয়েদের হাত ব্যাগ আর ছাতা।

"হুজুর, এটা দিয়ে রোদের হাত থেকে বাঁচছি—এটা দিতে পারবো না।..."

"চুপ কর"—একজন গার্ড দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো।

পাশেই রয়েছে ঝটিকা বাহিনীর একজন লোক, শান্তভাবে দক্ষতার সাথে জিনিষ সংগ্রহ করছে।

"ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলারা, জিনিষপত্রগুলো ওভাবে ছুঁড়ে ফেলবেনা, ওগুলোর ওপর আর একটু দরদ দেখাবেন।" খুব শান্ত ভাবেই সে বলছে, সাথে সাথে হাতের সরু বেতটাও হাতের চাপে বেঁকছে।

ওয়াগনের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে অনেকেই বলে উঠলো "হুজুর ঠিকই বলেছেন, কথাটা ঠিকই হুজুর।" একজন মহিলা তাড়াতাড়ি তার হাতব্যাগ তুলতে গেলেন। সপাং করে চাবুক পড়লো। ভদ্রমহিলা চীৎকার করে ঠিকরে পড়লেন ভীড়ের তলায়। ছোট একটা উস্কোখুস্কো চেহারার মেয়ে—"মা, মা" বলে চীৎকার জুড়ে দিলো।

জিনিষপত্র স্তূপাকৃতি হতে লাগলো—সুটকেশ, ট্রাভলিং ব্যাগ, কম্বল,

কাপড়জামা, হাতব্যাগগুলো থেকে ছিটকে পড়লো—রামধনুরঙের ব্যাঙ্কনোট, গহনা, ঘড়ি। ওয়াগনের সামনে জমা হলো প্রচুর রুটি, বিভিন্ন রঙের মোরব্বা আর জ্যামের বোতল, শুয়রের মাংস ও সসেজ, চিনি পড়ে প্ল্যাটফরম ঢেকে গেলো। দারুণ চীৎকার আর গোলমাল চলছে। আলাদা করে নিয়ে যাওয়া ছেলে মেয়েদের জন্য মেয়েরা আর্ত্তনাদ করছে, পুরুষেরা বোকার মত চুপ করে বসে রইলো, লরীগুলো এরই মাঝে গাদাগাদি করে লোক নিয়ে বেরিয়ে গেলো। যারা যোয়ান, স্বাস্থ্যবান তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে। গ্যাসের হাত থেকে তাদেরও নিস্তার নেই, কিন্তু তার আগে তাদের কাজে লাগানো হবে।

লরীগুলো বারে বারে যাতায়াত করছে অতিকায় মেশিনের বেল্টের মত। রেডক্রস-এম্বুলেন্স গাড়ী একটানা আসছে যাচ্ছে। গাড়ীর ওপর রক্তের মত লাল রঙের আঁকা বিরাট ক্রস চিহ্নটি রোদে চক্ চক্ করছে। অক্লান্তভাবে কাজ করছে এম্বুলেন্স গাড়ী, গ্যাস নিয়ে যাচ্ছে, যে গ্যাস দিয়ে মানুষগুলোকে হত্যা করা হবে।

"কানাডা"* থেকে যারা এসেছে এক মুহূর্ত্তও তাদের বিশ্রাম নেই। লরীর কাছে দাঁড়িয়ে বেছে চলেছে কারা ক্যাম্পে যাবে আর কাদের স্থান গ্যাসের গহ্বরে। প্রথম দলের লোকগুলোকে ৬০ জন করে এক লরীতে ঠাসা হচ্ছে।

লরীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে গোঁফ-দাড়ি কামানো ঝটিকা বাহিনীর এক যুবক। হাতে একটা নোটবই নিয়ে প্রত্যেকটি ভর্ত্তি লরীর গায়ে দাগ দিয়ে চলেছে। ৬০টি লরী যাবার পর বোঝা গেল প্রায় কয়েক হাজার লোক চলে গেছে। যুবকটি বেশ শান্ত, কাজে নিখুঁত। তার অজান্তে কিংবা দাগ ছাড়া কোন লরী ছাড়তে পারবে না—'কানুনতো খেলাপ হতে পারেনা'। এই দাগ দেওয়া হাজার গুণ হবে, যানবাহনও বাড়বে হাজারগুণ। অল্প একটু উল্লেখই মাত্র থাকবে "স্যালোনিকা·········

* ক্যাম্পের ষ্টোরের নাম দেওয়া হয় 'কানাডা'। যে বন্দীরা সেখানে কাজ করতো তারাও সে নাম পেতো। দামী জিনিষপত্র, কাপড়জামা, বন্দীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেখানে জমা করা হতো তার পর চালান যেতো জার্মানীতে।

ষ্ট্রাসবুর্গ.........রোটারডাম থেকে," আজকের দিনে লেখা থাকবে—'বেনজিন' থেকে। যারা আজ ক্যাম্পে গেল ওদের নম্বর হবে "১৩১-১৩২"। সংখ্যায় তারা হাজার ঠিকই কিন্তু সংক্ষেপে বলা হবে "১৩১-১৩২"।

সপ্তাহ-মাস আর বছর কেটে চলেছে। গাড়িগুলোর গতিবিধি আরও বেড়ে গেলো। যুদ্ধ যখন শেষ হবে তখন পুড়িয়ে মানুষের সংখ্যা গোনা হবে। ....আউশ্‌ভিৎস্‌-এ তৈরী হ'লো ১৬টি শবদাহ চুল্লী, দিনে ৫০ হাজার লোককে নিঃশেষ করে দেওয়া যায়। ৩ লক্ষ লোকের স্থান হ'লো ক্যাম্পে, তার পরিধি বাড়লো, বৈদ্যুতিক তারের বেড়া গিয়ে পৌঁছালো ভিশ্‌চুলা নদীর পাড়ে—ক্যাম্পের নাম হ'লো—"দাগী-আসামীর সহর"। জনস্রোত এখানে কোন দিন আসবে না। ইহুদীরা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, তারপর পোল, তারপর রাশিয়ানরা। মানুষ নিয়ে আসা হবে পশ্চিম থেকে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এমন কি আইসল্যাণ্ড থেকে। ডোরাকাটা জামা পরে গড়ে তুলবে ধ্বসে যাওয়া জার্মান-শহর, ফসল ফলাবে মাঠে; তারপর একদিন খাটতে খাটতে যখন নুয়ে পড়বে তখন তার সামনে খুলে যাবে গ্যাসের মরণ কোঠা। গ্যাস-ঘরগুলো বেশ নিখুঁত, কম ব্যয় সাপেক্ষ। মানুষের চোখ থেকে ওগুলো ভালোভাবেই লুকিয়ে রাখা যায়। কোঠাগুলো তৈরী হয়েছে ড্রেসডেনের মত যার বহু কাহিনী ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে লোকমুখে।

স্রোতের মত মানুষ আসতে লাগলো। ক্ষ্যাপা কুকুরের মত লরীগুলো শব্দ করছে। চোখের সামনে দিয়ে মানুষের শব সরানো হচ্ছে। থেঁতলে যাওয়া শিশু, পঙ্গু মানুষ আর মৃতদেহে সব একাকার হয়ে গেছে। মানুষে মানুষে জায়গাটা ছেয়ে গেল। রেলগাড়ী আসছে, জমা হচ্ছে প্রচুর জামাকাপড়, বাকস্‌প্যাটরা, মানুষ বেরিয়ে আসছে সূর্যালোকে, বুকভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, এক ফোঁটা জল ভিক্ষে চাইছে। তাদের লরীতে তোলা হচ্ছে, ছেড়ে যাচ্ছে লরী, একটানা এই চলেছে। গাড়ীর পর গাড়ী আসছে—সাথে সাথে মানুষ আর মানুষ।........মনে

হচ্ছে সমস্ত ছবিটাই আমার চেতনার সাথে মিশে গেছে। বুঝতে পারছিনা—সত্যিই এগুলো ঘটছে, না আমি শুধু চিন্তা করছি। হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠলো সবুজগাছে ভরা রাজপথ, রঙ্‌বেরঙের মানুষের ভিড়। কিন্তু এ তো "এভিনিউ"*। মাথাটা ঘুরে উঠলো, বুঝলাম অসুস্থ হয়ে পড়েছি।

হেনরী আমার হাত ধরে টানলো। "উঠে পড় আমরা মাল নামাতে যাচ্ছি।"

সমস্ত মানুষ চলে গেছে। শেষ লরীখানাও দূরে বড় রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এক ঝলক কালো ধোঁয়া ছেড়ে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। ঝটিকা-সৈন্যরা কড়া উঁচু কলারের কুর্ত্তা আর পালিশকরা জুতো পরে প্লাটফরমে হাঁটছে—কলারের ওপর পদকগুলো চক্‌চক্ করছে, লাল মাংসল মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ওদের সাথে হাড়বেরকরা রোগা একজন স্ত্রীলোক রয়েছে, এবার বুঝতে পারছি ও সবসময় এখানেই ছিলো। মহিলাটির রঙ্‌হীন চুল পেছন দিকে টেনে "নর্ডিক" গেরো দিয়ে বাঁধা। দুভাগ করা স্কার্টের মধ্যে হাত রেখে লম্বা লম্বা পা ফেলে প্লাটফরমের এদিকে ওদিকে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার শুকনো ঠোঁটে খেলছে ইঁদুরের মত ক্রূর হাসি। নিজের ওপরেই বিরক্ত—মেয়েদের সৌন্দর্যকে সে ঘৃণা করে। বহুবার আমি তাকে দেখেছি, মনে বেশ গেঁথে গেছে। স্ত্রীলোকটি বন্দী শিবিরের কমাণ্ডাণ্ট। তার এক্তিয়ারে নূতন আসা মানুষের দেখা শোনা করবার জন্য সে এখানে রয়েছে। পাশেই একদল মহিলা লরী থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা পায়ে হেঁটে ক্যাম্পে যাবে। "সাওনা" থেকে আসা ছোকরা নাপিতগুলো মেয়েদের চুল একদম ছেঁটে ফেলবে আর মেয়েদের এই অপমানে উপহাস করতে মশগুল হয়ে উঠবে।

আমরা মাল তুলতে সুরু করলাম। ভারি ভারি সুটকেশগুলোকে

* ওয়ারশ শহরের অন্যতম সুন্দর রাজপথ

কোনমতে ছুঁড়ে দিলাম লরীর ওপর। ঠাসাঠাসি করে সেগুলো সাজিয়ে রাখা হ'লো।............একটা বাক্স তুলে নিলাম—বেশ ভারী। খুলে দেখি সোনা—প্রচুর টাকার সোনা, ঘড়ির বক্স, ব্রেসলেট, আংটি, নেক্লেস, ডায়মণ্ড........।

ঝটিকা বাহিনীর অফিসারটি শান্তভাবে বললো "ওটা এদিকে-দাও।" সে তার হাত ব্যাগটি খুললো—শুধু সোনা আর নোট ভর্ত্তি। ওটা আটকে অন্যলোকের হাতে তুলে দিলো তারপর আবার একটা খালি হাতব্যাগ নিয়ে অপর গাড়ীর কাছে গেলো। এই সমস্ত সোনাই পাঠানো হবে রাইখে।

গরম....অসহ্য গরম...। বাতাস একটুও কাঁপছে না—যেন একটা অনড় আগুনের স্তম্ভ। গলা একেবারে পুড়ে গেছে, সামান্য কথা বলতেও ব্যথা পাচ্ছি। একটু যদি জল পাওয়া যেতো। একটু ছায়া আর বিশ্রামের জন্য তাড়াতাড়ি কাজ করছি। মাল বোঝাই হ'লো, শেষ লরীটাও চলে গেলো। গাড়ীর সমস্ত জঞ্জাল আমরা তুলে নিলাম।— "এতটুকু ময়লার চিহ্ন থাকা চলবে না।" শেষ লরীটি যখন গাছের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলো তখন আমরা গেলাম বিশ্রাম নিতে, জল খেতে। ....রেলের বাঁশী আমাদের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনলো। তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছেড়ে আবার একটা মালগাড়ী আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ফ্যাকাশে আর কুঁকড়ে যাওয়া মানুষের মুখ—আতঙ্কে তাদের চোখ বড় হয়ে গেছে। লরী আগে থেকেই হাজির। অফিসাররা শান্তভাবে নোট বই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঝটিকা বাহিনীর লোকেরা ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে এলো হাতব্যাগ নিয়ে—সোনা আর টাকা পয়সার জন্য। আমরা মালগাড়ীর দরজা খুলে দিলাম।

এ দৃশ্য অসহ্য—নিজেকে আর বাগ মানানো যায় না। বর্বরের মত মানুষের হাত থেকে সুটকেশ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, কোটগুলো গা থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে ওরা। একটানা চীৎকার চলেছে—"চল্—এগিয়ে চল্।" পুরুষ, মহিলা, বাচ্চা সবাই এগিয়ে যাচ্ছে, দু'একজনেই জানে কোথায় চলেছে তারা...........।

একজন যুবতী আতঙ্কিত হয়ে জোরে হাঁটছে—পেছনে দৌড়াচ্ছে স্বর্গীয় দুতের মত হৃষ্টপুষ্ট ছোট্ট একটা শিশু। তাকে ধরতে না পেরে হাত বাড়িয়ে চীৎকার করে কাঁদছে—"মা, মামনি,"

"বাচ্চাটাকে তুলে নাও।"

"হুজুর, ও আমার কেউ নয়, ও আমার কেউ নয়।" মেয়েটি উন্মাদের মত চীৎকার করে হাত দিয়ে মুখ ঢাকতে ঢাকতে ছুটে চললো। মেয়েটি লুকিয়ে থাকতে চায়—যারা লরীতে যাবে না, পায়ে হেঁটে যাবে, যারা আরও কিছুদিন বেঁচে থাকবে তাদেরই সাথে ও মিশে যেতে চায়। যুবতিটি সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, খুব অল্পই তার বয়েস। পৃথিবীতে আরও কিছুদিন সে বেঁচে থাকতে চায়।

কিন্তু শিশুটি তার পেছনে ছুটে চলেছে চীৎকার করে........"মা মনি তুমি চলে যেও না................"

"ও আমার কেউ নয়, ও আমার কেউ নয়..........." সেবাস্তোপোল থেকে আসা নাবিক আন্দ্রে হঠাৎ মেয়েটিকে ধরে ফেললো। ওর চোখ দুটো তখন গরমে আর ভড্‌কায় ঘোলাটে হয়ে রয়েছে। হাতের ঝাপটায় মেয়েটিকে ফেলে দিলো তারপর আবার চুলের মুঠি ধরে তুলে ধরলো। রাগে ওর সমস্ত মুখটা কুঁচকে গেছে। "ওরে হারামজাদী, তুই বাচ্চা ফেলে পালাচ্ছিস, দেখাচ্ছি তোকে মজা।" আন্দ্রে তার বিরাট হাত দিয়ে মেয়েটার কোমরটা জড়িয়ে ধরলো, গলাটা চেপে ধরে ওর চীৎকার বন্ধ করে দিয়ে বস্তার মত ছুঁড়ে ফেলে দিলো লরীর মধ্যে। "একেও তোর সাথে নিয়ে যা।" আন্দ্রে বাচ্চাটাকেও ওর পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিলো।

"বেশ করেছো, বেইমান মা-গুলোকে এভাবেই শিক্ষা দেওয়া দরকার"—গাড়ীর পাশে দাঁড়ানো ঝটিকা সৈন্যটি বললো—বেশ করেছো রুশ্‌কী, বেশ করেছো।"

দাঁত চেপে আন্দ্রে চীৎকার করে উঠলো—"চুপ কর।" গাড়ীর পাশ থেকে সরে এসে কম্বলের গাদা থেকে ফ্লাস্ক বের করে ছিপি খুললো। খানিকটা গলায় ঢেলে আমার হাতে এগিয়ে দিলো।........এল্‌কহল্‌....

বেশ কড়া এল্‌কহল্‌। গলাটা পুড়ে গেলো। মাথা ঝিম ঝিম করছে, পা টলছে, গা-টা গুলিয়ে উঠলো।

হঠাৎ দেখলাম অদৃশ্য শক্তিতে চালিত নদীর মতো লরীর দিকে অন্ধভাবে এগিয়ে চলা মানুষের স্রোতের ভেতর থেকে একটি যুবতী ওয়াগন থেকে কাঁকর বিছানো মাটিতে লাফিয়ে পড়লো। বেশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে চারধারে দেখতে লাগলো।

মেয়েটির ঘন নরম চুল কাঁধের ওপর তুলছে। এলিয়ে পড়া চুলের গোছাকে সে পেছনে ছুঁড়ে দিলো। ব্লাউজ আর স্কার্টটাকে ঠিক করে নিলো কায়দামাফিক। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো তারপর ভীড়ের থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে আমাদের মাঝে কাউকে যেন খুঁজতে লাগলো। মনে মনে আমি ওকে খুঁজছিলাম—আমাদের তুজনের চোখাচোখি হয়ে গেল।

"বলতে পারো ওরা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?" ওর দিকে তাকালাম। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে যুবতীটি—তার সোনালী চুলগুলো ভারী সুন্দর, অর্গাণ্ডি ব্লাউজের নীচের বুক ভারী লোভনীয়, চোখের মধ্যে ফুটে বেরুচ্ছে বুদ্ধির দীপ্তি, সোজাসুজি তাকিয়ে সে অপেক্ষা করছে। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো গ্যাসের মরণ কোঠা আর মৃত্যু-বিভীষিকা। কি অসহ্য। ক্যাম্পের সাথে জড়িয়ে আছে—মাথা কামানো মানুষ, অসহ্য গরমে লেপের মত সোভিয়েত ট্রাউজার, বিশ্রীগন্ধ, কামুক নারীদেহ, জানোয়ারের মত ক্ষুধা, অমানুষিক পরিশ্রম আর সেই মরণ কোঠা। কিন্তু তবুও মৃত্যুই এর চেয়ে বেশী বিরক্তিকর, বেশি ভয়ানক। একবার সেখানে যে ঢুকবে তাকে আর রক্ষীদের সীমানা পার হতে হবে না। এক মুঠো ছাই হয়েও বেরোনোর পথ নেই।

মেয়েটির মনিবন্ধে রয়েছে ছোট্ট ঘড়ি—সরু সোনার চেন লাগানো। সেদিকে চোখ পড়তেই ভাবলাম, 'কেন ওটা সাথে করে নিয়ে এসেছে—এখুনিতো ওরা কেড়ে নেবে।' টুসকারও এমনি একটা ছিলো, শুধু তারটা কালো ফিতায় লাগানো

"আমার কথার উত্তর দাও।" তবুও আমি চুপ করে রইলাম। মেয়েটি এবার মুখ খুললো।

"আমি কিন্তু জানি—"একটা তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠলো তার কথার সুরে। সাহসের সাথে সে লরীর দিকে এগিয়ে গেলো। কে একজন তাকে থামাতে চেষ্টা করলো কিন্তু সে পাশ কাটিয়ে একটা ভর্ত্তি লরীতে উঠে পড়লো। দূর থেকে দেখলাম মেয়েটির ঘন চুলের গোছা হাওয়ায় উড়ছে।

গাড়ীর কাছে গিয়ে বাচ্চাদের বের করে নিলাম, মালপত্র ছুঁড়ে ফেললাম। মৃতদেহগুলো সরাতে গিয়ে একটা বিরাট আতঙ্ক আমায় চেপে ধরলো—মন থেকে কিছুতেই তাকে দূর করতে পারলাম না। পালিয়ে এলাম, কিন্তু মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে সর্ব্বত্র। সার বেঁধে শোয়ানো রয়েছে কাঁকর বিছানো মাটিতে, প্লাটফরমের ওপর, ওয়াগনের মধ্যে। শিশু, উলঙ্গ নারী আর পুরুষের দেহ সব তাল পাকিয়ে রয়েছে। ছুটে দূরে সরে যেতে চাইলাম, কে যেন আমায় টেনে ধরলো। চোখ ঘুরিয়ে দেখি একজন ঝটিকা রক্ষী। তার হাত থেকে ছিটকে গিয়ে ডোরাকাটা জামা পরা "কানাডা" বাহিনীর সাথে ভিড়ে পড়লাম।

তারপর আবার নেমে পড়লাম রাস্তায়।

সূর্য অস্তাচলগামী—রক্তিম ধুসর আলোতে প্লাটফরম ভরে গেছে। গাছের ছায়া আরও বিরাট আকার ধারণ করেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে প্রকৃতির বুকে নেমে আসছে নীরবতা কিন্তু মানুষের একটানা কোলাহল আরও উচ্চগ্রামে উঠে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে।

একমাত্র রাস্তার ওপর থেকেই প্লাটফরমের সমগ্র নারকীয় ছবি দেখা যায়। এক দম্পতী মরিয়া ভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে মাটির ওপর পড়ে আছে।......পুরুষটির আঙ্গুল নারী দেহকে প্রবল ভাবে চাপ দিচ্ছে, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে মেয়েটির জামার এক অংশ। উন্মত্তের মত আর্ত্তনাদ করে চলেছে স্ত্রীলোকটি; হঠাৎ একটা বুটের ঠোক্কর তার কান্না থামিয়ে দিলো, দু'টুকরো কাঠের মত তাদের আলাদা করে জানোয়ারের মতই খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'লো লরীর দিকে। ওদিকে "কানাডা" ব্রিগেডের লোকেরা গরমে ঘেমে নেয়ে গালাগালি দিতে দিতে একটা মোটা মেয়েমানুষের মৃতদেহ টেনে নিয়ে

চলেছে। তারা লাথি মেরে বাচ্চাদের সরিয়ে দিচ্ছে—যারা সমস্ত প্লাটফরম জুড়ে ঘোরাফেরা করছে আর কুকুরের মত ভীষণ চীৎকার করছে। বাচ্চাদের ঘাড়, মাথা বা হাত ধরে লরীর মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। চার জনে মিলেও সেই ভারী মেয়ে মানুষের দেহটাকে লরীতে তুলতে পারলো না—আরও লোকজন ডেকে খুব কষ্টকরে সেই মাংসের পাহাড়টিকে ওপরে তোলা হ'লো, প্লাটফরমের সমস্ত স্ফীতগলিত মৃতদেহগুলিকে জড়ো করে তার ওপর চাপানো হ'লো পঙ্গু, সংগাহীন, পক্ষাঘাতগ্রস্ত থেঁতলে যাওয়া মানুষগুলোকে। তারা চীৎকার আর কান্না জুড়ে দিলো—লরীটা ছেড়ে গেল।

"থামাও"—গাড়িটা একটু থামাও,—"দূর থেকে একজন ঝটিকা সৈন্য চীৎকার করে উঠলো।

ওরা একজন বৃদ্ধকে টেনে নিয়ে আসছে। বৃদ্ধের পোষাক পেছন দিকে ঝুলে পড়েছে, জামার হাতায় রয়েছে একটা ফিতে বাঁধা। বৃদ্ধের মাথা কাঁকর আর পাথর গুলোর মাঝে। এক টানা আর্ত্তনাদ করতে করতে একঘেয়ে বলে চলেছে "আমি অধিনায়কের সাথে কথা বলতে চাই।" পীড়িত মানুষের একগুঁয়ে ভাব নিয়ে সমস্ত রাস্তা ধরে ঐ একই কথা বলে চলেছে। লরীর ওপর তাকে তুলে দেওয়া হলো—সেখানেও অপরের পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে চিৎকার সুরু হলো—"আমি কথা বলতে চাই........।

ঝটিকা বাহিনীর এক ছোকরা সৈন্য হাসিতে ফেটে পড়ে বলে উঠলো, "বুড়ো, চুপ করো; আর আধঘণ্টার মধ্যেই তুমি একেবারে সর্বাধিনায়কের সাথে কথা বলতে পারবে। কিন্তু দেখো, হেইল হিটলার বলে সম্বোধন জানাতে ভুলে যেওনা।"

কয়েকজনে মিলে এক পা-ওয়ালা ছোট একটা মেয়েকে হাত পা ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে। ওর চিবুক দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। ব্যথায় কুঁকড়ে গিয়ে আস্তে আস্তে সে বলছে "তোমরা আমায় বড্ড ব্যথা দিচ্ছো—বড্ড ব্যথা দিচ্ছো................" মৃতদেহের ওপর ওকে চাপানো হ'লো—ওগুলোর সাথে মেয়েটিকেও জীবন্ত পুড়িয়ে দেওয়া হবে।

তারায় ভরা ঠাণ্ডা রাত নেমে এলো। আমরা পথের পাশে শুয়ে আছি। চারধার একেবারে নিস্তব্ধ। সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মাঝে লম্বা পোষ্টের ওপর লাগানো অনুজ্জ্বল ল্যাম্পগুলো শুধু খানিকটা আলোর রেখা সৃষ্টি করছে।

আমরা যখন ক্যাম্পে ফিরে এলাম অন্ধকার তখন কেটে এসেছে, তারার উজ্জ্বলতা কমে আসছে, আকাশ স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। আগামী কালের পরিষ্কার আবহাওয়ারই সূচনা করছে—আবার একটা আগুন ঝলসানো দিন আসবে।

শ্মশানের বিরাট চিমনীর সার থেকে স্তম্ভের মত কালো ধোঁয়া উঠে একসাথে মিশে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন একটা কালো নদী বার্কেনাউ-এর ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে গড়িয়ে ত্রেবিনিয়ার দিকে হারিয়ে যাচ্ছে। সোস্‌নোভিচ্ থেকে যারা এসেছিলো তারা ছাই হয়ে গেলো।

ঝটিকা বাহিনীর একটা দলকে পাশ কাটিয়ে গেলাম, মেশিনগান নিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে পাহারা বদল করতে। সমান তালে পা ফেলে হাতে হাত মিলিয়ে চলেছে—একদল, এক চেতনা। উচ্চকণ্ঠে তারা গান গাইছে "আগামী কাল গোটা দুনিয়াই আমাদের……।
আদেশ শুনতে পেলাম, "ডাইনে ঘোরো"
ওদের পথ থেকে আমরা সরে গেলাম।

"খাচিয়েন্দাতে একদিন"—তাদিয়ুশ্‌ বোরোভ্‌স্কি

হঠাৎ একদিন রাতের বেলা ব্যাপারটা সুরু হয়ে গেলো। গভীর ঘুমে অচেতন বন্দীরা বাঁশীর শব্দে আর মানুষের চীৎকারে জেগে উঠলো। অন্ধকার ভেদ করে আসতে লাগলো ট্রেণের হিস্ হিস্ শব্দ, এঞ্জিন-ষ্টীমের আওয়াজ, আর বাফারের ঘর্ষন। মনে হয় বন্দীদের ব্যস্ত রাখার জন্য হঠাৎ যেন একটা রেলওয়ে জংশন জেগে উঠেছে। মেয়ে পুরুষের হক্‌চকানো কথাবার্ত্তার মাঝে শোনা যাচ্ছে ছোট বাচ্চার কান্না। সব কিছু ছাড়িয়ে জোরালো চীৎকার শোনা যাচ্ছে—"উঠেপড়—এগিয়ে চল।"

মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদের আওয়াজ প্রহারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। একটু পরেই একটা গুলির শব্দ সমস্ত পরিবেশকে নীরব করে তুলছে।

রাতে বন্দীদের ব্যারাক ছাড়ার আদেশ ছিলনা—অমান্য করলেই পেতে হবে নিদারুণ শাস্তি। পরে অবশ্য এ নিয়ম শিথিল হয়ে এসেছে, এত কঠোরভাবে পালন করা হতো না। কিছুদিনের জন্য সব কিছু চলেছে সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা অনুযায়ী যাতে করে ষ্টেশনে কি হচ্ছে সে সম্পর্কে বন্দীরা ঘুণাক্ষরেও কিছুনা জানতে পারে।

সকাল বেলা বন্দিনীদের চলতি রাস্তা ছেড়ে ভিন্ন পথ দিয়ে কাজে নিয়ে যাওয়া হ'লো। ষ্টেশনের কাছাকাছি তাদের যেতে দেওয়া হ'লো না। এমনকি সেদিকের বেড়ার দিকেও তাকানো বারণ। "বি" গেটের দরজা বন্ধ হ'লো। উত্তর ধারের শৌচাগার মেয়েদের ব্যবহার করতে দেওয়া হ'লোনা। পাঁচজনের সার দিয়ে এক এক দলকে পাহারা দিয়ে দক্ষিণ দিকের শৌচাগারগুলোতে নিয়ে যাওয়া হ'লো।

কাঁটা তারের বেড়ার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে রৌদ্রজ্জ্বল দিন। ক্ষেতের ওপর যেন সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে। সব কিছুই কিন্তু মনে হচ্ছে চোখের ধাঁধা। মানুষ যা কিছু সত্য বলে ভাবতে পারে সে সবই এখানে নিছক মায়া!

শুধু একটা জিনিষ প্রশ্নাতীত ভাবে বাস্তব হয়ে উঠেছে সে হ'লো বিরাট ধূম্রজাল। ব্যারাকের ভেতরে, ব্যারাকের বাইরে সমগ্র আকাশে বাতাসে জমাট বেঁধে আছে স্পন্দনহীন ভারী ধোঁয়া। সে ধোঁয়া ঢুকছে মুখে-গলায় ফুসফুসে, ঢুকছে কাপড়ের মধ্যে, খাবারের ভেতর। চারটে বৈদ্যুতিক চুল্লী থেকে ধোঁয়ার দুটো কালোস্তম্ভ আকাশের দিকে উঠছে, আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে নীচে নেমে আসছে।

মাঝে মাঝে কালো অন্ধকার ভেদ করে লাভাস্রোতের মত আগুন বেরিয়ে আসছে চিমনীর মুখ দিয়ে তারপর মিলিয়ে যাচ্ছে হালকা নীল আকাশের বুকে। কোন কোন দিন, বিশেষ করে সন্ধ্যার দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আগুনের হলকা বেরুতে থাকে, এমন কি রাতভোর হয়ে যায়।

কয়েক দিন বাদে বন্দীদের ওপর ঝটিকা সৈন্যদের দুর্ব্যবহার কমে যায়—প্রায় উপেক্ষা করেই তারা চলে। ওরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যায় মানুষের চালান নিয়েই ব্যস্ত—শিবিরের দিকে নজরই দিচ্ছে না। বন্দীরা এখন বৈদ্যুতিক তারে ঘেরা জায়গার মধ্যে যেখানে খুশী যেতে পারে, যা ইচ্ছে দেখতে পারে।

তাদের সামনে যা ভেসে উঠছে তা হ'লো এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। কয়েকদিন ধরে সব সময়ই প্লাটফরমের পাশের রাস্তাটা দিয়ে চলেছে মানুষের স্রোত, ভীড়ে মাথা ঠোকাঠুকি হচ্ছে—মনে হয় যেন একটা ধর্মীয় শোভাযাত্রা চলেছে, বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষ দলে দলে সেই চওড়া রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে এগুচ্ছে পশ্চিম দিকে। গরমের দিন—রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্য কেউ কেউ ছাতা খুলে ধরেছে মাথার ওপর। আস্তে চলতে গিয়েও অনেকে অবসন্ন হয়ে পড়ছে, ক্যাম্পের বেড়ার বাইরে কম্বল পেতে বসে পড়েছে। ওঠার সময় জামা কাপড়ের ধুলো ঝেড়ে নিচ্ছে। তারা সবাই ধীর, শান্ত ভাবে এগিয়ে চলেছে; উদাসভাবে

তাকিয়ে আছে সামনের ধোঁয়ার স্তম্ভের দিকে।..............মাঝে মাঝে ছোট্ট বাচ্চা কেঁদে উঠছে, মা তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে ন্যাকড়া বদলে দিয়ে আদর করছে তাকে। বসন্তের সকালে এগিয়ে চলা মানুষের বুকে নেমে আসছে নীরবতা।

রাতের বেলাতেই বেশীর ভাগ গাড়ী আসে। ঝটিকা বাহিনীর আর স্পেশাল ব্রিগেডের লোকেরা ইহুদীদের আলাদা করে ঠেলে বের করে নিয়ে যায়। তাদের মালপত্র প্লাটফরমেই পড়ে থাকে। ওদের সাথে কোন চালাকী করতে গেলে ফল হয় খুবই খারাপ। দোষীকে কি করে চক্ষের নিমেষে খতম করে দিতে হয় সেটা এই মদ্যপ জহ্লাদেরা ভালোভাবেই জানে।

মানুষগুলো সরাসরি শ্মশানে চলে যায়—তাদের জিনিষপত্র ষ্টেশনেই পড়ে থাকে। ওরা সাথে করে যা এনেছে তা এদের লোভ মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট। ঝটিকা সৈন্যরা টাকা পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। সোজা কথায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছে গহনা আর দামী জিনিষের ওপর।

সমস্ত ইয়োরোপের "উদ্বাস্তুদের" জমা করা হচ্ছে এখানে। উৎসাহ পেয়ে তারা যথাসর্বস্ব নিয়ে আসছে সাথে করে তারপর এখানে এসে খোয়াচ্ছে সব কিছু। নাৎসীরা এর বিনিময়ে বেশ কিছু যুদ্ধের খরচা তুলে নিচ্ছে।..........

ইতিমধ্যে ঝটিকা-সৈন্যরা গা ভাসিয়ে দিলো নৈশ প্রমোদে। মানুষের যে অনুভূতিটুকু এখনো ওদের মাঝে আছে তাকে যেন ওরা অসাড় করে দিতে চায়, যাতে ঐ পরিবেশের মাঝে সেটা বিদ্রোহী হয়ে না ওঠে।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ওরা প্রচুর সম্পদ পেলো। হাঙ্গেরিয়ান "উদ্বাস্তু" ইহুদীরা একমাত্র খাবার হিসাবেই কত জিনিষ এনেছে তার ঠিকানা নেই। তা না হ'লে বন্দীদের রান্না ঘরে কি আর বোতল বোতল জ্যাম, চকলেট মেশানো মোরব্বা, ময়দা, চিনি আর পিপে পিপে চর্বি পাওয়া যেতে পারে। বন্দীদের রেশন পর্যন্ত বেড়ে গেলো, স্যুপের সাথে পাওয়া গেলো শুয়রের লোনা মাংসের টুকরো, সমস্ত শিবিরে খাবারের সময় বিলি হ'লো হাঙ্গেরিয়ান চীজ্ আর সসেজ; ক্যাম্পের রুটির বদলে সবাই

"চালানী" রুটি পেলাম, খাবারের মধ্যে লুকানো সোনাদানা প্রায়ই পাওয়া যেতে লাগলো।

কত জিনিষ যে ওরা এনেছে তার কোন হিসেব নেই—ঝটিকা বাহিনী ও স্পেশাল ব্রিগেডের খাঁই মিটে যাবার পরও বন্দীদের জন্য রইলো প্রচুর।

আলুর খোসা যে ঘরে ছাড়ানো হয় সেখানকার মেয়েরা হাঙ্গেরী থেকে আসা আলুর সাথে পেতে লাগলো গায়ে মাখা সাবান, চকলেট, বাদাম ইত্যাদি।

বড় বড় বোতলে রাজহাঁসের চর্বি, শুকরের লোনা মাংস, ষ্ট্রবেরীর ঝুড়ি, পীচের তৈরী জ্যাম, পিপে পিপে মদ-হুইস্কী-ভিনিগর ইত্যাদি। ওগুলোর ওপর ঝটিকা সৈন্যদের ঘেন্না ধরে গেছে,তাই সেগুলো বন্দীদের শিবিরে আনা হয়েছে। মাঝে মাঝে সাবানের টুকরো এবং রুটির মধ্যে মণি মুক্তো পাওয়া যাচ্ছে।

ঝটিকা শান্ত্রীরা এ সব ফালতু জিনিষে নজরই দেয়না, তারা আরও দামী জিনিষ জোগাড়ে ব্যস্ত।.......যে জিনিষ একবারও কোনদিন তাদের প্রয়োজনে এসেছে তা সবই উদ্বাস্তরা সাথে করে নিয়ে এসেছে।............ সোনার চেন দেওয়া সুইস ঘড়ি খুঁজে পাওয়া সহজ কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্ত পরিবেশ পাওয়া যাবে না।

কাপড়ের গুদাম ঘরে স্পেশাল ব্রিগেডের লোকেরা এখন শুধু জিনিষ গোছানোর কাজেই ব্যস্ত, কিন্তু তাও পেরে উঠছে না। প্রতিদিনই নূতন চালান আসছে। প্রতি দু-এক মিনিট অন্তর ঝটিকা বাহিনীর কোন না কোন অফিসার রান্নাঘরে ঢুকে লুঠ করা খাবার নিয়ে আসার ব্যাপারে সাহায্য করতে পাচকদের আদেশ করছে।

মৃত্যুপথ-যাত্রী মানুষের মুখোমুখি গিয়ে এবার তোমায় দাঁড়াতে হবে।

কিছু কিছু লোক ইতিমধ্যেই পাঁচজনের সার দিয়ে হেঁটে চলেছে পশ্চিম দিকে—এই ওদের অন্তিম যাত্রা। অন্যরা মাটিতে বসে আছে। একদল গোঁড়া ইহুদী তাদের লম্বা কুর্ত্তা পরে আছে। মাথার কালো টুপীর পাশ দিয়ে তাদের চুলের গোছা বেরিয়ে পড়েছে। এই বৃদ্ধদের মুখের

সমস্ত শান্তভাব কেটে গেছে। সন্ত্রস্ত হয়ে তারা একবার ঝটিকা বাহিনীর দল আর পরক্ষণেই বন্দী মেয়েদের দিকে অস্থির ভাবে তাকাচ্ছে। সুযোগ খুঁজছে কখন চুপিসারে বলবে, "একটু জল, একটু জল দিতে পারো।"

একটুখানি অনুকম্পার চোখে তাকানো ছাড়া আর কিছু করবার নেই। তাও করতে হবে খুব সন্তর্পণে তা না হ'লে মুখের ওপর পড়বে ঝটিকা রক্ষীর থাপ্পড়।

অসহায় ভাবে বড় বড় চোখ করে ওরা তাকিয়ে আছে পথটির দিকে—যে পথ চলে গেছে শ্মশানে। যে পথ দিয়ে হাজার হাজার মানুষ মিলিয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে, ওরাও মিলিয়ে যাবে কিছুক্ষণ বাদেই। কেউ কেউ নালার পারে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল সূর্যের দিকে তাকিয়ে সুরু করেছে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা - পৃথিবীর বুকে শেষ বারের মতো।

যে ওয়াগণগুলো এই মাত্র খোলা হয়েছে তার ভেতর থেকে ঝটিকা শান্ত্রীরা মানুষের দলকে তাড়িয়ে বের করে আনছে। অনেক এখনো বন্ধ রয়েছে—ভেতরে চলেছে গোলমাল আর আর্ত্তনাদ। এতটুকু জায়গা নেই যাতে করে যাত্রীরা খালি কাপটা নিয়েও বিশেষ ভঙ্গীতে দাঁড়াতে পারে, যে ভঙ্গীর ব্যাখ্যার কোন দরকার হয় না। রাতে বৃষ্টি হয়ে যাওয়াতে গাড়ীর ছাদ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে, সেটুকু নেওয়ারও কোন সুযোগ নেই। ছোট ফুটো দিয়ে কেউ কেউ হাতের বদলে ঠোঁট বাড়িয়ে জল ভিক্ষে চাইছে। আতঙ্কিত হয়ে বিভিন্ন ভাষায় ওরা জিগ্যেস করছে—"কোথায় এলাম আমরা? সত্যিই কি আমাদের কারখানায় কাজ করতে নিয়ে যাওয়া হবে? আমরা কি ইঁট খোলায় কাজ করতে যাবো?"

গাদাগাদা বাণ্ডিল, সুটকেশ আর ঝুড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বন্ধগাড়ী, জলের জন্য বৃথাই তারা চীৎকার করছে। বন্দীরা অর্থহীন ভীত দৃষ্টিতে সব কিছু ঠাহর করতে চেষ্টা করছে। তাদের সামনে প্লাটফরমের বাইরে রয়েছে কাঁটা তারের বেড়া, পেছনে ব্যারাকের সারি। কিছু সুস্থ মানুষ সেখানে কাজে ব্যস্ত। ওরা তাহলে খেতে পায়, স্নান করে, ওদের জীবন বোধ হয় কিছুটা স্বাভাবিক। এ আবিষ্কারের ফলে নিজেদের

নিরাপত্তা সম্পর্কে একটু মোহ তাদের সৃষ্টি হ'লো : এখানে যখন এত ব্যারাক রয়েছে তাহ'লে তাদেরও ঠাঁই হবে।

ব্যারাক থেকে যারা আসছে তাদের কাছ থেকে নূতন বন্দীরা একটু ভরসার কথা শুনতে চায়। কিন্তু তারা সম্পূর্ণ নীরব।' সামান্যতম মুহূর্ত্তের জন্যেও তারা আলাদাভাবে আগন্তুকদের সাথে মিশতে পায় না। ঝটিকা বাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের লোক এবং ডাক্তারেরা সব সময়েই তাদের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখে। সে দৃষ্টি হ'লো মদ্যপের দৃষ্টি কিন্তু যেখানে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটছে সেখানে এ দৃষ্টি খুবই সতর্ক।

প্লাটফরমের চতুর্দ্দিকে যে অদ্ভুত পরিবেশ সেখানে ভুলে গিয়ে এমন কোন অন্যায় করা যায় না যার ফলে ভাগ্যে শুধু বুলেট জুটবে। সেখানে মাথা তুলে চীৎকার করে বলা যাবেনা—"তোমরা চলেছ্ মরণের দিকে।"

বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে চলা পশুরপালের মত মানুষের দলকে তুমি কিছুতেই রুখতে পারবে না। জহ্লাদের চোখের সামনে ওদের দিয়ে তুমি কিছুই করতে পারবে না, কিন্তু ওদের বিলাস উপকরণগুলো তোমাকেই জড়ো করতে হবে—কুড়িয়ে নিতে হবে চকলেটের টুকরো। তুমি ভাই হতে পারতে—কিন্তু সেখানে ব্যবহার করতে হবে হায়েনার মত।

মাটিতে পড়ে থাকা জিনিষ অনেকে এড়িয়ে যায়। তুলে নিয়ে নিজের হাত অপবিত্র করতে চায় না। কিন্তু এতে কোন পরিবর্তন হবে না। কোন কারণেই জিনিষ সেখানে পড়ে থাকবে না। আরও শত শত হাজার হাজার হাত আঁতিপাঁতি করে সব কিছু খুঁজে নেবে।

একটা কথা সবার মধ্যে চালু—জার্মানদের হাতে তুলে দেওয়ার চেয়ে জিনিষপত্র নিজেরা নিয়ে নেওয়াই ভালো। কিন্তু এ হ'লো নিজের লোভাতুর মনকে যুক্তি দিয়ে জিইয়ে রাখা ছাড়া আর কিছুই নয়। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নেমে যেতে হবে দুর্নীতির পিচ্ছল পথে।

* * *

ঝটিকা বাহিনীর লোকেদের মদ খাওয়াকে যেমন প্রশ্রয় দেওয়া হয় ঠিক তেমনি ভাবেই ধনসম্পদ কুড়িয়ে নেবার প্রবৃত্তিকেও চাঙ্গা করে তোলা

হয়—সেটাকে কোন দোষের মধ্যেই ধরা হয় না। যে আগুনে মানুষের দেহ ছাই হয়ে যাচ্ছে তারই দাহনে বেরিয়ে আসছে বহু ধরণের চারিত্রিক প্রবৃত্তি—ঠিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মত। যারা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারাই শুধু ধ্বংশ হচ্ছে না, যারা বেঁচে রইলো তাদেরও সর্বনাশ হচ্ছে।

১৯৪৪ সালে বার্কেনাউর-বাসিন্দাদের যদি কোন রাজনৈতিক মত কিংবা সাধারণ প্রাত্যনীতির মাপ কাঠি দিয়ে বিচার করা হয়, তাদের জাতিগত লক্ষণ বলে যদি কিছু সিদ্ধান্ত করা হয় তবে সেটা হবে মস্ত ভুল। যুদ্ধের ধ্বংস আর মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সব কিছু জাতিগত, দেশগত পার্থক্য ঘুচে গেছে। এখানে মানুষের বিচার করতে হবে অন্য ভাবে।

আমি নীতিবোধের এই পার্থক্যকে, বিশেষ ভাবে সামনে তুলে ধরতে চাই যাতে করে আমার বর্ণনার ফলে যারা কোন দিনই মানুষের মাংস আর অস্থি-র পোড়া গন্ধ গ্রহণ করেনি তাদের ওপর যেন কোন ইচ্ছাকৃত অথবা বিকৃত ভুল দোষারোপ এসে না পড়ে। তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই আমার কথার ব্যখ্যা করতে পারে, স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে ·· স্পেশাল ব্রিগেডের লোক কিংবা মস্ত ইহুদিরা মৃত্যুমুখী তাদের ইহুদি ভাইদের প্রতি ব্যবহার ঝটিকা বাহিনীর চেয়ে একটুকু ভালো করেনি। বার্কেনাউর আগুনে পোড়া জঙ্গলের মাঝে ধ্বসে যাওয়া মনুষ্যত্বের এ এক হৃদয়হীন নমুনা।

তবুও মাঝে মাঝে সেই স্পেশাল ব্রিগেড়ের লোকেরাই নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও ছুটে যায় তারের বেড়ার কাছে ইহুদীদের নিয়ে আসার জন্য। কোন কোন সময় তারা নিয়ে আসে ছোট্ট উপহার, ছবি আর চিঠি—হতভাগ্য পরিবারগুলোর শেষ বিদায় চিহ্ন। অবশ্য এ দৃশ্য খুব অল্পই দেখা যায়।

* * *

হঠাৎ খুব কাছেই শোনা গেলো মার্চ করে এগিয়ে চলা পায়ের শব্দ, আর গলা ছাড়া গানের আওয়াজ, গানের শেষ কলি তখনো ক্যাম্প গেটের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

"হা, পোষাক গুদামের-লোকেরাই এগিয়ে চলেছে।"

সামনের সারিতে আছে শ্লোভাক ইহুদী মেয়ে লিসি, উত্তেজনায় তার মুখ লাল, খুব জোরে সে হাঁপাচ্ছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা এক দল মেয়ে জিজ্ঞাসা করলো—"কাদের নিয়ে এসেছে, লিসি ?"

"এবার বেশ কড়া দামী চালান এসেছে……. ….কি সব জুতো। আর খাবার যা এসেছে বলার নয়।"

হতভাগ্য লিসি। যৌবনের সুন্দর তিনটি বছব তুমি কাটিয়েছো এই শিবিরে। সবাই তোমাকে চেনে কত আপন করে তুমি 'তাতরা পাহাড়ের' গান করতে পারো। তুমি কত কোমল, আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু, তুমি আমাদের কত কাজেই না আসো। মাঝে মাঝে একি তোমার দুরবস্থা। ……..হতভাগ্য লিসি সুন্দর সুন্দর কাপড় আর মালিক ছাড়া জুতো দেখে কেন তুমি পাগল হয়ে ওঠো। এই জুতোর পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসছে তাদেরই একটানা ফিস্‌ফিসানি যারা কালও এগুলো পরতো। লিসি, তুমি কি জানো না তোমার নিজের মৃত্যু চিন্তাই তোমায় এ ভাবে উত্তেজিত করে তোলে। দীর্ঘদিনের নিদারুণ বুভুক্ষায় এই সমস্ত জিনিষগুলো তোমার মাঝে বাড়িয়ে তোলে জীবনের জন্য বিরাট আকাঙ্খা—তারই চাপে তুমি অন্ধ হয়ে যাও। তুমি যখন তোমার ইহুদী বোনের সুন্দর জুতোটা পরেছো ঠিক সেই মুহূর্তে তার দেহটা দুমড়ে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে গ্যাসে, আর তারই মরণকালে তুমি গান গাইছো, নাচছো,….

"যতক্ষণ পারো বেঁচে নাও"—এ পরিবেশে কথাটা অনেকের মনেই চেপে বসে যায়।

নোংরা একজন ইহুদী ব্যারাকের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে বোকার মত হাতুড়ি দিয়ে তাল ঠুকছে খালি পিপের ওপর আর সেই তালে "রোজামুন্দের" সুরে গান গাইছে—"সময় থাকতে গুছিয়ে নাও, কাল তুমি আর এখানে নাও থাকতে পারো…."

বার্কেনাউ এখন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে—যে কোন মানুষ সহজেই এখানে বর্বর হয়ে পড়তে পারে। কেউ বলতে পারে না একই অবস্থাতে কাল তোমার কি প্রতিক্রিয়া হবে। তোমার আশেপাশে যারা রয়েছে

তারা যে দেশেরই হোক না কেন তারা কি ভাবে ব্যবহার করবে কেউ জানে না। মানুষের নীতিবোধ আর বহুদিনের ভদ্র ব্যবহারের অভ্যাস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।........বন্দী শিবিরে প্রথম দিন যখন ডোরা কাটা কয়েদী পোষাক দেওয়া হয়, যখন তার মাথা কামিয়ে দেওয়া হয়, তখনই বোধহয় মানুষ হারিয়ে ফেলে তার চরিত্রের রক্ষাকবচ।

এই ডোরাকাটা জামা ও মাথা-কামানোটাই হ'ল বন্দী শিবিরে প্রবেশাধিকারের প্রতীক চিহ্ন। মানুষ এখানে সম্পূর্ণ অনাবৃত, নিজেকে আড়াল করার কিছুই নেই। বাস্তবের সাথে নূতন ভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে—তার প্রধান ভিত্তি হবে নিজের মনের পবিত্রতা। কারুর হৃদয় অত্যন্ত দৃঢ়, কেউ আবার শিবিরের সাধারণ নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার পথেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে—এ্যামিবার মত বাইরের অবস্থার চাপেই নিজেকে গড়ে তোলে।

* * *

বহু মানুষ আছে যারা বুভুক্ষা আর অভাবের তাগিদেও মৃত্যুমুখী মানুষের জিনিষে হাত দিতে যায় না। তুলনাহীন আত্মসংযমের সাথে তারা প্রচুর জিনিষ জোগাড় করে কিন্তু নিজেদের জন্য কিছুই রাখেনা। তারা বিশ্বাস করে এ' ভাবেই জিনিষগুলোর ওপর যে রক্তের ছোপ রয়েছে, যে অভিশাপ রয়েছে তা ধুয়ে মুছে যাবে আর সেগুলো হয়ে পড়বে সামাজিক যৌথ সম্পত্তি। টাকা আর মূল্যবান জিনিষ তারা পাঠিয়ে দেয় গুপ্ত সৈন্য বাহিনীর জন্যে আর জুতো-জামা-খাবার বিলিয়ে দেওয়া হয় যাদের প্রয়োজন আছে তাদের মধ্যে। নিজেদের জন্য তারা কিছুই রাখে না, তারা ভয় পায় কারণ যে হাত দিয়ে জিনিষ ধরেছে তাই হয়ত একদিন জিনিষ আত্মস্থ করার প্রবল ইচ্ছায় কেঁপে উঠতে পারে, যে চোখ দিয়ে নূতন চালান দেখছে তাই হয়ত একদিন লালসায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। নিজেদের "সংগঠনে" তারা ব্যক্তিগত সুবিধাকে এড়িয়ে চলে।

ক্ষেতের মাঝে নুয়ে পড়া সোনালী ফসল পেকে উঠেছে। কালও মাঠ ছিলো ফসলে ভরা, আজ সেখানে দক্ষিণ থেকে মেশিন এসেছে। ফসল কাটা সুরু হলো। শান্ত্রীদের পাহারা কুঠরীর পেছনেই বিশাল মাঠ ভরে

রয়েছে হলদে ফুলে। ওদিক থেকে হাওয়া এলেই চুল্লীর ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে আর তারই সাথে ছোট্ট ফুলের গন্ধে ভরে ওঠে ব্যারাক।

ক্যাম্পে সময়ের হিসেব রাখার বালাই নেই। দিনরাত সব সময়ই চলেছে সেই ভয়ানক *দৃশ্য*—জ্বলন্ত চুলী—আর সে দিকে এগিয়ে চলেছে মানুষের স্রোত।

দামী গ্যাস যাতে কম খরচ হয় সে জন্য ছোট বাচ্চাদের জীবন্ত পোড়ানো হ'তো। পৌঁছানোর সাথে সাথে বড়দের থেকে আলাদা করে ওদের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। একদিন একটা ছোট ছেলে, বছর পাঁচেক বয়েস হবে—শ্মশানে ঢোকার মুখে ঝটিকা সৈন্যদের এড়িয়ে পালালো। ছোট ছোট পায়ের সমস্ত জোর দিয়ে সে ছুটতে লাগলো। কিন্তু কোথায় যাবে? কোথায় পালাবে সে? পালানোর কোন উপায় নেই। পার্শেল মোটর-সাইকেল নিয়ে তার পেছনে ধাওয়া করলে। মনে হ'লো তাব ফ্যাকাশে মুখ থেকে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে কিছুতেই স্থিরভাবে তাকাতে পারছে না।

বন্দীদের হাজার হাজার চোখ এই *দৃশ্য* দেখতে লাগলো। রাস্তাটা ছিল সোজা—প্রশস্ত—জনমানবহীন তবুও কেন ,মোটর সাইকেল চুরমার হলো—পার্শেল ভীষণভাবে আহত হ'লো?..............

রাতের অন্ধকারে আর একদল চালান এলো। অন্ধকার রাতে চুল্লীর আলো এবং আলকাতরায় মেশানো আবর্জ্জনার আগুন আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে—তারই শিখা গোলমালে ভরা প্লাটফরমকে আলোময় করে তুলেছে। অর্কেস্ট্রার দল যাতে গেটে বাজনা বাজায় তারই জন্য খবর পাঠানো হ'লো।.................

রাতের বাজনা আরম্ভ হলো—সুরু হলো ঝটিকা সৈন্যের চীৎকার, মার খাওয়া মানুষের আর্ত্তনাদ, গাড়ী থেকে নেমে আসা শিশুর কান্না........

ছ'নম্বর ব্যারাকে যারা রাত কাটাতো তাদের মধ্যে যাদের জায়গা ছিলো দোরের কাছে উঁচু মাচানের উপর, তারা রাতে জেগে উঠলেই প্লাটফরম দেখতে পেতো—সেখানের প্রতিটি কথাই পরিস্কারভাবে শুনতো।

ব্যারাকেনাউ থেকে বহু দূর টেনে নিয়ে যাওয়া স্বপ্নের মাঝে যখনই এক মুহূর্তের জন্য চোখের পাতা খুলতো তখনই দেখতাম পরিবর্তনহীন একই দৃশ্য—মানুষের শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে, শরীর নুয়ে পড়েছে তাদের, আগুনের আভায় মুখ লাল দেখাচ্ছে। এখানে ঘুমানো অসম্ভব।

সে সময়ে মেয়েরা নিদ্রাহীন রাতই কাটাতো। আগুনের শিখায় দেখা যেতো বৃদ্ধারা মৃত্যুর কোলে চলে পড়া মানুষের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করে ঠোঁট নাড়ছে। যারা গ্যাসে প্রাণ দিচ্ছে তাদের জন্য জীবিত মানুষের দল প্রার্থনা করছে।

ফিস্‌ ফিস্‌ করে একজন বললো—"বলতে পারো, চোখের সামনে যা দেখছি তাতে আমরা পাগল হয়ে যাইনা কেন?

"আমরা কি স্বাভাবিক আছি? এ সমস্ত ঘটনার সামনেও আমরা খাই, ঘুমোই, কাজ করি। এখনো আমরা এই ভয়াবহতার সামনে কথা বলি, হাসতে পারি। কেন আমরা কাঁটা তারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ি না, শুধু হাতে ঝটিকা সৈন্যদের ওপর চড়াও হইনা? কে বলতে পারে এই হয়তো আমাদের উন্মত্ততা।"

একজন বললো, "এখন আমরা পাগল না হ'লেও, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেলেই পাগল হয়ে যাবো।"

প্লাটফরম থেকে একটা গুলির শব্দ ভেসে এলো। তারপরই শোনা গেলো চীৎকার—"চল, সবাই এগিয়ে চল।"

ব্যারাকের নিঃশব্দতার মাঝে নিদ্রাহীন কোন বন্দী বারে বারে আওড়াচ্ছে, "ষ্টেশানটা হ'লো অদৃষ্ট আর মৃত্যু হ'লো ষ্টেশান মাষ্টার।"

একটানা বাধাহীন মানুষের স্রোত চলেছে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে। এর হাত থেকে কোন নিস্তার নেই। আমরা সবাই চলেছি। আমাদের গতি দ্রুত হওয়াই ভালো। বিলম্বের আর প্রয়োজন কি? দিনরাত চুল্লী জ্বলছে হাজার হাজার মানুষকে কোলে টেনে নেবার জন্য। কাঁটাতারের বেড়া আর শ্মশানের সাথে আমাদের মাত্র কয়েকশ' পায়ের ব্যবধান।........

আজকের রাত কিছু নূতন নয়। প্রতি রাতেই এক অবস্থা। দিনের কঠিন পরিশ্রমের ক্লান্তিতে যারা গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে, প্লাটফরমের চীৎকারে তাদেরও ঘুম ভেঙ্গে যায়। সমগ্র পরিবেশের অনুভূতি মানুষের চেতনাকে নাড়া দেয়, উত্তেজিত করে তোলে, জেগে উঠতে বাধ্য করে। প্রথম চালান পৌঁছানোর পর থেকেই মানুষের শোভাযাত্রা আসছে বাধাহীনভাবে। তারা পার হয়ে যাচ্ছে তারের বেড়া ও ব্যারাকগুলো। মনে হয় যেন কাছে কোথায়ও মানুষগুলোকে ট্রেন ভর্ত্তি করে রাখা হয়েছে। প্রতি রাতেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় এখানে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিদিন সকালে যখন আমাদের নাম ডাকা হয় তখনও ঝটিকা-সৈন্যেরা রাতে আসা মানুষদের তাড়া দেয় "চল্—শিগ্‌গীর এগিয়ে চল্।"

প্রথম সারি রাস্তায় নেমে পড়লো। একজন যুবক হাতে তার 'ট্রাভ্‌লিং ব্যাগ, গায়ের ওপর এলিয়ে পড়া এক যুবতীকে নিয়ে চলেছে। পাশেই এক পক্ককেশ বৃদ্ধাকে ধরেছে একজন বৃদ্ধ আর অল্প বয়সের একটি মেয়ে। এর পরের সারিতে রয়েছে নিখুঁত স্যুট এবং ওভারকোট পরা পাঁচজন তরুণ—সবে মাত্র জীবন সুরু করেছে। তারপরে কয়েক সারি আসছে মেয়ে আর শিশুরা। একজনের সাথে আছে একজোড়া বেয়াড়া যমজ সন্তান—ওরা রাস্তা ধরে ছুটছে। ওদের এখনো আলাদা করা হয়নি—পাঁচজনের সারিতেই সবাই চলেছে, পেছনে একটানা আওয়াজ "জলদি চল্"................

রাস্তার শেষে গাছগুলোর পেছনে দেখা যাচ্ছে ১নং-২নং চুল্লীর ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর শ্মশানের লাল রঙের প্রাচীর। রাস্তার মাঝখানে মেয়েদের আলাদা করে ফেলা হ'লো। আবার পাঁচ জনের নূতন সারি। শ্মশানের সামনে একটা উঁচু ঢিপির ওপর কয়েকজন ঝটিকা-শান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। প্রায়ই সেখানে মোটা মলকে দেখতে পাওয়া যায় (পূর্ব্বে সে ছিল গ্রুপ দলপতি বর্ত্তমানে মাষ্টার সার্জেণ্ট)—শুল্‌জের সঙ্গে একসাথে সে এখন শ্মশানভূমির প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হয়েছে। দীর্ঘকায়

ডাঃ মেঙ্গেলও সেখানে রয়েছে—নামটা বহু বছর ধরে বন্দীদের কাছে গণহত্যার বিভীষিকার সাথে জড়িয়ে ছিলো।

মাঝে মাঝে ক্যাম্প কমাণ্ডেন্ট কারমের তার সব সময়ের সহচর সোফারটিকে নিয়ে হাজির হয়—লোকটা শিবিরের মেয়েদের ওপর অত্যাচার করতে ভারী উৎসাহী। পার্শেলকে সব সময়ই এখানে দেখা যাবে। নিখুঁত পোলিশ বলতে পারে, ১৯৩৯ সালে মোদলিনের যুদ্ধে পোলিশ সৈন্য হিসাবে যোগ দিয়েছিলো।

রাজনৈতিক বিভাগের প্রতিনিধিরাও কোন কোন সময় উপস্থিত থাকে। সার্জেণ্ট আরবেরকে (চুচ টেফ বলেও অনেকে ডাকে—সঠিকভাবে কেউ তার নাম জানে না) বহুদূর থেকেই ভালোভাবে চেনা যায়—মাথার খুলিটা অদ্ভুত দেখতে, চোয়াল বেরিয়ে আছে কোদালের মত। রাজনৈতিক বিভাগের অধ্যক্ষ, হাজার হাজার মানুষের মরণ-বাঁচনের কর্তা গ্রাবনার, কমপক্ষে চারশ' পোলবাসীর মৃত্যুর জন্য দায়ী লাচমেন, পোলদের 'যম' বোগার এবং উওজ শহরের কাছাকাছি একটা মিলের ভূতপুর্ব মালিক আলব্রেশ্‌ট—প্রভৃতি সবাইকেই এখানে দেখা যায়।

ওরা আসে এই ধোঁয়া আর রক্তের পরিবেশের স্বাদ নিতে এবং চুল্লীর জন্য মানুষ বাছাই পর্যবেক্ষণ করতে (অবশ্য এ সুযোগে কিছু মূল্যবান গহনা এবং চকলেট পকেটে পুরে নেয়)।

এই উঁচু ঢিপি পর্যন্ত বন্দীরা পাঁচজনের সার দিয়ে আসে। তারপর একজন একজন করে ঝটিকা শান্ত্রীদের একটা দলের সামনে দিয়ে এগুতে হয়। রাস্তাটা ওভাবে তৈরী, এখান থেকে বিশ গজ সোজা গেছে তারপর হয়েছে দুভাগ—বাঁ দিকে ক্যাম্পে ফেরার রাস্তা, ডানদিকে শ্মশানে পৌঁছে দেবে।

এগিয়ে চলার সাথে সাথেই এখানে বাছাই চলে, এক মুহূর্ত্তেরও বিরতি নেই। বেশীর ভাগই যায় ডান দিকে, অল্প কয়েক জন মাত্র যাদের ঝটিকা শান্ত্রীরা আলাদা করে দেয় তারা বাঁপাশের রাস্তা দিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসে। প্রথম সারি সোজা এগিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে আর অপর দলটিকে আরও কয়েক সপ্তাহ কাটাতে হয় শিবিরের বিভীষিকার মধ্যে।

ডান দিকে এগিয়ে যায় বৃদ্ধ, পঙ্গু, শিশু, বাচ্চা কোলে মেয়েরা এবং দুর্বল ক্ষীণজীবি মানুষেরা। বাঁ দিকে যায় সুন্দরী যুবতী ও সবল যুবকেরা। কোন দলই জানেনা যে কতগুলো শয়তান মুহূর্তের মধ্যেই নাৎসী কানুন অনুযায়ী তাদের সম্পর্কে রায় জানিয়ে দিয়েছে।

মদ কিংবা অন্য কিছু নেশায় তারা চুর হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে—কারণ প্রতিদিন টিপির ওপর দাঁড়িয়ে মৃত্যু নিয়ে খেলা করা সহজ কথা নয়। একটানা মানুষের স্রোতের দিকে তারা কমই তাকায়। ক্লান্ত হাত নিজে নিজেই ইঙ্গিত করে—ডান দিকে, ডান দিকে····বাঁ দিকে ডান দিকে, ডান দিকে········বাঁ দিকে····ডান দিকে ডান দিকে········বাঁ দিকে········। মন তাদের সুখ কল্পনায় বিভোর। এত সোনা যখন জোগাড় হয়েছে নাৎসী পার্টির জন্য তখন রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, যুদ্ধফ্রণ্টে পাঠানোর ভয় এবার নিশ্চয়ই কেটে গেলো। এর পরও যা রয়েছে তাতেই নিরাপদে বৃদ্ধ বয়সে জীবন কেটে যাবে। স্ত্রী পুত্রের জন্য থাকবে প্রচুর··········তাদেরও সমস্ত জীবন সুখেই কাটবে।

········জীবন, জীবন-মৃত্যু········মৃত্যু, মৃত্যু-জীবন····ডানদিকে ডানদিকে ········বাঁ দিকে········।

প্লাটফরমের উল্টো দিকে শৌচাগারের পেছনে কিছু বন্দী মহিলা লুকিয়ে আছে। কাঁটা তারের ভেতর দিয়ে তারা লোক বাছাই দেখছিলো। তাদের মধ্যে অনেকেই ইহুদী। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পরিবারের কোন সংবাদই পাচ্ছে না। রাজনৈতিক বিভাগের কর্মচারী এডিথলিঙ্ক দু পা এগিয়ে গেলো তারের দিকে। কিছুক্ষণ একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দম বন্ধ করে চীৎকার করে উঠলো :

"আমার বোন সজ্‌রিকা।"

অন্যরা বুঝতে পারলো না ভীড়ের মধ্যে কোনটী তার বোন। এডিথ গোড়ালীর ওপর ভর করে উঁচু হয়ে দেখতে লাগলো নুতন যারা ট্রেন থেকে নামছে। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখ দুটো ভয়ে বেরিয়ে আসছে।

"আমার মা·······বাবা ···ঠাকুমা·······কাকীমা·······গোটা পরিবারটাই এসে গেছে।"

কোন লুকোচুরী না করে সে চীৎকার করে উঠলো :

"সজরি সজরি····বাচ্চাটাকে ঠাকুমার কোলে দিয়ে দাও"

শিশু কোলে নিয়ে একজন যুবতী ক্যাম্পের দিকে ফিরে তাকালো। কাঁটাতারের পেছনে দাঁড়ানো বোনকে চিনতে পেরে সে তার হাত নাড়লো। এডিথ আবার জোরে বললো "বাচ্চাটাকে ঠাকুমার কাছে দিয়ে দাও।"

বোনের কথা শুনে সে যে তার সন্তানকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা না বুঝেই সজ্‌রি পেছনে যে বৃদ্ধটি আসছিলেন তার কোলে বাচ্চাটাকে দিয়ে দিলো। অনেক দেরী হয়ে গেছে, আর কোন কথা বলা কিংবা ইঙ্গিত করা সম্ভব নয়। পুরো পরিবারটা ঝটিকা বাহিনীর দলের সামনে এগিয়ে গেলো। চোখের সামনে এডিথ দেখছে—সবাইকে ডান দিকে পাঠানো হ'লো শুধু সজরিই বাদ পড়েছে।

কামানো মাথা নিয়ে টুকরো কাপড়ে কোনমতে শরীরটাকে ঢেকে শিবিরের দরজার দিকে তারা এগিয়ে আসছে। বারে বারে পেছনে তাকাচ্ছে, দেখছে পরিবারের অন্য লোকেরাও আসছে কিনা। বেশীর ভাগই কালো হয়ে গেছে, মাথাগুলো দেখাচ্ছে একেবারে নীল। তাদের সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য আর যৌবনের উজ্জ্বলতা দিনে দিনে শুকিয়ে যাবে, শিগ্‌গীরই জার্মানীতে চালান যাবার জন্য বিরাট একদল অপেক্ষা করছে মেয়েদের শিবিরে। তারা ডোরা কাটা ধূসর রঙের ঢিলে পোষাক পরেছে। অন্যরা যাদের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে তারা জমা হচ্ছে তথাকথিত "সি" ক্যাম্পে।

ক্যাম্পটা পুরুষদের শিবিরের সামনেই। মাঝখানে একটা রাস্তা আলাদা করে দিয়েছে। পাশেই পরিবার নিয়ে থাকার তথাকথিত শিবির। বর্ত্তমানে বোহিমিয়ার ইহুদী পরিবারগুলো রয়েছে। অন্যান্য শিবিরের মত 'সি' ক্যাম্পের দরজাও প্লাটফরমের উল্টোদিকে রাস্তার ওপরই খোলা, —রাস্তাটা পৌঁছে দেয় ৩নং ও ৪নং চুল্লীতে।

যে রাস্তাটা ৩নং ও ৪নং চুল্লীর দিকে চলে গেছে (১৯৪২ সালে পোল মহিলারা বনের মাঝে এরাস্তা তৈরী করেছিলেন) তারই ওপর দিকে

রয়েছে কতগুলো নূতন ব্যারাক বাড়ী—বন্দীরা কেন যে এ গুলোকে "মেক্সিকো" বলে ডাকে সে কথা কেউ জানেনা।

জরুরী অবস্থার জন্য এগুলো তৈরী। আলো ও জলের কোন ব্যবস্থা নেই। মাটি থেকেই কাঠের দেওয়াল উঠেগেছে, ছাদগুলোও ফুটো। তাঁবু খাটাতে যতক্ষণ সময় লাগে তাতেই এবাড়ী তৈরী হয়ে যায়।

এ অংশটা স্থায়ী বাসিন্দাদের জায়গা নয়, পাকাপাকি শিবিরও নয়। শিবিরের কোন পরিচালক নেই, রান্নাঘর কিংবা ময়লা পরিষ্কারের কোন ব্যবস্থাও নেই। "মেক্সিকো" অনেকটা শাখাশিবির বা উপনিবেশের মত। জরুরী অবস্থায় "সি" ক্যাম্পে বন্দী বেশী হলে এটাকে কাজে লাগানো হয়—চার ধারে কাঁটা তারের কোন বেড়াও নেই।

শিবিরের এ দু অংশ থেকেই বন্দীদের চালান দেওয়া হয়। হাঙ্গেরিয়ান ইহুদীদের এখান থেকেই চালান দেওয়া হবে জার্মানীতে আর না হয় শ্মশানে। সেজন্যেই এখানে কোন মেরামতের কারবার নেই—ছাদের ফুটোও সারানো হয়না, নর্দমাও কখনো তৈরী হয়না। সব সময়ই একটা অস্থায়ী ভাব, যদিও বাসিন্দার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। জুনমাসে "সি" ক্যাম্পে ছিল ২০ হাজার ইহুদী মহিলা, মেক্সিকোতে ৮ হাজার। এর ওপরও নূতন লোক আসতে লাগলো, জুলাই মাসে এ এলাকার মোট সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৪ হাজার।

"মেক্সিকো।" মেক্সিকো।" সমগ্র শিবিরের মধ্যে এখানেই সবচেয়ে বিজাতীয় অদ্ভুত ব্যবস্থা।....শিবিরের সমস্ত সমস্যাই এখানে চরম আকার নিয়েছে, ঝটিকা বাহিনীর লোকেরা নূতন বন্দী আমদানী নিয়েই ব্যস্ত। কোন সমস্যা নিয়ে কারুর মাথা ঘামানোর সময় নেই। কেউ এখানে কোন নজর দেয়না। যারা দুর্বল তাদের ওপর সুযোগ নেওয়ার পক্ষে সমর্থ লোকেদের এটাই সব চেয়ে ভালো জায়গা।

বড় বড় শহরে অর্থনৈতিক পার্থক্য বেশীকরে চোখে পড়ে। কিন্তু বন্দী শিবিরের জীবন আরও চমকপ্রদ আরও কঠোর, বিশেষ করে বন্দীদের সকলেরই যখন সমান অবস্থা। এরা সবাই নিঃশেষ হবার জন্যই এখানে অপেক্ষা করছে। শিবিরের অন্যান্য অংশে যে সব সমস্যা খুব অল্পই দেখা

যায় সে গুলো মেক্সিকোতে অত্যন্ত স্পষ্ট কারণ নিজের লোভ আর পাশবিকবৃত্তি লুকিয়ে রাখতে কেউ চেষ্টাই করে না। অন্যায় করার জন্য এখানে কোন অজুহাতই দরকার করে না।

বড় গোলাবাড়ীর মতই ব্লকগুলোর অভ্যন্তরভাগ খালি পড়ে আছে। সমস্ত কম্বল জমা করে রাখা হয়েছে মাঝখানের ফাঁকা জায়গায়। এখানে কোন মাচান তৈরী হয় না, রাতে মেয়েরা মাটিতেই ঘুমায়।

দুর্বল, নোংরা, ফ্যাকাশে মানুষেরদল ব্লকের বাইরে দেওয়ালের ছাওয়াতে দারুণ সুর্যতাপের হলকার মাঝে প্রায় উলঙ্গ হয়েই শুয়ে থাকে। যে ছেঁড়া পোষাক তারা পরে আছে তাতে বহুদিন আগেই কাজ চলছিলো না। ....কেউ পরে আছে শুধু স্কার্ট, কেউ শুধু এপ্রন। দিন দিন. তাদের নগ্নতা বেড়েই চলেছে, ক্যাম্প সিনিয়ররা তাদের পাহারা দেয়। ওদের লাঠীর জন্য কেউ ব্যারাক থেকে দুরে যেতে পারে না।

গরমের দিনে জলের অভাবে এদের জীবন দুর্বিসহ, আবার বর্ষাকালে কাপড়ের অভাবেও দুঃখের অন্ত নেই।

খাবার সময় হতভাগ্য ক্ষুধার্তের দল সুপের পাত্রের জন্য রান্নাঘরের চার পাশে জড়ো হয়। বৃষ্টি পড়ছে—শুধু ছোট একটি সার্ট পরে আছে, কারুর জ্যাকেটটা হয়ত নিতম্ব পর্যন্ত। দিন দিন শুকিয়ে যাওয়া মেয়ের দল খালিপায়ে কাদার ওপর দিয়ে সুপের পাত্র নিয়ে চলছে। ছেঁড়া কাপড়ে কারুর উরুত দেখা যাচ্ছে, কারো বা স্তন বেরিয়ে পড়েছে ছেঁড়া সার্টের ফাঁকে।

কিছু করার উপায় নেই। প্রথম দিন এসেই যে ছেঁড়া পোষাক পেয়েছ তাই নিয়েই তারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, দিনে চলাফেরা করছে, রাতে ঘুমোচ্ছে।

সবাই বলে মেক্সিকোতে মেয়েরা তাদের নারীসুলভ ভাব আর শিষ্টাচার হারিয়ে ফেলে। একজন কর্মচারিনী চলেছে উঁচু হিল জুতো পরে, মাথায় রয়েছে রঙীন রবারের টুপী। খানিকটা দুরে দেওয়ালের ওপরে আরামপ্রদ ঘরে বসে আছে ব্লক সুপারভাইজার, কিংবা অন্যকোন কর্মচারিণী। পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিখুঁত ছাঁটকাটের কেতাদুরস্ত

পোষাক, ভালো মোজা আর উঁচু হীলের জুতো, সুগন্ধে ভুর ভুর করছে চুল, বেশ কায়দা করে আঁচড়ানো। ঘরের মাঝে বসে আছে—আত্ম-সন্তুষ্টিতে মৃদু মৃদু হাসছে।

বন্দীশিবির হিসাবে ঘরগুলো বেশ বড়লোকী চালে সাজানো। খাঁটি পারশিয়ান গালিচা পাতা, দামী হাঙ্গেরিয়ান কাপড়ের পর্দা লাগানো, আসবাবও তাই দিয়ে ঢাকা। হাঁসের পালকের মত নরম বিছানা—নীল, সোনালী কিংবা ফুল আঁকা সাটিনের কাপড়ে ঢাকা....এদের খাবার মোটেই শিবিরের সাধারণ স্যুপের মত নয়। আলাদা রাঁধুনী তাদের জন্যে এবং তাদের কয়েকজন বাছাই করা বন্ধুর জন্য রান্না করে।

*　　　　*　　　　*

জুলাই মাসের শেষে "মেক্সিকোর" "সি" অংশের ইহুদীদের জার্মানীতে চালান দেওয়া সুরু হলো। মেয়েরা বেশ ভালো জামাকাপড় পরে সুন্দর ট্রেনে চেপে যাত্রা সুরু করলো।

কিছুদিন বাদে আগষ্টের প্রথমদিকে উওজ থেকে ইহুদীদের চালান আসতে লাগলো। আগের মতই প্লাটফরমের ওপর বাছাই চললো, বেশীর ভাগই পৌঁছে গেলো বৈদ্যুতিক চুল্লীতে। খুব অল্প অংশই শিবিরে স্থান পেলো।

যারা বুঝতে পারলো তাদের পরিবারের সবাইকে সমাধি দেওয়া হচ্ছে বা পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে তাদের অনেকেই একেবারে উন্মাদ কিম্বা অর্দ্ধউন্মাদ হয়ে যেতে লাগলো। উওজ সহরের একটা ইহুদী মেয়ে একদিন দিনের বেলা কাঁটাতারের বেড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারে তখন বৈদ্যুতিক কারেণ্ট ছিল না। তারের ওপর উঠে ক্যাম্পের মাঝখানের রাস্তায় নেমে যেতে চাইলো।

জোর করে টানা হেঁচড়ার পর তাকে নামিয়ে আনা হলো। রক্তাক্ত দেহে মেয়েদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে। একটা চিন্তাই তার মন জুড়ে রয়েছে—বুঝতে পারছেনা আবার ছাড়তেও পারছেনা। সামনের দিকে তাকিয়ে বারে বারে সে বলতে লাগলো—

"জার্মানরা মানুষ আর আমরা ইহুদীরাও মানুষ, একি সত্যি নয় ? আমরা ইহুদীরাও মানুষ, জার্মানরাও ঠিক তাই...."

* * *

জুনমাসের শেষে একদিন সকালে বন্দীরা যখন কাজের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়ালো তখন দেখলো অদ্ভুতব্যাপার,—সমস্ত চেক্ শিবিরটাই খালি। কারুর ঘুম ভাঙেনি, কেউ জানতে পারেনি কখন ঝটিকা বাহিনীর লোকেরা এখানকার একবছরেরও বেশী পুরানো বাসিন্দা চেক্ পরিবার গুলোকে গ্যাস চেম্বারে নিয়ে গেছে।

কয়েক সপ্তাহ বাদে একদিন রাত্রে পুরুষদের শিবির, হাজার হাজার মানুষের চীৎকারে জেগে উঠলো। ব্যারাক থেকে একটু বেরিয়ে এসেই দেখা গেলো—জোরালো আলোতে ঝটিকা সৈন্যরা জিপসী ক্যাম্পের মেয়েদের ও বাচ্চাদের এক জায়গায় জড়ো করছে। পাঁচজনের সার দিয়ে রাস্তায় নেমে এসে শ্মশানের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য তাদের আদেশ দেওয়া হ'লো। তারা প্রতিবাদ করছে আর তারই চীৎকার সমস্ত শিবিরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সমস্ত রাত ধরেই চীৎকার চললো—সকালে দেখা গেলো জিপ্‌সী ক্যাম্পটা সম্পূর্ণ খালি। প্রতিরোধের ক্ষমতাহীন সাহস বর্বরতার কাছে অর্থহীন।

৪২,০০০ উল্কি না দেওয়া ইহুদী এখানে বাস করতো তার মধ্যে ১৫,০০০ হাজার পাঠানো হ'লো জার্মানীতে, শরৎ কাল পর্যন্ত বেঁচে রইলো ৫০০০ হাজার ; বাদবাকী সকলের স্থান হ'লো বৈদ্যুতিক চুল্লীতে।

* *

বাছাইয়ের সময় যে সমস্ত ইহুদীকে ডানদিকে পাঠানো হ'তো তারা সিধে এগিয়ে যেতো মৃত্যুর মুখে। মাতাল ঝটিকা সৈন্যরা যখন হাতটুকু নাড়িয়ে তাদের জীবনের ওপর রায় দিয়ে দেয়, তখুনি গ্যাস ঘরের প্রস্তুতি সুরু হয়ে যায়। পরিষ্কার বাতাসের জন্য ঘরের দরজা জানালা খুলে দেওয়া হয়। হতভাগ্যদের একটু বাদেই সেখানে ঢোকানো হবে।

এই একমাত্র সময় যখন তাদের বেশীক্ষণ বসে থাকতে হয়না, কয়েকঘণ্টা মাত্র, যতক্ষণ না তাদের আগের দলকে গ্যাস ঘর থেকে

বের করে না আনা হয়। ডানদিকে মোড় ঘুরেই তারা রাস্তার ওপরে ১নং-২নং বৈহ্যুতিক চুল্লীর সামনে এসে পড়ে।

কোনটাতে ঢুকতে হবে সেটা নেহাতই ভাগ্যের ব্যাপার, আর তাতে কিছু এসেও যায় না। ইহুদী পরিবারগুলো ভয়ে কাঁপতে থাকে যখন তাদের আলাদা করা হয়। সবাই এক বাড়ীতে ঢুকতে চায়—মা মেয়ের পাশ ঘেসে দাঁড়ায়, বাবা ছেলের পাশে।

ঐ ধুমায়িত চিমনী দেওয়া বাড়ী সম্পর্কে আমরা যা জানি ওরা তা জানে না, ভাবতেও পারেনা কি ধরণের বাড়ীতে ওরা ঢুকছে, অসংখ্য মানুষের দলকে বোকা বানানো হয়।

ইলেকট্রিশিয়ানরা প্রায়ই সেখানে কাজ করতে যেতো। তাদের কাছ থেকেই জেনেছি—বাড়ীতে ঢুকেই প্রথম ঘরটা বেশ বড়, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন জাহাজের 'ষ্টেটরুমের' মতো। সরানো যায় এমন কোন জিনিষপত্রই সেখানে নেই, সব কিছু ভালোভাবে আটকানো।

ডাক্তারদের ওয়েটিংরুমের মতো দেওয়ালের চারধারে ধাতুদিয়ে তৈরী চেয়ার লাগানো।....বন্দীরা হ'লের মধ্যে পোষাক খুলে যত্নকরে রাখে, মনে করে একটু বাদেই আবার সেখানে ফিরে আসবে। শ্মশানে ইহুদী কর্মচারীরা তাদের হাতে সাবান, গামছা ইত্যাদি দেয়। মনের মধ্যে সকলের নিরাপত্তার ভাব জেগে ওঠে। সবাই মিলে বিরাট লম্বা বারান্দায় বেরিয়ে আসে।

এবার বন্দীরা বড় একটা হল ঘরে ঢোকে—ঘরে কিছুই নেই, শুধু দেওয়ালের ওপর কয়েকটা বন্ধ ফোকর রয়েছে দলের শেষ লোকটি পর্যন্ত ঘরে ঢুকলে দরজা বন্ধ হয়ে যায় তারপর দেওয়ালের সেই ছিদ্র দিয়ে নেমে আসে নীল গ্যাস।

কিন্তু গ্যাসে মরা অত সহজ নয়। মৃত্যু তাড়াতাড়ি আসে না। জার্মানদের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিরাট সংখ্যায় ইহুদীকে হত্যাকরা হবে কিন্তু তার জন্য গ্যাস কম খরচা করা প্রয়োজন।

বেশী মাত্রায় গ্যাস ব্যবহার করলে সাথে সাথেই মৃত্যু, কিন্তু ইহুদীরা সে মাত্রায় পায় না তাই দুঃসহ যন্ত্রণায় ভুগতে হয়।

দরজা খোলার সাথে সাথে ইলেক্ট্রিশিয়ানরা মাঝে মাঝে সেখানে যায়। তারা বলেছে—হতভাগ্যদের ভঙ্গী দেখলেই বোঝা যায় যে মৃত্যুর বিরুদ্ধে তারা প্রাণপণ লড়েছে, উন্মত্তের মতো চেষ্টা করেছে শবের ওপর দিয়ে দেওয়াল বেয়ে উঠতে। মৃত্যুর সময় তাদের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে, পেট ফুলে উঠেছে, মুখের ওপর রয়েছে ভয়াবহ আতঙ্কের ছাপ। দরজা বন্ধ হবার পর যে সময়টুকু থাকতো তাতেই তারা বুঝতো—এ হ'লো এক মৃত্যু ফাঁদ, জার্মানরা কৌশল করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে শ্মশানের বন্দী কর্মচারীরা।

মৃত্যুর সেই আর্তনাদ—সমস্ত শক্তি দিয়ে যে চীৎকার তারা করেছিলো, সে চীৎকার ছিল তাদের পরে যে ভায়েরা আসবে তাদের কাছে এক সাবধানবাণী। সে চীৎকার কিন্তু বাইরে থেকে একটুও শোনা যায় নি।

গ্যাস ঘরগুলো বৈদ্যুতিক চুল্লীর চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি কাজ করে। যদিও চুল্লী দিনরাত কাজ করে—ট্রাকের পর ট্রাক কয়লা আর কাঠ জোগানো হয়, যদিও মৃতদেহ পোড়ানোর জন্য জরুরী গর্তেও কাজ চলছে তবুও গ্যাসের কাজের সাথে পোড়ানোর ব্যবস্থা পাল্লা দিতে পারে না। শ্মশানের দেওয়ালের পাশে প্রতিদিনই শবের পাহাড় জমা হতে থাকে।

এ বছর গ্রীষ্মকালে ভীষণ গরম পড়েছে। মাতাল ঝটিকা সৈন্য আর বিশেষ শ্রেণীর মাতাল বন্দীদের এতটুকু অনুভূতি নেই—তারা দুর্গন্ধও পায় না, অসুখের ভয়েও ভীত নয়। একটু হাওয়া এলেই সমস্ত শিবির শবের গন্ধে ভরে যায়।

* * *

শ্মশানের ওপর নেমে এসেছে নীরবতা, শিবিরগুলোও নিস্তব্ধ। সেই নীরবতার মাঝে ইহুদীদের একটা শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে প্লাটফরমের ধার ঘেঁসে। অদৃশ্য এক ঝোড়ো হাওয়ায় এরা সবাই নিঃশেষ হয়ে যাবে। সেই হাওয়া তরঙ্গায়িত ঘন ধূম্রকুণ্ডলীর আকারে বৈদ্যুতিক চুল্লীর চিমনী দিয়ে বেরিয়ে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশের বুকে।

"বার্কেনাউ-এর ধূসর আকাশ"—সেভেরিনা শ্মাগলেভস্কা

১৯৪০ সালের প্রথম দিকে অস্ভিয়েচিমের* শহরতলী যাশোল্ এ বন্দী শিবির তৈরী হতে শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় তামাক কারখানার বাড়ী আর অষ্ট্রিয়ান সৈন্যবাহিনীর ব্যারাকগুলোকে কেন্দ্র করেই ক্যাম্পের পত্তন। পরে বন্দী শিবির যে বিরাট আকারে গড়ে উঠলো সেটা মোটেই কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। জলাভূমি, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, পানীয় জলের একান্ত অভাব—এই ছিলো অস্ভিয়েচিমের-এর পরিবেশ, ঠিক ডাশাউ* শিবিরের মত। বেশ বোঝা যায় যে জার্মান কর্তৃপক্ষ এজন্যেই জায়গাটা পছন্দ করেছিলেন যাতে করে জীবন ধারণের পক্ষে সেটা হয় খুবই অনুপযোগী— বাসিন্দারা যেন তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।

*ব্রচ্উয়াভ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক জুনকার ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারীতে হিমলারের নির্দেশে অস্ভিয়েচিম শিবিরের জল পরীক্ষা করেন। তাঁর লিখিত বিবৃতিতে তিনি জানান যে জল মুখে তোলা সম্ভব নয়। ক্যাম্পের অধিনায়ক ঝটিকা বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলো—জল না ফুটিয়ে পান করা তো দূরের কথা খাবারের থালা বাসনও যেন ধোয়া না হয়। বন্দীদের বেলায় তা কোন দিনই করা হয়নি।

১৯৪০ সালে মিলিটারী ব্যারাকে অবস্থিত মূল ক্যাম্পকে বাড়িয়ে তোলার কাজ শুরু হয়। সমগ্র সাইলেসিয়া জুড়ে গড়ে উঠলো মিলিটারী ব্যারাকগুলি কেন্দ্র করে ৩৯টি উপ শিবির।

---

* জার্মানরা আউশ্ভিৎজ বল্‌ত, পোলিশ ভাষায় অস্ভিয়েচিম্।
* জার্মানদের তৈরী আরেকটি কুখ্যাত বন্দীশিবির।
* ইংরাজীতে বলে রক্লো।

এই উপ শিবির গুলোর মধ্যে ব্রেজিন্‌কা (বার্কেনাউ) ছিলো ব্যারাক-গুলো থেকে দুমাইল দূরে। শিবিরের পরিধি ছিলো ৪৩০ একর। জার্মানদের গণহত্যার কাজে জায়গাটি বেশ গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করেছিলো।

অস্‌ভিয়েচিম্‌ শিবিরের প্রথম বাসিন্দা ছিলো ৩০জন দাগী জার্মান আসামী। ১৯৪০ সালের মে মাসে ওদের জার্মাণী থেকে আনা হয়েছিলো। পরে তাদেরই নিযুক্ত করা হ'লো—ক্যাম্প সিনিয়র, ব্যারাক সিনিয়র, শ্রমিক পরিদর্শক, ফোরম্যান প্রভৃতি শিবির পরিচালকের পদে। পোলিশ রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্বন্ধে তাদের শিক্ষা দেওয়া হোলো। কোন দয়া মায়া না রেখেই বন্দীদের ওপর অত্যাচার করা বা হত্যা করা যেতো।

১৯৪০ সালের ১৪ই জুন প্রথম পোল বন্দীরা শিবিরে এসে পৌছলো তাদের পেছনে এলো সংখ্যাহীন পোলবাসী এবং জার্মান অধিকৃত এলাকার বিভিন্ন জাতির বন্দীরা। পোলবাসী এবং ইহুদীদের পরে এলো রাশিয়ান-যুগোশ্লাভ-ফরাসীরা। সংখ্যার যেন শেষ নেই। পোলিশ ইহুদী ছাড়াও হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মানী গ্রীস এবং হলাণ্ড থেকে ইহুদীদের আনা হ'লো।

যে বন্দীরা শিবিরে এসেছিল তাদের মধ্যে ছিল সব বয়সের নারী পুরুষ, সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ। সকল রকম জীবিকা ও মতের মানুষ যারা ছিলো সম্পূর্ণ নির্দোষ। বেশীর ভাগের সাথেই রাজনীতির কোন সংশ্রব ছিলো না। শুধু মাত্র পোল, ইহুদী আর সোভিয়েত যুদ্ধবন্দী হবার অপরাধেই তাদের হ'তে হলো দাস শ্রমিক, বরণ করতে হ'লো মৃত্যু।

ক্যাম্পের প্রতিটি বন্দীর জন্য নিখুঁত নথিপত্র রাখা হ'তো, বন্দীরা শিবিরে পৌঁছানোর সাথে সাথেই ক্যাম্প অফিস তাদের নম্বর অনুযায়ী জবানবন্দী সহ তালিকা প্রস্তুত করতো। এই তালিকা অনুযায়ী তৈরী হ'তো বন্দীদের রাজনৈতিক বিভাগ আর ব্যক্তিগত ফাইল। ক্যাম্পের বিভিন্ন পরিচালক বিভাগ—রাজনৈতিক অফিস, শ্রম-অফিস এবং পোষাকের বিভাগও এই ধরণের নথিপত্র রাখতো।

যে বিরাট সংখ্যক মানুষকে বন্দী শিবিরে আনার সাথে সাথেই গ্যাসে

হত্যা করা হ'তো তাদের কোন হিসেব থাকতো না। তাদের সম্পর্কে শুধু কতজন এলো আর কতজন গ্যাসে প্রাণ দিলো সেই সংখ্যাটুকু উল্লেখ করে রিপোর্ট পাঠানো হ'তো। রাজনৈতিক বিভাগও এই মৃত্যুপথ যাত্রীদের হিসেব রাখতো। এ তালিকার নাম দেওয়া হয়েছিল "ট্রান্সপোর্ট লিষ্ট"। পরে ক্যাম্প ধ্বংস করার সময় জার্মানরা এই প্রমাণগুলো পুড়িয়ে ফেলে।

ক্যাম্পের ফটক পার হ'লেই বন্দীরা একটা করে নম্বর পেতো তারপরই ফুরিয়ে যেতো তাদের সমস্ত সত্ত্বা সে হয়ে পড়তো শুধু একটা সংখ্যা। চার লক্ষের ও বেশী বন্দী ক্যাম্পে প্রবেশ করেছিলো। প্রতিটি বন্দী তার জামার সাথে সেলাই করা নম্বরটা পরতো। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে সংখ্যাটা বন্দীদের বাঁহাতের ওপর উল্কি দিয়ে এঁকে দেওয়া স্বরু হলো। বন্দীর সঠিক পরিচয়ের জন্য একটা সাদা ফিতার ওপর নম্বরটা লেখা থাকতো, আর ছিলো শ্রেণী নির্দেশক রঙীন ত্রিভুজ এবং জাতির নামের আগু অক্ষরটি। একটা চিহ্ন সেলাই করা থাকতো কোটের ওপর বাঁপাশে বুকের কাছাকাছি। অপরটি পায়ের কাছে ট্রাউজারের ওপর। রাজনৈতিক বন্দীদের লাল ত্রিভুজ আর কালো চিহ্ন ছিলো বেশ্যা ও দালালদের, সবুজ দাগী আসামীদের, ও বেগুনি ধর্মপ্রচারকদের। ইহুদীরা প্রথমে "ডেভিডের তারা" চিহ্ন ধারণ করতো; পরে একটা ত্রিভুজের ওপর হলদে দাগ থাকতো।

বন্দীরা যতদিন কর্মক্ষম থাকতো ততদিন দাসশ্রমিক হিসাবে খাটানো হ'তো তারপর একদিন যখন সে নিঃশেষ হয়ে যেতো তখন তার ভাগ্যে জুটতো মৃত্যু।

"অস্‌ভিয়েচিম্‌ (আউশ্‌ভিৎজ্‌) কর্মচারীদের বিচার থেকে।"

অন্ধকার রাত। বিরাট একটা ঘরের ভেতর অদ্ভুত ধরণের মাচার ওপর ঘুমোচ্ছে প্রায় হাজার খানেক মহিলা। দুর্ভেদ্য আঁধার—এক ধরণের বাষ্প আর গন্ধে ঘরটা ভরে আছে। কম্বলগুলোকেও মনে হয় অন্ধকারেরই অংশ—সূর্যালোক কোন দিন পায়নি ওগুলো। যতখানি সম্ভব ঢাকা দিয়ে শুয়ে থাকো—একটুখানি গরমভো ক্লান্ত শরীরকে ওরা দেয়—কম্বলগুলোর কাছে সবাই কৃতজ্ঞ। ওগুলোর পুরানো ইতিহাস মনে পড়লে অবশ্য তোমার ঘেন্না করবে। গাদাগাদি করে অসাড় দেহ পড়ে আছে শক্ত বিছানার ওপর। কোন কোন সময় চার হাত জায়গার মধ্যে থাকতে হচ্ছে দশজন মানুষকে। স্বপ্নের মাঝে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলেই মনে পড়ে ভীষণ সেই শিবিরের কথা। ঘুমন্ত পাশের মানুষটির কাছে গেলে সে যদি প্রিয়জন হয় তাহলে আনন্দে মন ভরে ওঠে—হতাশায় ডুবে যাই যদি সে হয় কোন বিদেশী কিংবা শত্রু। নিদ্রাই হ'লো সবচেয়ে আপনজন। ক্লান্ত মানুষগুলোর ওপর তাড়াতাড়ি সে নেমে আসে, অসাড় করে দেয় তাদের চেতনাকে।····বন্দী শিবিরের রাত ভারী ছোট। কালো রাতের মাঝে তুমি যখন নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকবে বিছানার ওপর তখন-ভুলে যেতে হবে গত দিনের দুঃখের কথা—আগামী দিনের জন্য শক্তি অর্জন করতে হবে তোমাকে।

ঘুমন্ত ব্যারাকের নীরবতার মাঝে শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন সুরের অবিরাম কাশির শব্দ। মাঝে মাঝে স্বপ্নের মাঝে কেউ চীৎকার করে ওঠে—দিনের বেলায় যে জার্মান কথা গুলো তাকে আতঙ্কিত করে তুলেছিলো সে গুলোই সে আওড়ায়।

বন্দী শিবিরের বিভিন্ন কোণে ঘুম থেকে ওঠার বাঁশীর শব্দ বেজে উঠলো একই সাথে, মেয়েরা প্রত্যেকই তা শুনতে পেয়েছে। সাথে সাথেই দিনরাত কাজে একনিষ্ঠ রক্ষীদের উপস্থিতির শব্দ শুনতে পেলাম।

"এবার সবাই উঠে পড়"·· একটা হৃদয়হীন চীৎকার সমস্ত ব্যারাকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, রক্ষীরা তাদের লাঠী প্রত্যেকটি বিছানার ওপর ঠুকলো। একটানা অন্ধকার—মাচার ওপর থেকে চাপা আর্ত্তনাদ ভেসে আসছে, কেউ হয়তো এখুনি ঘুম থেকে উঠে ব্যাথায় টন টন করা শরীরটাকে প্রথমবারের মত নাড়ছে। জেগে ওঠাটাই এখানে সবচেয়ে কষ্টকর মুহুর্ত্ত। যদি তোমার প্রথম রাত হয় তাতেও কিছু এসে যায় না। এখানের দিন হতাশায় ভরা। প্রতিদিন ভোরেই তোমায় ঝেড়ে ফেলতে হবে গায়ের সমস্ত ব্যথা; যদি দীর্ঘদিন কাটিয়ে থাকো—অনেকদিন, তাহলেও কিছু এসে যায় না,—প্রতিদিন সকালেই মনে পড়বে আবার একঘেয়ে একটা দিন সুরু হ'লো। আবার নিজের শক্তি খোয়াতে চলেছো তুমি।

"এবার সবাই উঠে পড়ো"···বিরক্তিতে ভরা একটা চীৎকার শোনা যেতে লাগলো। আস্তে আস্তে সেই ক্রুদ্ধ স্বর জার্মান থেকে পোলিশ ভাষায় বদলে গেলো—রাতের পাহারাদারাটি বিকৃত উচ্চারণে অনর্গল বকতে পারে।

"শিগগীর উঠে পড়ো—যত নচ্ছার পাজী, গোবরপোরা বুদ্ধিজীবীর দল ····তাড়াতড়ি উঠে পড়····এক্ষুণি।"

হাতের লাঠীটা এবার শুধু বিছানায় ঠোক্কর দিচ্ছে না—ঘুমন্ত মেয়েরা পায়ে, হাতে, মাথায় গুঁতো খেতে লাগলো। গোলমাল সুরু হয়ে গেলো।

অসহায় ভাবে সবাই উঠে পড়লো। অন্ধকারের মাঝে বিছানার তলায় লুকানো জুতোগুলো তারা খুঁজছে—পরস্পরকে ধাকাধাক্কি করে রাতের বেলায় খোলা পোষাক পরতে লাগলো। জন্তু জানোয়ার থাকার মত জায়গা থেকে নেমে এলো সবাই। বেরুনোর পথটা সরু—মেয়েরা পিষে যেতে লাগলো, জায়গাটা আগেই ভর্ত্তি হয়ে গেছে। মাচার ওপর লোকগুলো থাকে বলেই রাতে এত মানুষ ব্যারাকে ধরে।

মাচা থেকে সবাই নামলে ঘরে তিলধারণের জায়গাটুকুও পেতে হয় অতি কষ্টে। অবশ্য ব্যারাকটা দিনের বেলা থাকার জায়গা নয়। বন্দীরা রাতে সেখানে শোয়—বাঁশী বাজলেই বেরিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে গভীর রাতে।

১৯৪২ সালের বার্কেনাউ। একটা জলাভূমিকে বিজলী তার দিয়ে ঘেরা হয়েছে। বিভিন্ন ব্লকের মধ্যে রাস্তা নেই। জলের এতটুকু ব্যবস্থা নেই। জঞ্জাল পরিস্কারের কোন বালাই নেই আর এ অবস্থাই চলেছিল শেষ দিন পর্যন্ত। নোংরা আবর্জনা, বিষ্ঠা পড়ে পড়ে পচছে, গন্ধ বেরুচ্ছে। বার্কেনাউ-র আকাশে একটা পাখীও নীচু দিয়ে উড়ে যায় না—ভগবান জানেন কেন? নাম ডাকার সময় বন্দীরা কষ্ট করে আকাশ পানে তাকিয়ে থাকে কিন্তু একটা পাখীও দেখা যায় না। দুর্গন্ধের জন্যে পাখীরাও বোধ হয় এ জায়গা এড়িয়ে চলে। সরকারী ভাবে বার্কেনাউ নামের কোন অস্তিত্ব ছিল না—এর নাম ছিলো আউশ্‌ভিৎজ দু নম্বর। শিবিরের কাঠামো দেখলেই বোঝা যায় যে দীর্ঘদিন এখানে মানুষ রাখাব জন্য এটা তৈরী হয় নি। বৈদ্যুতিক চিতায় পৌঁছনোর আগে এ যেন একটা বিশ্রামাগার। প্রায় বিশ তিরিশ হাজার, লোকের হিসাবে তৈরী হয়েছিলো এ শিবির। এভাবেই এর সুরু।

১৯৪১-৪২ সালের শীতকালে তারে ঘেরা মাঠের মধ্যে তৈরী হোলো একই ধরণের দু' সারি ব্যারাক—১০টি ইটের তৈরী, ১০টি কাঠের।

ঘর গুলোর না ছিলো মেঝে—না ছিলো ছাদ—শুধু একটু ছাউনি তার ভেতর দিয়ে বর্ষা আর বৃষ্টি নির্বিবাদেই পড়তো। ঘরের দরজায় যে চিহ্ন ছিলো তাতেই বোঝা যায় যে বাড়ীগুলো আস্তাবল—অসুস্থ ঘোড়ার চিকিৎসা করার পদ্ধতি সংক্রান্ত নির্দেশনামাও সেখানে লাগানো ছিলো। কোন কোন ব্যারাকে শেষ দিন পর্যন্তও এ চিহ্ন দেখা যেতো।

বার্কেনাউ শিবিরে লোক আসার আগেই তৈরীর সময় আউশ্‌ভিৎজ ক্যাম্পের বহু বন্দী কাদায় পড়ে মারা গেলো।

প্রথম দিকে কাঠের বাড়ীতে পোলরা ঢুকতে পারতো। ১৯৪২ সালেও বার্কেনাউ শিবির ছিলো শুধু ইঁটের বাড়ীগুলোকে কেন্দ্র করে। ভেতরের

কাঠামো লক্ষ্য করলেই সবাই বুঝতে পারতো প্রথমে ওর কি অবস্থা ছিলো। চার সারি খুপরী, ছাদ নেই, দু'হাত উঁচু পাতলা দেওয়াল দিয়ে আলাদা করা। দু সারি মধ্যিখানে আর দু সারি দেওয়ালের গায়ে লাগানো। মাঝখানে সরু দুটো রাস্তা—সহিসদের জন্য। তাদের চলার সময় দু পাশেই ঘোড়া থাকতো। প্রত্যেকটা ইঁটের বাড়ীতে থাকতো এ ধরণের ৫০টি খুপরী। ছোট ছোট জানালা আর ঘুলঘুলি দিয়ে খুব অল্প আলোই সেখানে আসতো। একটু বদলে নিয়েই আস্তাবলকে করা হ'লো মানুষের বাসস্থান।

প্রত্যেকটা খুপরীর মধ্যে দুটো মাচা—প্রথমটা মাটি থেকে দু হাত উঁচু—দ্বিতীয়টা তার থেকেও দু হাত। কাছাকাছি বাড়ী থেকে নিয়ে আসা দরজা দিয়ে তৈরী হ'লো মাচা। এ ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক ব্যারাকে ১৫০টি মাচা হ'লো শোয়ার জন্যে। প্রতি খুপরীতে তিনজন করে কাঠের মাচায়, একজন মাটিতে।

এক একটা মাচায় ছিলো দুটো করে গদি—পাশের পুকুরের ন পাউণ্ড খাগড়া দিয়ে তৈরী হতো (ক্যাম্পের নিয়ম অনুযায়ী নুতন গদি এভাবেই তৈরী হ'তো)। প্রত্যেকটা মাচা এখন ছয় থেকে দশ জন দখল করেছে। তার মানে যে খুপরী তৈরী হয়েছিলো একটা ঘোড়ার জন্য সেখানে এখন শুচ্ছে ১৮ থেকে ৩০জন মানুষ।

ব্যারাকের ভেতরটা দেখলেই মনে হয় এ যেন মুরগী কিংবা খরগোসের খাঁচা, নীচের মাচা সবচেয়ে খারাপ—ভিজে ঠাণ্ডা, কারণ বর্ষার সময় মাটির মেঝে কাদায় কাদা হয়ে যায়—পা পর্যন্ত ঢুকে যায়। অন্ধকার জায়গা, আলো প্রবেশ করেও প্রতি পদে বাধা পায়। নীচের মাচা খুবই নীচু, সোজা হয়ে বসাও যায় না। রাতে ইঁদুরের দল কামড়াতে আসে। মাঝের মাচার অবস্থাও সমান শোচনীয় তবে একটু বেশী আলো পায়। রাতের অন্ধকারে কাদায় ভরা বুট জুতো নিয়ে ওপর উঠতে গিয়ে প্রায়ই ঘুমন্ত মাঝের লোকের মাথায় আঘাত লাগে কিন্তু তবু ভালো—বিছানাটা অন্ততঃ শুকনো থাকে। ওপরের মাচানে আলো বাতাস বেশ আসে, সেখানে তুমি সোজা হয়ে বসতে পারো, এমনকি দাঁড়াতেও পারো। বর্ষাকালে অবশ্য সব সুযোগই উবে যায় ফুটো ছাদের দৌলতে। এ সত্ত্বেও ওপরের

মাচাকেই সব চেয়ে ভালো বলে ধরা হয়। ইঁটের ব্যারাকে কোন কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা নেই। বন্দী মেয়েরা ফিরে এসে রাতের অঁাধারে হাতড়ে হাতড়ে নিজেদের খাঁচায় ঢুকে পড়ে।

অন্ধকারেই ওরা কম্বল খুঁজে নেয়, পোষাক খুলে ফেলে। মাল গুদামে যারা কাজ করে তাদের কাছ থেকে একটা মোমবাতি জোগাড় করা ভারী কষ্টকর। নিজের খাবারের যদি অনেকখানি লোকসান করতে পারো তবেই তুমি রাতের বেলা আলো জেলে পোষাক থেকে উকুন মারতে পারবে। কিছু কিছু মেয়ে হাতড়েই একাজ করতে পারে। অন্যদের বড় উকুন মেরেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়—বাচ্চা আর ডিম বাদ পড়ে যায়।

অন্ধকার খুপরী। দু'চারটে মোমবাতির অস্পষ্ট আলোতে দেখা যাবে —নগ্ন ক্ষীণকায়, মাথা কামানো, ঠাণ্ডায় নীল হয়ে যাওয়া মেয়েরা উপুড় হয়ে পড়েছে একগাদা নোংরা কম্বলের ওপর, পোকা বেছে নিয়ে মাচার কোণে টিপে মারছে। ১৯৪২ সালে এই ছিলো ব্যারাকের ছবি। জলের অভাবে কোনদিনই ময়লা পোষাক ধোয়া যেতো না মাঝে মাঝে শুধু উকুন ঝেড়ে ফেলা হ'তো।

অপরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে বন্দীনীরা জেহাদ ঘোষণা করলো। বহু নতুন নতুন কায়দা তারা কাজে লাগালো। কিন্তু সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে যেতো। আগেই আমি বলেছি যে প্রত্যেকটি থাকে অনেক মেয়ে শুতো। বহু চেষ্টায় সকলে মিলে হয়ত তাদের কম্বল আর পোষাক থেকে উকুন তাড়িয়ে পরিষ্কার করলো কিন্তু সব কিছুই বরবাদ হয়ে যেতো যখন অন্য কোন ব্যারাক থেকে বন্দিনীরা এসে হাজির হ'তো। তারা হয়ত নিয়ে এলো ক্যাম্পের সহজলভ্য জিনিস—উকুন আর প্যাচড়া। একই কম্বলে শুতে হয়—সবাইকে আবার ভুগতে হ'লো। সুরু হ'লো নুতন করে পরিষ্কারের লড়াই।

ঘরের দুটো সরু পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাতের পাহারাদাররা ব্লক সুপার-ভাইজার ও ঘরের ওভারশিয়ারদের সাহায্যে বন্দিনীদের ঠেলে নিয়ে চলেছে দরজার দিকে। লাঠি আর হাতের গুঁতো চলেছে সমান তালে। বন্দিনীর দল এগুচ্ছে, ভোর রাতের সেই ভীষণ ঠাণ্ডায় বেরুতে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও

এগিয়ে চলেছে। কেউ আধা ঘুমন্ত, আধা কেউ অচৈতন্য—মাথায় ঠোকাঠুকি হচ্ছে, অপরের কাঁধে গড়িয়ে পড়ছে, অবস্থা এমনিতরো, তবুও তারা এগুচ্ছে।

কালো কম্বলে মুড়ি দিয়ে কে আছে তুমি তা ঠাহর করতে পারবে না। দোরের গোড়ায় পায়ে পায়ে যে কাদা হয়েছে তারই ছিটে আসছিলো। ক্যাম্প সীমানার চোখ ঝলসানো আলোতে চাঁদ আর তারা নির্জীব হয়ে গেছে। নুয়ে পড়া কালো ছায়ামূর্ত্তি ক্লান্ত ভাবে এগিয়ে চলেছে কাদার মধ্য দিয়ে—শুধু ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে তাদের পা জড়ানো। মাঝে মাঝে তাদের মুখ আলোতে আসছে আবার রাতের আঁধারে ডুবে যাচ্ছে। কতগুলো মুখ একেবারে নির্বাক, স্পন্দনহীন। অপূর্ব সুন্দর একটা শান্ত ভাব ছড়িয়ে আছে সে মুখে। মনে হয় সে মুখের অধিকারীর মৃত্যু হয়েছে বহুদিন আগেই। এমুখ কখনো ভোলা যায় না। অন্য অনেক মুখের সাথেই মিশে আছে বিকৃত উত্তেজনা আর ক্রোধ। একে সহজেই ভোলা যায়।

যাদের শক্তি এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি—যাদের পা বেশী ফুলে ওঠেনি তারা সকালে নাম ডাকার আগে দৌড়ে গিয়ে জল আনতে বেশ কিছুটা সময় পাবে। সমগ্র বার্কেনাউ ক্যাম্পে এ সময় জলের ভীষণ অভাব। যদি নিজের মাথার খুলিটি এস এস বাহিনীর হাতে ফাটাতে না চাও তাহ'লে রান্না ঘরে কিংবা রোগমুক্ত নতুন বন্দীতে ভর্ত্তি ব্যারাকে যাওয়ায় চেষ্টা না করাই ভালো। ১৫টি ইটের ব্যারাক আর ১৫টি কাঠের ব্যারাকের জন্য শৌচাগারের পেছনে একটি মাত্র কলে কিছু জল পাওয়া যায়। সকালে নাম ডাকার আগে কলটিতে বেশী পরিমানে জল আসে। কোন দিন অন্য সময় বেশীজল এলেও বন্দীদের ব্যবহার করার উপায় নেই-তারা তখন দূরে কাজ করছে। যদি তুমি খুব সকালে উঠতে পারো আর সেদিন যদি সত্যিই জল আসে তাহলে শত শত হাজার হাজার বন্দীর সাথে ধাক্কাধাক্কি করে জার্মান শান্ত্রীর লাঠির ঘা এড়িয়ে তোমার জলপাত্রে খুব বেশী হ'লেও একমগ জল পেতে পারো। মানুষের ঠেলায় যদি সে জল না পড়ে যায় তবে জল দিয়ে যা খুসী করতে পারো—ইচ্ছে

করলে খেতে পারো, কাপড় ধুতে পারো, আবার স্নানও করতে পারো।

বিজলী বাতির আলোতে ছায়ামূর্ত্তি গুলি এক হাঁটু কাদার মধ্যে দিয়ে অতি কষ্টে পা টেনে যাতায়াত করছে শৌচাগারে। কেউ কেউ যাচ্ছে আর বৃথাই চেষ্টা করছে নিজের শক্তিতে ওঠার জন্য। বারে বারে উঠতে গিয়ে আবার পড়ে যাচ্ছে, তাতে আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত যেখানে পড়েছিলো সেখানেই রয়ে গেলো। এখানে ওখানে পড়ে আছে প্রেতমূর্ত্তি গুলো—অনেকে গোঙাচ্ছে। অস্পষ্ট আলোতে বোঝাও যাবেনা কারা শেষ হয়ে গেছে আর কারা সাহায্য চাইছে।

ইতিমধ্যে ব্লক সুপারভাইজার ও রুম লীডাররা গুনতির সারি দেওয়াতে সুরু করেছে। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই ড্রিলের কোন ধারণা নেই। এমনকি হিসেব করতেও জানেনা, ফলে লোক সাজাতে আর গুনতে অনেক সময় লাগে।·······কফি বিলি সুরু হ'লো। সারাদিন খাটুনির আগে এই হ'লো আমাদের একমাত্র খাবার। ঠাণ্ডায় হাত কাঁপছে। উদগ্রীব হয়ে সবাই হাতে নিয়েছে টিনের মগটা—নীচে পড়ে আছে একটুখানি কালো রঙের কফি, কফির গরম ভাপটুকু উবে গেছে অনেকক্ষণ তবুও কাঁপা ঠোঁট পেতে চাইছে একটু গরম।

তারা গুলো নিবে এসেছে। এখনো উষার আলো ফোটেনি পূর্ব দিকে। ব্যারাকের সামনে বন্দীদের গোনা হয়ে গেলো। রুম লীডাররা এবার জ্বরে অসুস্থ এবং আমাশায় দুর্বল হয়ে যাওয়া মানুষদের এনে বসিয়ে দিলো টুলে আর মাটিতে। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু পথযাত্রী কয়েক জনকেও এনে শুইয়ে দেওয়া হলো—তাদেরও গুনতি হবে। অসহায় মানুষগুলো এলিয়ে পড়ে আছে ভিজেমাটিতে। দলা পাকিয়ে কম্বল ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের গায়ে।

একজন ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললো—"যাঁকে ওরা নিয়ে আসছে তিনি হ'লেন শ্রীমতি পিয়েৎকিয়েভিৎজ—পোলিশ সশস্ত্র বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনের স্ত্রী। যে কোন দিন উনি মারা যেতে পারেন। ওখানে শুয়ে আছেন শ্রীমতি জাহরুস্কা—একজন লেখিকা। বুদ্ধিজীবীরাই সবচেয়ে কষ্ট

পাচ্ছে। আরও রয়েছেন ওয়ারশয়ের ডাঃ গার্লিকা—স্ত্রীরোগের বিশেষজ্ঞ; তাঁরই পাশে পোলিশ রেডিয়োর শ্রীমতি প্রচলস্কা।

চোখ ঘুরিয়ে লাভ নেই—সব ব্যারাকের সামনে একই ছবি। সামনের দিকে তাকিয়ে জয়ের কথা ভাবতে পারো যা ওদের আজ শুইয়ে দিয়েছে হয়ত তোমাকেও একদিন দেবে।

আপন মনেই কে যেন বিড় বিড় করে উঠলো—"বার্কেনাউকে রহস্য জালের বেড়ায় ঘিরে রেখে ভালোই করেছে, ছেলেরা জানতেও পারবে না কি ভাবে তাদের মায়েরা শেষ হয়ে গেলো।"

ভোরের আলোতে ব্যারক বাড়ী আর তার সামনে পাঁচ জনের সার দেওয়া বন্দিনীরা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পাশের জলাভূমির কুয়াশা এসে সমস্ত ক্যাম্প ঢেকে ফেললো—মনে হয় কুয়াশার সমুদ্রে এ যেন এক নির্জন দ্বীপ। ব্যারাকগুলোর সামনে কয়েক হাজার মানুষকে দেখা যাচ্ছে, তারপর কাঁটাতারের বাইরে মাইলের পর মাইল জনমানবহীন। মাঝে মাঝে কুয়াশা ভেদ করে শ্মশান থেকে উঠছে লাল আগুনের হলকা।

ভোরের কুয়াশা গড়িয়ে এলো তারের ওপর, বিজলী বাতির সাথে সুরু হ'লো তার রেষারেষি—একটা নিঃসঙ্গতার ভাব নেমে এলো আমাদের মনে। তারের ওপর এখানে ওখানে জ্বলছে রক্তের মত লালবাতি—মৃত্যুমুখী যে বিজলী কারেন্ট আসছে এ হ'লো তারই প্রতীক। মৃত্যু যেন হাতের ইশারা জানাচ্ছে সবাইকে। ওদিকে তাকালেই মনের মাঝে মোচড় দিয়ে ওঠে বিরাট এক অস্বস্তি। হঠাৎ মনে হ'লো কি যেন একটা কালো জিনিষ ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলছে ঐ লাল চিহ্নের দিকে। ওটা যে মানুষের মূর্তি সেটা এই ঘন কুয়াশার মাঝে প্রায় বোঝাই যায়না। কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে মূর্তিটি এগিয়ে চলেছে—এতটুকু ইতস্ততঃ নয়, একবারও ফিরে তাকাচ্ছে না পেছনে।

কাঁটা তারের বেড়া আর গড়ের মাঝখানে সমস্ত ক্যাম্পের সীমানা জুড়ে রয়েছে এক হাত চওড়া এক ফালি জমি—মানুষের পায়ের ছোঁয়া সেখানে পড়েনি কোনদিন।

হাজারো মানুষের পায়ের চাপে ক্যাম্পের মাটি জমাট শক্ত হয়ে গেছে অথচ ছোট এই ফালিটুকুতে রয়েছে ভোরের শিশিরে ভেজা ঘাসের সমারোহ। শীতের দিনে জমা হয়ে থাকে সেখানে শুভ্র তুষার, জমিটুকু অপেক্ষা করছে তাদেরই জন্যে যারা মুক্তি পাবার সব আশাই ছেড়ে দিয়েছে—যারা এই সরু পথ দিয়েই বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়। ইতিমধ্যে সেই অস্পষ্ট নারী মূর্তি ছোট পুলটা পার হয়ে লাল আলোর সামনে দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয়ই সে শুনতে পাচ্ছে তারের সেই অদ্ভুত সঙ্গীত আর একটানা কাঁপন। মেয়েটি তার হাত তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো..........পেছন থেকে ছুটে এলো একটা গুলি—দেহ তার গড়িয়ে পড়লো তারের ওপর। স্তব্ধ নীরবতা নেমে এলো চারধারে, নামের গুনতি তখনো শেষ হয়নি। কেউ ছুটে গেলো না তাকে বাঁচাতে—এই আত্মহত্যার হাত থেকে। ঝটিকা বাহিনীর অনুমতি ছাড়া যদি কেউ যেতো তবে সেও গড়িয়ে পড়তো—ঝাঁঝরা হয়ে যেতো তার দেহ।

ক্যাম্পের অন্য দিক থেকেও ভেসে এলো দু একটা গুলির শব্দ। আরো কেউ হয়তো এমনি ভাবেই আত্মহত্যা করতে গেছে। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া অসহ্য হয়ে উঠেছে। বন্দীরা কুয়াশায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে—একটুখানি উত্তাপের জন্য লাফালাফি করছে। ব্লক সুপারভাইজাররা কিন্তু তখনই ঘোষণা করলো চরম দুঃসংবাদ।—"হিসেব মিলছে না" (১৯৪২ সালে হিসেব খুব কম দিনই মিলতো)

সুপারভাইজাররা আবার গুনতে শুরু করলো—ঝটিকা সৈন্যরা তাদের ওপর নজর রাখছে। তারের কাছে মৃতদেহগুলোকেও যোগ দেওয়া হলো। এবার ক্যাম্প সিনিয়রদের নেতৃত্বে যে বন্দীরা গুনতিতে আসেনি তাদের খোঁজ শুরু হ'লো। আবছা অন্ধকারে, ব্যারাকের পেছনে যেখানে লোক চলাচল কম কিংবা খানাগর্তের মধ্যে পড়ে থাকা বন্দীদের খুঁজে বের করলো শান্ত্রীরা। এসব হতভাগ্যরা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া শক্তিদিয়ে খুঁজে বের করেছিলো একটু নির্জন স্থান—যাতে শেষ নিশ্বাস নিতে পারে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। নাম ডাকার জায়গায় তাদের আসতে বাধ্য করা হলো। ধাক্কা আর গালাগালি খেতে খেতে তারা অতিকষ্টে

নিজেদের নিয়ে এলো গুনতির জায়গায়—সেখানে অন্য বন্দীরা বহুক্ষণ অপেক্ষা করছে।

একজন হতভাগিনীকে বের করে আনা হ'লো—অসুস্থতার জন্য তার সমস্ত চেতনাই লোপ পেয়েছে। সে বলতে পারছে না কোন ব্যারাকে থাকতো, গুণতির সময় কোন সারিতে দাঁড়াতে হবে—এমনকি সে তার নাম নম্বরও ভুলে গেছে। (১৯৪২ সালে তখনও হাতে নম্বর উল্কি করে দেওয়া হয়নি) ....মেয়েরা প্রার্থনা করছে—ভগবান! কেউ যেন ওকে চিনে নিতে পারে! প্রার্থনা ছাড়া আর কিছু চিন্তা করার ক্ষমতাও ওদের নেই।

পুরুষদের ক্যাম্প থেকে গোলমালে শব্দ আসছে—বুঝলাম ওরা কাজে বেরুচ্ছে। তারের ওপারে সত্যিই একদল লোক রাস্তায় বেরিয়ে এলো, কুয়াশার ভেতর ভেসে আসছে গানের সুর। শীতের মাঝে ডোরাকাটা ধুসর রঙের জামা পরা শীর্ণকায় মানুষগুলো এক বেদনার ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। দিন শুরু হবার আগে ওরা গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে। কুয়াশার সাথে সম্পূর্ণ মিশে গেছে—মানুষ বলে চেনাই যায় না। ক্যাম্পের দরজা খুলে গেলো—৫ জনের সারি বেঁধে তারা নেমে পড়লো রাস্তায়।

রাস্তার শেষে বাড়ীর পাশে ঝটিকা বাহিনীর লোকেরা অপেক্ষা করছে। বন্দীরা গানের তালে পা ফেলে চলেছে। হাতে হলদে ফিতে বাঁধা একজন মজুর খাটানোর সুপারভাইজার (ক্যাপো) উঁচু গলায় বলছে—"লেফ্‌ট—লেফট্‌—লেফ্‌ট।

নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে তারা। এতটুকু সজীবতা নেই, নেই কোন প্রতিবাদ। প্রথম সারি ঝটিকা বাহিনীর কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে। নতুন দল এগিয়ে আসছে গেট দিয়ে। "ক্যাপো" নিজের টুপি খুলে নিয়ে আদেশ করলো—সবাই টুপি খোল।

কি অপমানকর দৃশ্য—মাথা মুড়ানো একদল অসহায় মানুষ সারিবদ্ধ-ভাবে চলেছে কয়েকজন সশস্ত্র জার্মানের সামনে দিয়ে।....আরেকটা গেট খুলে গেলো—বন্দীরা এগিয়ে চললো। আবার একদল....একজন করে ক্যাপো....পাঁচজনের সারি...মার্চ করে এগিয়ে আসছে তারা—একই ছবি

দেখা যেতে লাগলো বারে বারে। অন্য সবার মতো এরাও ক্যাকাসে ক্ষীণকায়। কামানো মাথার কোন স্পন্দন নেই—ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখেছে। যন্ত্রের মানুষের (রোবট) মত এদের নড়াচড়া, দেখলেই ভীতির সঞ্চার হয়।

ওরা এগিয়ে চলেছে—মনে হয় যেন বিরাট এক মৃত সৈন্যবাহিনী প্যারেড করছে। আরও বহু মানুষ এর পেছনে আসবে। ওদের গোনা কত সহজ – পাঁচ জনের সারি, এক হাজার গেলো—মোট পাঁচ হাজার ; আবার এক হাজার গেলো—মোট দশ হাজার। তবুও আসছে অগুণতি মানুষ। তোমার বাবা—ভাই কিংবা ছেলে যদি ওদের লাইনে থাকে চিনতে পারবে না। তাদের শীর্ণকায় শরীরের জন্য বৃদ্ধকে দেখাচ্ছে কম বয়েসী আর যারা যুবক তারা ঝুঁকছে যাওয়া মুখ নিয়ে হয়ে পড়েছে বৃদ্ধ। সকলের মুখেই রয়েছে কঠোরতা আর মৃত্যু শীতল নিস্তব্ধতার ছাপ। অবিরাম তারা চলেছে—ব্যাণ্ডের বাজনা পাশ কাটিয়ে, ঝটিকা বাহিনীর সামনে দিয়ে গেট আর কাঁটাতারের বেড়া পার হয়ে ওরা মাঠে নেমে পড়লো।

তারার আলো নিভে গেছে বহুক্ষণ। আকাশে ধূসর রঙ ধরেছে। পুবের দিগন্ত নতুন প্রভাতের আলোতে রক্তিম। বন্দীরা ভাবছে—ঐতো উত্তর পুব কোণে ওয়ারশ, সেখানে রয়েছে আমার সবচেয়ে প্রিয়জনেরা কিন্তু তারা কি আউশভিৎজ এর রহস্য বুঝতে পারবে ?

আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—প্রত্যেকটি জিনিষ এখন স্পষ্ট। কুয়াশা কেটে গেছে, তারের ওপাশে দেখা যাচ্ছে দিগন্ত বিস্তৃত ক্ষেত। প্রভাতের রক্তিম আলো অদ্ভুত রঙ ধরিয়েছে নিস্পন্দ দেহটাকে—মেয়েটি এলিয়ে পড়ে আছে তারের ওপর। ডান হাত দিয়ে তারটা ধরা—সমস্ত শরীরটা আকাশের পানে এমনভাবে খাড়া হয়ে আছে মনে হয় যেন প্রার্থনা করছে। পেছন দিকে ঝুলে পড়া মাথাটি দেখলেই বোঝা যায় মেয়েটি যুবতী—বিদ্যুতের 'শকে' নীল হয়ে গেছে।

হুইসেলের একটানা তীক্ষ্ণ আওয়াজের ফলে গুণতির জন্য দাঁড়ানো স্পন্দহীন আড়ষ্ট মেয়েদের চেতনা ফিরে এলো। চারধারে শুরু হ'লো কোলাহল। এখুনি ক্যাম্প ছেড়ে যেতে হবে, সবার মনেই দারুণ সন্দেহ।

রুক্ষ মেজাজের 'ক্যাপো' আর গ্রুপ লীডাররা কাজের লোক জোগাড়ের জন্য এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। গেটের পাশে ঝটিকা বাহিনীর লোকেরা সবাইকে কাছে নেবার অপেক্ষা করছে—কুকুরগুলো তাদের কাছে দাঁড়িয়ে দারুণ চীৎকার জুড়ে দিয়েছে।

ক্যাম্পে একদল বন্দী আছে যারা কখনো গেট পার হয় না—মাঠের দারুণ খাটনিতে অংশ নেয়না। এদলের দায়িত্বে ছিলেন শ্রীমতি গ্যালিসিনা—এ সময়ে বোধ হয় তিনিই ছিলেন একমাত্র পোলিশ গ্রুপ লীডার। একটা লাল ফিতা হাতে লাগানো—তাঁর নেতৃত্বের চিহ্ন। যারা আর কষ্টসাধ্য কাজ করতে পারতো না তারা সবাই চাইতো "মণিকার" সাথে কাজ করতে। প্রতিদিন সকালে গুণতির সময় মণিকা তাঁর দলবল নিয়ে মালগুদামে যেতেন যন্ত্রপাতি নিয়ে। অনেকেই সে দলে যোগ দিতো—তাঁর সাথে থাকার জন্য মেয়েরা আকুল চোখে ভিক্ষে চাইতো। তিনি কখনো বারণ করতেন না—দলটিও তাই বেশ ভারী ছিলো। মাল গুদামে গিয়ে তিনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতেন। সুযোগ দিতেন মেয়েদের যাতে তারা ঘরের ভেতর একটু গরম হয়ে নিতে পারে, তারপর ঝটিকা বাহিনীর রক্ষীরা কাছে এলে বলতেন—"এবার আমাদের যেতেই হবে।"

কোদাল, ঝাঁটা আর ময়লাফেলা গাড়ী নিয়ে তারা শুরু করতো ক্যাম্প পরিষ্কারের কাজ। প্রতিদিনই কিছু অসুস্থা বন্দিনী কাজে যোগ দিতো না। তারা জানতো মণিকা তাদের মারবে না, জোর করে কাজও করাবে না। তিনি সব সময় লক্ষ্য রাখতেন ব্লক-লীডারদের অফিস থেকে কেউ যেন হঠাৎ এসে না পড়ে। মাঝে মাঝে মেয়েদের দিকে ফিরে শান্ত ভাবে বলতেন—"দয়া করে কাজের ভাণ করো—হেড সুপারভাইজার এদিকে আসছে।"

'মণিকা' তাঁর ব্যবহারে প্রমাণ করলেন ক্যাম্প পরিচালকদেরও একজন, তার সাথী বন্দীদের সাহায্য করতে পারে—তাদের জীবন কিছুটা সহজ করে তুলতে পারে। আমাদের দুর্ভাগ্য খুব অল্প পরিচালিকাই পরে 'মণিকার' মত ব্যবহার করেছিলো। যে দু-একজন ছিলেন তাঁরা সত্যই

বন্দীদের ভাগ্য বদলে দিয়েছিলেন। 'মণিকা' যাদের বাঁচাতেন তাদের সংখ্যা খুবই অল্প, বেশীর ভাগকেই বাইরে ক্ষেতের কাজ করতে হতো।

অসহায় বন্দীরা সার বেঁধে গেট পার হচ্ছে—যন্ত্রের মতো তারা চলছে। ভীষণ প্রকৃতির হেড সুপারভাইজার মান্দেলের সামনে দিয়ে তারা চলে গেলো—ইনি চোখের পলকে মানুষের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দেন। এবার টাউবে (বন্দী-তালিকা রাখার অফিসার—মেয়েদের মুখের ওপর হঠাৎ দারুণ একখানা ঘুসি চালাবার ভারী সখ লোকটির, আর সে ঘুসিতে যোয়ানরাও লুটিয়ে পড়বে।) তারপর মেয়ে শান্ত্রী ড্রেক্সলার—আগে শিকারীদের সাহায্য করে বেড়াতো, তার ঝুলেপড়া কুৎসিৎ চোয়াল আর অধঃপতনের চিহ্নে ভরা মুখটাতে রয়েছে তীব্র ঘৃণার ছাপ। তারা পার হয়ে গেলো শান্ত্রী হাসেকে-প্রথমে মুখে মেরে তবে সে কথা শুরু করে। এবার বুবি—ক্যাম্পের ভেতর শৃঙ্খলা রাখার দায়িত্বে রয়েছে—দীর্ঘদিনের দাগী আসামী, তার চেহারা ও ব্যবহারে রয়েছে পুরুষ ও নারীর অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

এগিয়ে চলা মেয়েদের একমাত্র ইচ্ছা যে কোন ভাবেই হোক জার্মানদের দৃষ্টি এড়িয়ে পার হতে পারা। যারা সারির মাঝখানে রয়েছে ঝটিকা বাহিনীর লাঠির হাত থেকে তারা অনেকটা নিরাপদ। ওরা লাঠী দিয়ে মেয়েদের গোনে, একটু এদিক ওদিক হলেই পাশ দিয়ে চলা মেয়েদের মাথায় লাঠী বসিয়ে দেয়।

গেটের পাশে রয়েছে হরেক রকমের কুকুর—যেন নরকের দ্বাররক্ষী। কুকুরগুলো চীৎকার করছে, রাগে গোঙাচ্ছে, বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। এগুলো বেশ শিক্ষিত—ছেড়ে দিলেই মানুষের ওপর হামলা করে। বন্দীদের সংখ্যা অনুযায়ী সারির পেছনে কয়েক জন ঝটিকা সৈন্য দাঁড়িয়ে পড়ছে। তারা সাথে নিয়ে চলেছে ছোট মেশিনগান এবং কুকুর।

সকাল হয়েছে, সূর্য এখনো দেখা যাচ্ছেনা, আকাশ শুধু রক্তিম আভায় লাল। গাছপালা আর ঘাস তুষারে ঢেকে গেছে। রাস্তার পাশে ছাউনিতে দাঁড়িয়ে আছে একজন জার্মান পাহারাদার, পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভেড়ার চামড়া দিয়ে মোড়া। ফারের কলারটাকে সে কান অবধি তুলে দিয়েছে। পুরু দস্তানায় মোড়া হাতদুটো দিয়ে শরীরের পাশ

চাপড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে ভারী বুট জুতো মাটিতে ঠুকছে। অক্টোবরের সকালে সত্যিই ভীষণ শীত।

মার্চ করে চলা মেয়েদের খালি পা দুটো ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে।··· যাদের কপাল ভালো তারা সোয়েটার পড়েছে, বেশীর ভাগই কিন্তু পাতলা চটের তৈরী ছোট হাতার জামা গায়ে দিয়েছে। এমন কি ন্যাড়া মাথাও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, হাওয়া এসে চিবুকের নীচ পর্যন্ত বাঁধা রুমাল সরিয়ে দিচ্ছে।

সূর্য ওঠার সাথে সাথে সবাইকে কাজে বেরুতে হয়।·········শহরের কাছে আউশ্‌ভিৎজ্‌ ক্যাম্প থেকে শুরু করে তিন মাইল দূর পর্যন্ত মানুষের পর মানুষের সারি—সবাই সমান ক্ষুধার্ত, সমান শীতে পীড়িত। কেউ কাছে কাজ করে, কেউ একটু দূরে, কাউকে যেতে হয় বহুদূর। ঠাণ্ডা কাদা আর ডেলা পাকানো মাটি না থাকার জন্য যেদিন পথ চলা খুব কষ্টসাধ্য হয়না সেদিন সবাই এ সময়টুকু স্বাধীনভাবে চিন্তা করে।

এদের মধ্যে এমন কেউ নেই প্রথম দিন যে ভাবেনি—"এমনি করে আর কতদিন কাটাতে হবে?" তারপর দিন গেছে, সপ্তাহ গেছে, মাস গেছে, কোন পরিবর্তন আসেনি। বছরের পর বছর পার হয়ে গেলো—প্রভাতের সূর্য প্রতিদিনই কাজে যাবার পথে ফ্যাকাশে মানুষের সারিকে অভিবাদন জানাতে লাগলো। সাহস করে নিজেকেও কেউ আর জিগ্যেস করতে পারে না—"কবে এর শেষ?"

১৯৪১ সালে তবু এটুকু সৌভাগ্য ছিলো—প্রতিদিনই আমাদের একই কাজের দলে যোগ দিতে হতো না। স্বাধীনভাবে কাজ বেছে নিতে পারতাম। নূতন নূতন পরিবেশে বিভিন্ন কাজে যোগ দিয়ে একটুখানি উত্তেজনাও উপভোগ করতাম।

গাড়ীতে জোগান দেওয়ার কাজে অনেক সুবিধা ছিলো। প্রথমত কাজের হিসেব হতো সন্ধ্যে পর্যন্ত কতগুলো গাড়ী ভরেছো আর চালান দিয়েছো তারই ওপর। তাছাড়া কাজ করতে হ'তো বালিতে দাঁড়িয়ে, কাদায় নয়। কিন্তু একাজে শীতকালের ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার কোন

কায়দা ছিলোনা—কোন কারণেই কাজের জায়গা ছাড়তে পারবে না। হাত লাল হয়ে গেছে—আড়ষ্ট, হাতে আর কোদাল ধরতে পারছোনা, জামা ভিজে পিঠ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে তবুও কিন্তু তুমি জায়গা ছাড়তে পারবে না, কাজ করার দরকার নেই, ওভারশিয়াররা ছাউনিতে আশ্রয় নিয়েছে, বৃষ্টির জন্য তোমায় দেখতেও পাচ্ছনা তবুও কিন্তু সরে যাওয়া চলবেনা। বৃষ্টি আর ঝড় যেদিন তাড়াতাড়ি থেমে যেতো, কাপড় জামা শুকিয়ে যেতো হাওয়ায়, শরীর একটু গরম হয়ে উঠতো—কাজের জন্য সে দিনগুলো ছিলো সব চেয়ে ভালো। ....যেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত বৃষ্টি হতো সেদিন কি সাংঘাতিক অবস্থা—ভিজে কাপড়গুলোকে মাচার ওপর রেখে শরীরের গরম দিয়ে চেষ্টা করতাম শুকোতে।

বৃষ্টির দিন আমরা শুধু ভাবতাম সময় কি করে তাড়াতাড়ি কাটবে—সূর্য কখন অস্ত যাবে? গাড়ীগুলোর কাছে রাস্তার ওপারে ছিলো ছোট একটা বাড়ী। কোন বাধা না মেনে সকলেরই চোখ গিয়ে পড়তো সেখানে। ক্যাম্পের চার পাশে বহু মাইলের মধ্যে এটাই ছিলো মানুষের বসতির একমাত্র চিহ্ন। সমস্ত মানুষ সরিয়ে দিয়ে এ অঞ্চলটাকেই করা হয়েছিলো জনমানবহীন মরুভূমি। পোষ্টার দিয়ে সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। এই শূন্যতার মাঝে আমাদের এতো কাছে রয়েছে খালি বাড়ী। বিশেষ অর্থ নিয়েই বাড়ীটা আমাদের স্বপ্নে আর কল্পনায় দেখা দিতো—তার সাথে বাস্তবের কোন সম্পর্কই ছিলো না। যদি পালানো যায় তাহলে এটাই হবে প্রথম আশ্রয়। সেখানে হাঁটু গেড়ে বসলে জানালা দিয়ে কেউ দেখতে পাবে না। তখন ডোরাকাটা জামাটা খুলে ফেলবো, খুলে ফেলবো বুকে লাগানো নম্বরটা। নিজের অজান্তেই চোখদুটো পরীক্ষা করতে লাগলো—বাড়ীটার চারধারে কি আছে, ক্যাম্প থেকে কতদূরে—রাস্তা থেকে কত দূরে?............

দ্বিতীয় দলটা ঝটিকা বাহিনীর জন্য তৈরী নূতন বাড়ীর চত্বরে কড়ি কাঠগুলো জমা করতো। ব্যারাক প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—মেঝেটা কাঠ দিয়ে তৈরী, বড় বড় জানালা আছে, নর্দমারও ব্যবস্থা আছে। বন্দীদের কিন্তু একথা স্বপ্নেও ভাবতে দেওয়া হবেনা যে তাদের জন্য জুটবে এই

সুবিধা যাতে তাদের জীবন আর একটু সহ্যের সীমার মধ্যে এসে যায়।

কড়িকাঠ নিয়ে আসা ভারী কষ্টকর কাজ। ওগুলো থাকে বহুদূরে বনের কাছে। চারপাশে শেওলা আর ঘাস গজিয়ে যায়, নরম মাটিতে একটুখানি ডুবেও থাকে।............

প্রথমে পুরানো কড়িকাঠের বাঁধন খুলতে হবে তারপর তার লম্বা অনুযায়ী কয়েক জনে মিলে ধরবে। "এবার তোলো", পেশী ফুলে উঠছে, হাত ব্যথা হয়ে যাচ্ছে-প্রতিমুহূর্তে ব্যথা বাড়ছে। লম্বা মেয়েরাই সব চেয়ে বেশী কষ্ট পায়, কিন্তু এক মাপের লোক জোগাড় করার জন্য কেউই কেয়ার করে না। শিরদাঁড়া যদি ভাঙ্গে তাতে কি এসে যায়? তার জায়গা নেবার জন্যে রয়েছে হাজার হাজার মেয়ে—আরও না হয় অনেকের শির দাঁড়া ভাঙ্গবে।

একটা চেক মেয়ে কড়িকাঠ নিয়ে চলতে চলতে লাইনের মাঝখানে হাত ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো—"আমি আর পারছিনা—আর পারছিনা।"

ঝাঁকুনির ফলে এবং মেয়েটি হাত ছেড়ে দেওয়াতে অন্য সবার ওপর চাপ এলো—ব্যথায় টনটন করে উঠলো তাদের হাত। সাথের শান্ত্রীটি দীর্ঘদিনের দাগী আসামী, এখন রাজনৈতিক বন্দীদের পাহারা দিচ্ছে। অশ্রাব্য জার্মান ভাষায় গালাগালি দিতে লাগলো—মেয়েটির পিঠে পড়তে লাগলো তার শক্তলাঠী। এ ধরণের টানাহ্যাঁচড়ার জন্য অন্য মেয়েদের হাত ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। আর বয়ে নেওয়া অসম্ভব। সবাই দাঁড়িয়ে পড়লো। ঝটিকা বাহিনীর একজন যুবক শান্ত্রীটির সাহায্যে এগিয়ে এলো। একটা বিরাট গ্রে-হাউণ্ড কুকুর ছেড়ে দেওয়া হ'লো চেক্ মেয়েটার ওপর। কুকুরটা ওকে ধাক্কা মেরে ফেলেদিয়ে উরতের খানিকটা কামড়ে ছিঁড়ে নিলে।.......মেয়েরা কড়িকাঠটা তখনো কাঁধে নিয়েই দাঁড়িয়ে ছিলো—প্রতিমুহূর্তে সেটা ভারী হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত দলের কয়েকটা মেয়ে হাত ছেড়ে দেওয়াতে কাঠটা বালির ওপর পড়ে গেলো। শান্ত্রীটি একটুর জন্যও তার দায়িত্ব ভো'লেনি। ঘোড়ার দলকে চালাবার সময় অসাবধান

চালক যেমন প্রথম ঘোড়াটিকে চাবকায় ঠিক তেমনি সে মেয়েদের লাইনের প্রথম ধারে লাঠি পেটা করে যেতে লাগলো। শেষপর্যন্ত লাঠিটাই ভেঙ্গে দুখান হয়ে গেল।

আবার চলা সুরু হ'লো। এতখানি মার আর কুকুরের হাতে নাজেহাল হবার পরও বেয়াড়া চেক্ মেয়েটিকে তার জায়গায় ফিরতে বাধ্য করা হ'লো—আবার তাকে ভার বইতে হবে। তার পোষাকের একটা অংশ আগাগোড়া ছিঁড়ে গিয়ে মাটিতে ঝুলে পড়েছে, উরু দিয়ে টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়ছে রক্তের ধারা।

বনের মাঝে যারা কাজ করতে যায় তাদের ওপর সকলেরই হিংসে। বন্দীদের যে সারি বনে কাজ করতে যায় সে সারিতে জায়গা করে নেওয়া ভারী শক্ত। অপূর্ব এই বনের পরিবেশ—-ক্যাম্পের ভয়াবহ একঘেয়ে কোলাহলের পর সবাই একটু শান্ত নীরবতা উপভোগ করতে চায়। একলা থাকতে চায়। বন্দী শিবিরে তা হবার উপায় নেই—না দিনে, না রাতে। সবাই শুনতে চায় হাওয়ায় দোলানো গাছের ডালের আওয়াজ আর নির্জন বনের হলদে পাখীর নীচু সুরে গান। বন্দীরা অনেকেই বনে যাবার সারিতে জায়গা করে নেবার কায়দাটা শিখে নিলো। অন্য জায়গা থেকে এখানকার কাজও সহজ—রাস্তা তৈরী করতে হয়। ফোরম্যান একজন সাইলেশিয়ান। তার মতে মেয়েদের শক্তি পুরুষদের মত নয় অতএব সে খুব বেশী কাজ আশা করেনা। বনের মাঝে ঝটিকা বাহিনীর চোখ এড়ানো যায়, মেয়েদের মারধোর করে তাড়িয়ে বেড়াতে হয়না তাকে। বড় বড় পাথরের টুকরো মাপ মতো রাস্তার ওপর সাজানো হয়। ফাঁকগুলো নুড়ি দিয়ে ভর্ত্তি করে রাস্তা সমান করে দেওয়া হয়।

সকলেই ভাবে—'এরাস্তা কোথায় নিয়ে যাবে?' বনের মাঝের রাস্তা কোথায় পেঁৗছে দেবে সেটা জেনে রাখা ভালো কিন্তু কেউতা জানেনা। ফোরম্যানকে জিগ্যেস করার ফল হবে সংঘাতিক। রাস্তা পুব দিক থেকে পশ্চিমে গিয়ে হারিয়ে গেছে—কে জানে কোথায় এর শেষ।

হঠাৎ গাছের সেই নীরব মর্মর ধ্বনির মাঝে শোনা গেলো গাড়ীর আওয়াজ—একটু বাদেই বহু মেয়ের উন্মত্ত আর্তনাদ বনের গভীর বুক পর্যন্ত চিরে দিতে লাগলো। দূরে হারিয়ে যাওয়া তাদের সেই ভীষণ প্রতিবাদ যারা এখনো বেঁচে আছে তাদের সতর্ক করে দিয়ে গেলো। সকলেই জানে, ভালো ভাবেই জানে—হত্যার জন্য টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই মেয়েদের।…………আর একটা গাড়ী এলো তারপর আরও……। সব, সব কিছুই সতর্ক ভাবে করা হ'তো। গভীর বন—কেউ জানবেও না কোনদিন, কেউ পৃথিবীর কাছে বলতেও পারবে না। রাস্তায় যারা কাজ করছে?—ওরাতো মানুষের ছায়া। গভীর বনের মাঝে ওরা যদি কিছু দেখেও থাকে তাহলেও বলার জন্য একজনও বেঁচে থাকবে না।

মাঝে মাঝে ঝটিকা বাহিনীর লোকেরা হেসে চোখটাকে বাঁকা করে ঠোঁটটা দাঁতে চেপে ধরে বলতো—

"এ হলো ব্রেজিনকা তোমাদের জন্য শ্মশানভূমি" (ব্রেজিনকা—বনের এই ছিল আসল নাম, ব্রোজোজা (বার্চ গাছ) শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। শ্মশানভূমিও পরে এ নাম নিয়েছিলো)

পরে অবশ্য বিরাট বৈদ্যুতিক চুল্লী গড়ে তোলা হলো। হাজার হাজার মানুষ মারার জন্য তৈরী হ'লো গ্যাসের নিপুণ মরণ কোঠা। এ রাস্তাই সবাইকে পৌঁছে দিতো শ্মশানে।

ইতিমধ্যে মানুষ পোড়ানোর কাজ সারা হ'তো আদিম যুগের সাদাসিধে কায়দায়।….

রাস্তার ডান দিকে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়তো। গভীর একটা গর্ত থেকে উঠছে আগুনের ফুল্‌কি। গাছের ফাঁক দিয়ে,—একটু কাছে থাকলে ভালো ভাবেই দেখা যেতো—পুরুষ বন্দীরা মানুষের উলঙ্গ দেহ গাড়ী থেকে নামিয়ে লম্বা লাঠি দিয়ে আগুনে ফেলে দিচ্ছে। ধোঁয়ার মাঝখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে—ব্যস্ত মানুষগুলোর ছায়ামূর্তি, উঁচু থেকে ফেলে দেওয়া নগ্ন মৃতদেহ আগুনের হলকায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আস্তে আস্তে ধোঁয়া গাঢ় কালো হয়ে উঠলো—চোখের দৃষ্টি আর চলে না। কালো ধোঁয়া গড়িয়ে আসতে লাগলো গাছের ফাঁক দিয়ে, ঢেকে ফেললো রাস্তায়

কাজ করা মেয়েদের। ভয়ে আর ঘৃণায় আঁৎকে উঠলো তারা। এবার মানুষ পোড়া গন্ধ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দিন রাতের সাথী হয়ে উঠলো। ও গন্ধকে ভুল করার উপায় নেই—সব সময়েই মনে হচ্ছে মুখ-নাক-গলায় ঢুকে পড়ছে।

বনের একপাশে খোলা জায়গায় পোলিশ মেয়েদের তিনটে দল জমা হ'তো দুপুরে খাবারের জন্য। এ সময়ে দুর্যোগের দিনে বিশেষ একটা ব্যবস্থা ছিলো—খাবারের কেত্‌লী ভালোভাবে শীল করা থাকতো যাতে করে জঘন্য শালগমের স্যুপ বিলি করার সময় সত্যি সত্যিই গরম থাকে। শীতে পীড়িত বন্দিনীদের জন্য এর দরকার ছিলো খুব বেশী। কিছুদিন বাদেই কেত্‌লী খারাপ হয়ে গেলো—যা একটু ভালো ব্যবস্থা ছিলো তাও শেষ। দুপুর হলেই সকলে যে পথ দিয়ে কেত্‌লী নিয়ে গাড়ী আসবে সে দিকে তাকিয়ে থাকতো। কখন একটু গরম হবে তার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত সবাই গুণতো: দুঃখের আর অন্ত নেই—গাড়ীগুলো অর্দ্ধেক কেতলীও কাজের জায়গায় দিয়ে যায় না। অতএব আধ মাইল কাদা ভেঙ্গে যাও কেত্‌লী আনতে। 'ক্যাপোরা' কাদা ঠেলে যাবার জন্য লোক ঠিক করে দিতো। কিন্তু তাদের সকলেরই এ কাজ করার শক্তি ছিলো না।....এ কাজের জন্য যাদের ঠিক করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজন, একটি মেয়ের অসুস্থতার দিকে 'ক্যাপোর' দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার বদলে সুস্থ একজনকে দিতে অনুরোধ জানালো।

বন্দী শিবিরের সমস্ত হিসেবই ছিল অদ্ভুত আর বিকৃত মনোভাবের। দুর্বল, অসহায়, অসুস্থ বন্দীদের ওপরই আক্রমণ চলতো বেশী। চারধার থেকে ওদের পিষে ফেলা হতো। শ্মশানের জন্যই তো এখানে লোক বাছাই হবে—এই দার্শনিক চিন্তা থেকেই এ মনোভাবের সৃষ্টি। শারিরীক শক্তিই ছিলো রক্ষা কবচ, যদিও অল্প দিনের জন্য তবুও আজই মৃত্যুর হাত থেকে অন্ততঃ বাঁচা যেতো।

দারুণ ঘৃণার দৃষ্টি নিয়ে 'ক্যাপো' রুগ্ন মেয়েটির দিকে তাকালো তারপর ধাক্কা মেরে তাকে খানায় ফেলে দিয়ে বেশ কয়েক ঘা লাথি চালালো। যে পোলিশ মহিলাটি দুর্বল মেয়েটির মুক্তির জন্য ওকালতি করেছিলো

তার মাথায় পড়লো কয়েকটা লাঠীর ঘা—মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো সে।

দুপুরে খাবারের ছুটি একঘণ্টা। তার অর্দ্ধেকই কেটে যায় লাইনে দাঁড়িয়ে সুপের অপেক্ষায়। যদি তুমি কয়েক টুকরো আলু আর মাংস পাও তাহ'লে সুপ তো অপূর্ব। কিন্তু অল্প লোকের ভাগ্যেই সেটা জোটে—যারা কেত্‌লীর তলানীটুকু পায়। বাকী সময়টা বিশ্রাম করে কাটানো যায়। ইচ্ছে করলে তুমি পাশের সরু নালায় স্নান করতে পারো। জলটা এতো পরিস্কার যে অনেকে খেতে সুরু করে। হলদে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়তে পারো—কিন্তু সময়ের দাম এখানে খুব বেশী। মাঝে মাঝে সূর্যের তাপে আর সুপের জন্য শরীর গরম হয়ে ওঠে—সেদিন তাড়াতাড়ি জামা খুলে উকুন মরতেও পারো, অবশ্য এমন সুযোগ অল্পই আসে। এ কাজে সামান্য একটু সময় পেলেও সবাই হাত লাগিয়ে দেয়।

ফরাসী ও বেলজিয়ামের একদল ইহুদী মেয়ে আমাদের সাথে দুপুরের খাবার নিতো। সবকিছুতেই তারা নির্বিকার। একজন পোলিশ জানে এখানে সে মরতেও পারে আবার বেঁচেও যেতে পারে সুতরাং সে দুঃখ কষ্টের সাথে নিজেকে অভ্যস্ত করতে চেষ্টা করতো। কিন্তু ইহুদী মেয়েরা জানে মৃত্যু তাদের অনিবার্য। গ্যাসের সেই ভয়াবহ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজের মরণকে এগিয়ে আনতে তাদের একটুও কুণ্ঠা নেই।

সে দিন দুপুরে তুষার বৃষ্টি হচ্ছিলো। খাবার আজ দয়া করে সময় মতই আনা হয়েছে কিন্তু পাত্রগুলো বরফে ঢেকে গেছে—এমনকি খাবার বিতরণকারী 'ক্যাপোটির' চোখ পর্যন্ত ঝাপ্সা করে দিয়েছে। দমকা হাওয়ায় অনেকটা সুপ মাটিতে পড়ে গেলো। আজ একেবারে তাজ্জব ঘটনা ঘটলো—সবাইকে নূতন যে ক্যাম্প তৈরী হচ্ছে তার সীমানা পার করে আধা-তৈরী একটা কাঠের ক্যাম্পে ঢোকানো হলো। ৩২সি ক্যাম্প। ঠাণ্ডা সুপ আবার বিলি শুরু হ'লো। বাকী সময়টুকুতে সবাই ভিজে কাপড় নিংড়ে নিচ্ছে—গায়ে গায়ে ঘসাঘসি করছে। সুপে আজ আর একটুও গরম হওয়া যাবে না। নীল হয়ে যাওয়া মানুষগুলো শীতে কাঁপছে। পনেরো বছরের একটা বোহেমিয়ান ইহুদী মেয়ের জ্বর এলো।

ভিজে মাটিতে সে শুয়ে আছে, ঠোঁটে কালশিটে পড়ে গেছে—ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই আমাশায় ভুগছে, সেজন্য কোন অন্তর্বাসও পরেনি শুধু ওপরের পোষাক আর জুতো। মেয়েটি যদি স্যুপ খেতো, ভিজে মাটিতে ঘণ্টাখানেক শুয়ে না থাকতো, যদি অঙ্গমর্দন করে ওকে গরম করে দেওয়া হতো তবে সে বেঁচে যেতো। কিন্তু মেয়েটির বাঁচার একটুও ইচ্ছে নেই। নীল ঠোঁট দিয়ে বারে বারে ফরাসী ভাষায় সে বলছে : "মাগো, মৃত্যু আমার দিকে এগিয়ে আসছে।"

সত্যিই মৃত্যু এগিয়ে এসেছে—খুবই কাছে। কিন্তু তার আগে রয়েছে যন্ত্রণাভোগ। দুপুরের খাবার ছুটি শেষ হবার বাঁশীও মেয়েটিকে নড়াতে পারলো না—এমনকি 'ক্যাপোর' লাঠির গুঁতোতেও নয়। যারা এভাবে শুয়ে থাকে ক্যাম্পে তাদের ষড়যন্ত্রকারী বলেই গণ্য করা হয়—লাঠির মাধ্যমেই তাদের সাথে ব্যবহার। কিছুক্ষণ বাদে 'ক্যাপোর' মাথায় ঢুকলো ব্যাপারটা ষড়যন্ত্র কিংবা একগুয়েমি নয় এমন কি অলসতাও নয়। দুজন ইহুদী মেয়েকে সে আদেশ করলো ওকে কাঁকরের স্তূপের কাছে নিয়ে যেতে। তারা মেয়েটিকে আধ বসা অবস্থায় রাখলো। মাথা তার ঝুলে পড়েছে পেছন দিকে। মেয়েটির গায়ের চামড়া বেশ সুন্দর, মসৃণ। বোঝা যায় বেশ যত্ন নেওয়া শরীর, কিন্তু ইতিমধ্যেই মৃত্যুর কালো ছায়া তাকে বিবর্ণ করে দিয়েছে। 'ক্যাপো' আবার চেষ্টা করলো তাকে দাঁড় করাতে। দেহটা ততক্ষণে ভেঙ্গে পড়েছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো—দমকা বাতাস বইতে শুরু করেছে। কাম্প শেষ হবার বাঁশী যখন বেজে উঠলো তখন মেয়েটি শেষ হয়ে গেছে।

পরিষ্কার আকাশ—ঝোড়ো হাওয়ায় মেঘ উড়ে গেছে বহু দূরে। গাছের পাতার ওপর জলের ফোঁটা টলমল করছে। খোলা ময়দানে সারাদিন কাজ করে বন্দীদের সারি ফিরে এলো; শিবিরের দুর্গন্ধ মারাত্মক মনে হয়। বহুদূরে থাকলেও হাওয়া টেনে নিয়ে যায় এই পচা গন্ধ। মনে পড়ে যায়—খোলা পায়খানা, নোংরা হাসপাতাল আর শ্মশানের সেই বিষাক্ত গন্ধের কথা। হাওয়ার ঝাপটায় সে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে মাঠের ওপর দিয়ে দূরে—বহুদূরে।

যতদূর চোখ যায় সমস্ত দিক থেকে ফিরে আসছে সারিবদ্ধ মানুষ। মাঠের রাস্তা দিয়ে ক্ষেতের পাশের সবুজ আল দিয়ে, জলাভূমির বাঁধের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে বিবর্ণ মানুষের সার। এরাই হ'লো আউশ্‌ভিৎজ এর বন্দীর দল। সন্ধ্যার শান্ত পরিবেশের মাঝ দিয়ে ওরা এগিয়ে আসছে। বন্দীরা বহন করে নিয়ে আসছে সাথীদের যারা আজ কাজের সময় শেষ হয়ে গেছে। মৃত্যুর সংখ্যা পুরুষদের মাঝেই বেশী কারণ মেয়েদের চেয়েও বেশী দুর্ব্যবহার ওদের ভুগতে হয়। পুরুষদের প্রত্যেকটি সারির পেছনেই রয়েছে একটা শোক মিছিল। লম্বা হাতলওয়ালা বিরাট বেলচাগুলো যা দিয়ে পাথরের নুড়ি সরানো হয় সেগুলোতেই এখন মৃতদেহ বহন করা হচ্ছে। মাঝে মাঝে প্রিয় বন্ধুরা ঠেলাগাড়ীতে নিয়ে চলেছে শবদেহ। গাড়ী শব্দ করতে করতে চলেছে—ভিজে মাটিতে চেপে বসে যাচ্ছে। মৃতের অসাড় মাথাটা ঝুলে পড়েছে একদিকে অন্য দিকে ঝাকুনির চোটে পা দুটো দুলছে। বেলচা বা ঠেলাগাড়ী কোনটাই যখন পাওয়া যাওয়া যায় না তখন একজন মৃত বন্দীর পা দুটো গলায় জড়িয়ে নেয় অপরজন হাত দুটো। আর ওভাবেই তারা বহন করে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া দেহটাকে। গেটের পাশে জার্মান মার্চ সঙ্গীত বেজে চলেছে—এই বীভৎস শোভাযাত্রার জীবন্ত ছবির সাথে এই সঙ্গীত মনের মাঝে গেঁথে যায়।

বন্দীরা ফিরে এলে মেয়েদের শিবিরের চেহারাই অন্যরকম হয়ে যায়—মনে হয় দিনের বেলা যেন এক বিরাট আলোড়ন হয়ে গেছে। ব্যারাকের চারধারে বিভিন্ন ভঙ্গীতে নারীদেহ পড়ে আছে। তাদের দেহগুলো নীল হয়ে গেছে। মরণের কালো ছায়া বিকৃত করে দিয়েছে তাদের মুখ। কালশিটে পড়া ঠোঁটের মাঝে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

সংখ্যায় ওরা এত বেশী যে ব্যারাকে ঢুকতে হলেই ওদের পাশ দিয়ে যেতেই হবে। মৃত্যুকালীন পেশী সংকোচনের ফলে উরুদেশ বেরিয়ে পড়েছে—গরমের দিনে শিবির থেকে বহুদূরে কাজ করতে গিয়ে তাদের যে পায়ের রঙ হয়েছিলো তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেক ব্যারাকে সন্ধ্যার গুনতিও সমান কষ্টদায়ক। যারা ভীষণ অসুস্থ তাদেরও সার দিয়ে দাঁড়াতে হবে। সাজানো হবে মৃতদের। যারা মুক্তি পেয়ে গেছে আর যারা বেঁচে

আছে সবারই গুনতি হবে। সূর্য্যডোবার সাথে সাথে গুনতি শুরু হয়, যখন শেষ হয় তখন বেশ রাত। দিন শেষ হয়ে গেছে—অজানা চলার পথে আরও একটা দিন কমে গেলো। এক কাপ গরম জল, মাচানে একটু শুকনো জায়গা, ছেঁড়া কম্বলের একটা অংশ—এই নিয়ে ব্যারাকের মধ্যে চলছে বিরাট উত্তেজনা—বাঁচার জন্য লড়াই।

বন্দী শিবিরের তারের বেড়ায় আলো জলে উঠে এক মৃত্যু-রেখার সৃষ্টি করেছে। দূরে জিপসী কিংবা চেক্‌দের শিবিরে ঘণ্টা বাজছে সবাইকে চুপ করিয়ে দেবার জন্য। হাজারো মানুষের হাজারো রকম ছোট ছোট আর সাধারণ সমস্যা। লক্ষ্য তার এক—বাঁচতে হবে, সমগ্র শিবির জুড়ে চলেছে এরই আলোড়ন।

বন্দী শিবিরের গোলমাল ছাড়িয়ে বৈদ্যুতিক বেড়াতারের একটানা মৃত্যু সঙ্গীতকেও ছাড়িয়ে অন্ধকারের মাঝে দেখা যাচ্ছে আগুনে লক্‌লকে শিখা, শ্মশানের চিমনী থেকে অবিরাম বেরিয়ে আসছে আগুনের হলকা—মানুষের মৃতদেহ গিলে নিয়ে দিনরা'ত জলছে সে চিতার আগুন।

"বার্কেনাউ'এর ধূমল আকাশ"

সেভেরিণা সম্‌ঝ্রাগলেভস্কা।

মুখ ফিরিয়ে ভিক্টর দেখতে পেল একটা লোক তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে! এক জোড়া নীল চোখের তীব্র চাউনী যেন গায়ে বিঁধে যাচ্ছে। সারাদিনের ব্যর্থতায় মন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তবু সে সমান তীক্ষ্ণ আর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ফিরে তাকাতে ছাড়ল না।

সন্ধ্যা নেমেছে—বসন্তের মদির স্পর্শ। দরজার পাশে লুকিয়ে থাকা লোকটার মুখটা ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না—সাদা মাংসপিণ্ড আর তাতে বসানো একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ—যা থেকে ভিক্টরের দিকে ভেসে আসছে অস্বস্তিকর অচঞ্চল, ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ মনোযোগের তরঙ্গমালা। ভিক্টর হঠাৎ ইচ্ছামত হাত পা নাড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে—মনে হয় সে যেন একজন সাধারণ স্তরের অভিনেতা, অভিনয় করতে নেমেছে আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চে আর সামনে বসে অভিনয় দেখতে দেখতে ব্যঙ্গ করছে এক ক্ষমাহীন সমালোচক—নাটকের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে যার জ্ঞান অভিনেতাদের চাইতে অনেক বেশি।

এতক্ষণ নিশ্চয়ই গরম লাগছিল—কারণ নদীর জোলো হাওয়ার স্নিগ্ধ-স্পর্শে মুখটা জুড়িয়ে যায়। মূক-বধির বিদ্যালয়ের পেটা ঘড়িতে ছ টা বাজতে সুরু করলো। হঠাৎ ভিক্টরের নজরে পড়ে যে দুটো লোক যেন শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়ে সামরিক চালে তার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। সে ঠাণ্ডা, কর্কশ দেয়ালটায় নিজেকে সেঁটে রাখতে চায়। যত্নে রাখা বন্দুকের বাঁটটা ডানহাত দিয়ে চেপে ধরে—নিঃশব্দে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে দরজার দিকে। লোক দুটো খুব তাড়াতাড়ি আসছে। বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে গুলি করতে যাবে এমন সময় সে অনুভব করল যে তার হাত

দুটো বাঁধা পড়ে গেছে অচেনা দুটো মুঠিতে। অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণের আওয়াজের মত তার কানে বেজে ওঠে, "পুলিশ"।

উর্দীপরা লোক দুটোর হুকুম মত সে সেফ্‌টিক্যাচ্‌ খোলা বন্দুক ফেলে দিয়ে দু হাত মাথার উপর তুলল। অটোমেটিক বন্দুক হাতে তৃতীয় একজন ভিক্টরের পেছন পেছন চলতে সুরু করে। প্রথমে যে দুজনকে দেখা গিয়েছিল, তারাও এগিয়ে চলে—তাদের একজন পকেট থেকে বাঁশী বের করে ফুঁ দিল। একটা মোটর গাড়ি কোথা থেকে এগিয়ে আসে, ভিক্টরকে তোলা হয় তাতে। হাঁটু দুটো তার ভারী দুর্বল মনে হয়—মুখটা কেমন নিরস লাগে, থুথু শুকিয়ে গেছে। পুলিসটার হাতের জোর পরখ করার জন্যে সে সন্তর্পণে নিজের হাতটা একটু নাড়ায়। কিন্তু পিঠে পড়ল বন্দুকের বাঁটের গুঁতো। পরখ করার ইচ্ছা আর থাকে না। আর বাধা না দিয়ে সে চুপ করে বসে থাকে দুই প্রহরীর মাঝখানে। বাকী দুজন বসলো ড্রাইভারের পাশে। ছেড়ে দিল গাড়ি।

গাড়ির অন্ধকারে নিজের মনটাকে একটু গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করে ভিক্টর তাতেও বাধা বিস্তর, গালের উপর অচেনা মুখের নিঃশ্বাস বিরক্তিকর লাগে।

নিঃসন্দেহে গাড়িটা চলেছে ভুচ্‌ এভিনিউ দিয়ে। গাড়ির জানলা দিয়ে উঁকি মারছে রাস্তাটা, যেন বলতে চাইছে, মনে রেখো। গাড়িটা নিচু ছাদের। টাটকা বন্দী-হাওয়া ভিক্টরের মনে হয় যে মাত্র একটা ধাপ পার হওয়ার ওয়াস্তা, তা হলেই সে মিশে যেতে পারে রাস্তার অন্ধকারে, যেমন সে একটু আগেও ছিল, লক্ষ্যহীন পথচারী। পালানোর চেষ্টায় প্রহরীদের প্রতিক্রিয়া কি হবে, মনে মনে সে আন্দাজ করতে চায়। বুঝতে দেরী হয় না যে পালাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। তবু ভিক্টর চঞ্চল হয় না—কারণ এখনো অটুট রয়েছে তার বন্ধু আর প্রিয়জনের বাঁধন, তাকে কর্তব্য আর অন্য সব কিছুর সঙ্গে বেঁধে রেখেছে, জীবনের বৈশিষ্ট্য তার যৌবনকে রূপশ্রী মণ্ডিত করেছে। জীবনে বহুবার সে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে—সুতরাং নাটকীয় কোন সম্ভাবনার কথা তার মনে এল না। পালানোর কথা অবশ্যই সে ভাবতে থাকল, আশা ছাড়লো না। আত্মসমর্পণের নির্বেদে এখনো মন আচ্ছন্ন হয় নি।

আজকে যা ঘটল তা প্রত্যেক গুপ্ত কর্মীর দৈনন্দিন আশংকা আর প্রত্যাশার ব্যাপার। ভয় আর দুশ্চিন্তার পালা শেষ হল—নতুন আর কি ঘটতে পারে। আর তাকে দু পাশ লক্ষ্য করতে করতে পথ চলতে হবে না, ট্রামের ভিড় এড়াতে হবে না, তাড়িত কুকুরের মত ত্রস্তভাবে পথচারীদের পাশ কাটাতে হবে না।

যেটা সেদিন কোন কাজেই লাগতে পারল না, গোপন সেই বন্দুকটা বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণের হাস্যকরতার জন্যে তাকে যেন তিরস্কার করছে। সঙ্গে যে বেআইনী খবরের কাগজ রয়েছে তার হেড লাইনে কি আছে স্পষ্ট হয়ে পড়ছে। কালো কালো ছাপার হরফের পটভূমিতে উঠল সম্পাদক, কর্ম্মচারী আর প্রচার কর্মীদের সিলুট ছবি। তারা যেন বিচিত্র মুখভঙ্গি করে সকলে একসাথে পাগলের মত কথা কইছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভিক্টর। গেস্টাপোগুলো এতো জোরে চেপে আছে যে হাত দুটো অসাড় হয়ে গেছে। ড্রাইভারের পাশে যারা বসেছিল, তাদের একজন হঠাৎ কথা বলে ওঠে, কর্কশ শব্দে সেই নিঃস্তব্ধতা খান খান হয়ে যায়; "তোমার নাম কি?"

ভিক্টর উত্তর দেয় না। জবাব দিতে অনিচ্ছা—তা নয়। উত্তর দেয় না, কারণ সে বুঝতে পারে না তার ছদ্মনামগুলোর মধ্যে কোনটা পুলিশের জানা আছে—ভিক্টর, বিসজেক, জাসিন্‌স্কি, না ভগবান না করুণ—জ্‌ভাদ্‌স্কি।

গেস্টাপোটা আবার জিজ্ঞাসা করল, "তুমি তো ভিক্টর?" হাসিতে বাকী লোকগুলো ফেটে পড়ে। এই বিদ্রূপের হাসিতে বন্দীর মনে আত্মমর্যাদার অনুভূতি জেগে ওঠে। এই অনুভূতির জন্যেই সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠে, আত্মনির্ভরতার সঙ্গে ঢুকতে পারে 'স্‌জুচ্‌ অ্যাভিন্যু' এর পুলিসের আড্ডাখানার বিরাট বাড়িটায়।

বিজলী বাতির আলোয় চোখে ধাঁধাঁ লাগে—জার্মান বিচারালয়ের অমানুষিক আড়ম্বর সম্বন্ধে প্রথমে সম্ভ্রম জাগে। কফিনের পাশে পাশে হাঁটা পাদ্রীদের মতন গম্ভীর, স্থির, আর নিঃশব্দভাবে চলা ফেরা করছে চারপাশের অচেনা লোকগুলো—হঠাৎ মনে হয় কোন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায়

যোগদিতে এসেছে বুঝি। ভিক্টর মনে মনে হাসে। পুলিশগুলো যেমন সাড়ম্বর গাম্ভীর্যের সঙ্গে ঘিরে রেখেছে তার ছিন্নভিন্ন ময়লা পোষাক পরা শরীরটাকে—হাসি চাপা দায়।

ভিক্টরকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। বন্দুকটা সেখানে জমা হয়ে যায়। পকেট হাতড়ে তার সবকিছু নিয়ে গেল। বন্দুক আর কাগজপত্র রাখবার অপরাধে তার মুখে পড়ল পাঁচ ঘুঁসি—মাড়ী, দাঁত রক্তে ভরে যায়। রিক্ত আহত ভিক্টরকে ওরা নিয়ে গেল আফিসে; আত্মমর্যাদা হারিয়ে সে দিশেহারা হয় নি। সেখানে একটা কেরাণী ভিক্টরের নামলেখা একটা কার্ড থেকে তথ্যগুলো টুকে নিচ্ছিল। সে ভিক্টরের বাবা, মা, স্ত্রী, অন্য আত্মীয়দের ঠিকানা জেনে নেবার চেষ্টা সুরু করল।

কেরাণীটার অন্তঃসার শূন্যতার জন্যে ভিক্টরের অনুকম্পা জাগে। এই অনুকম্পা অনুভবে সে এত মগ্ন হয়ে পড়ে যে লক্ষ্যই করল না—একটা সার্জেণ্ট কেরাণীটাকে অফিসের বাইরে যেতে ইঙ্গিত করল।

ভিক্টর ছাড়া ঘরে রইল তিনজন—সার্জেণ্ট ফ্রস্ট—সুন্দর চুল, লম্বা চেহারা, মুখ দেখলে মনে হয় যেন ইংরেজ খেলোয়াড়, হাত দেখলে মনে হয় গানবাজনা তার পেশা,; য়ুক্রেনবাসী একটা দোভাষী, ঘন কালো চুল, গোলগাল, ছোটখাট চেহারা; আর অল্পবয়স্ক পোল, যার আচরণে মনে হয় তার ধারণা সে জার্মানই বটে—বেশ লম্বা, শক্তিমান চেহারা, খেলোয়াড়, গুণ্ডার মতন। ভিক্টরের নজরে পড়ল যে দোভাষীর হাতে চাবুক আর পোলটা বাগিয়ে ধরেছে একটা লাঠি।

এক কোণে ছোট টেবিলের উপরে রয়েছে রেডিও—ভেসে আসছে সামরিক কুচকাওয়াজের পাগলকরা সুর।

হুকুম হল, কোট খুলে ফেল। ভিক্টর দেরী করে না। জেরার দিকেও ওরা গেল না—শুরু হয় মারপিট। মুহূর্তের জন্যে ভিক্টর যেন নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ পায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণার চোটে সে ভয় পেয়ে গেল। মনে হয় সব কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে। বহু পরিশ্রমে বহুকাল ধরে গড়ে তোলা জগত, সরল বিশ্বাস, পরম আদরের মা, স্ত্রী, তার আদর্শ, সারা জীবন ভরে আছে যে ক্রিয়াকলাপ—ভালো মন্দ সব কিছু ধ্বংস

হয়ে যাচ্ছে একটা অস্থায়ী মুহূর্তে, একটা নাৎসী সৈন্যের চাবুকের ঘায়ে। ভিক্টর একটা বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত করে বসে যে পশুবল মানুষের চিন্তা, অনুভূতির গলা টিপে ধরে শুধু যন্ত্রণায় ভরে দিতে পারে মানুষের মন।

উপুর হয়ে লুটিয়ে পড়ল ভিক্টর। আঘাত পড়তে থাকে পিঠে, উরুতে, পায়ে, কাঁধে, ঘাড়ে। যে শাস্তি প্রাপ্য নয় তা মেনে নেওয়া শক্ত। সারা-জীবন ধরে সে লড়াই করেছে হিংসার বিরুদ্ধে। তাই তার উপর যে পশুশক্তি অত্যাচার চালাচ্ছে তার সীমা সে ধরতে পারে না।

ভাষাহীন প্রতিবাদে তার দমবন্ধ হয়ে আসে। কিছু বুঝতে পারছে না। শুধু বুঝতে পারছে পিঠে, পাছায়, উরুতে, পায়ে কেটে কেটে বসছে চাবুকের ঘা, গরম লোহার মত। লাঠির ঘায়ের ভোঁতা আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলছে ফুসফুসে, হৃৎপিণ্ডে, মূত্রাশয়ে—সারাশরীর এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। চীৎকার, আর্তনাদ, তারপর চুপ, মৃত্যুর মৌন, আবার ফাঁদে পড়া আহত পাখির আর্তনাদ, গরম জলে চুবিয়ে ধরা বিড়ালের চীৎকার, মরণের মুখে হাজার শিশুর কান্না—অত্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষায় প্রয়াসী ভিক্টরের শরীর বলতে তখন এছাড়া আর কিছু নয়।

"নেকড়ে" নামে মুক্তি বাহিনীর দলপতি এবং যুদ্ধ শুরু হবার আগেই শ্রমিকনেতা বলে স্বীকৃত ভিক্টরের পক্ষে এ রকম আর্তনাদ করা, আঘাত এড়ানোর চেষ্টা হাস্যকর সন্দেহ নেই। পেটে আর পিঠে আঘাত বেশি যন্ত্রণাদায়ক—ভিক্টরকে পেড়ে ফেলে মাটিতে, আর উঠে দাঁড়িয়ে আঘাত এড়াবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। ওজন করা হাসি ফোটে ফ্রস্টের মুখে। সমস্ত কলকব্জা ঠিক আছে—বোম্বেটেটা বুঝবে জার্মান আইন শৃঙ্খলা কি জিনিস।

ভিক্টর ছটফট করছে, আর্তনাদের বিরাম নেই। সার্জেণ্ট ফ্রস্টের মুখে সমবেদনার হাসি। সে রেডিওটার আওয়াজ বাড়িয়ে দেয়। গম্‌গম্‌ করে ওঠে জার্মান সামরিক কুচকাওয়াজের বাজনার শব্দ। বদমাইশটা চেঁচিয়ে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। পোলটা ইতিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, শিক্ষা আর অভ্যাসের অভাব। তার হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে ফ্রস্ট দেখিয়ে দেয় কিভাবে আইন বাঁচিয়ে তালে তালে লাঠিটার সদ্ব্যবহার করতে

হয়। গেস্টাপো দুটো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে অফিসারের দিকে। কৌশলটা আয়ত্ত করে নিচ্ছে। কিন্তু এদিকে ভিক্টরের আর্তনাদ আর শোনা গেল না; কারণ এই প্রথম সে জ্ঞান হারিয়েছে।

জ্ঞান ফিরে আসে তীব্র যন্ত্রণায়। দুটো লোক তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে—অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যথা দিচ্ছে তার আহত শরীরে। ভিক্টর হাঁটতে সুরু করল—আলগাভাবে ওদের কাঁধে ভর দিয়ে। ওকে নিয়ে যাওয়া হল পৃথক একটা ঘরে। বিনা প্রয়োজনে সেখানে নোটিশ সাঁটা রয়েছে, "গোলমাল করিও না, ধূমপান নিষিদ্ধ।" নোটিশটা বার বার পড়তে পড়তে ওর জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে আসে। শুধু আহত অঙ্গগুলি নয়—সমস্ত শরীর যন্ত্রণায় পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। একটু নড়লে ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে হাজার গুণ। এলুমিনিয়মের পাত্রে শালগমের ঝোল আর একটুকরো রুটি নিয়ে এল একটা লোক। ভিক্টরের খাবার স্পর্শ করার প্রবৃত্তি হয়না।

কল ঘরে যাবার অনুমতি পায় ভিক্টর; হাত মুখ ধুয়ে, ঘাড়ে মাথায় জল ছিটিয়ে, দু'চুমুক খেয়ে সে একটু সুস্থ বোধ করল। লোকটা কিন্তু এর এক মুহূর্তও তাকে চোখের আড়াল করে নি।

অবাক কাণ্ড যে হাত ঘড়িটা কেড়ে নেয় নি। ঘড়িটা সাড়ে ছটা বেজে বন্ধ হয়ে আছে।

রাতের প্রহরীটা তাকে হাতকড়া পরাতে এল, তাকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে তখন রাত মাত্র আটটা। লোহার দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে সে বেরিয়ে যায়। কিন্তু তারপর মিনিটে মিনিটে সে দরজার সামনে এসে ভিক্টরকে দেখে যেতে থাকে। এই হল তার সারা রাতের কাজ। হয়ত রাত তিনটে চারটের সময় ওর চোখে ঘুম নামবে, কর্তব্যের কথা ভুলে যাবে। কিন্তু অবস্থার কোন বাস্তব পরিবর্তন আসবে না। আত্মহত্যার কথা ভাবে না ভিক্টর; সঙ্গে বিষ নেই। এ বড় মারাত্মক ভুল।

পাশের অফিস থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। চমৎকার গলায় কে যেন গাইছে ইতালীয়ান একটা বিয়োগান্ত নাটকের গান। গানের কান আছে ভিক্টরের—সে অচিরেই নিজের অবস্থার সঙ্গে বেশ

মিলিয়ে নিতে পারে সেটাকে। আরো দূরে কারিডরের কোথাও এয়ার গানের সাহায্যে লক্ষ্য ভেদ অভ্যাস করা হচ্ছে। তার ভোঁতা আওয়াজ নিস্প্রাণ প্রতিধ্বনির মত কানে বাজছে তার। এতক্ষণে ভিক্টর একলা হতে পেরেছে—সঙ্গী শুধু নিজের ভাবনা, নিজের আহত দেহটা আর মিনিটে মিনিটে উঁকী মারা প্রহরীটা।

প্রবল তৃষ্ণা—নিশ্চয়ই জ্বর আসছে। পিছন দিকে হাত কড়াবাঁধা হাতদুটো অসাড় হয়ে যাচ্ছে; লোহার কঠিন চাপে অসহনীয় যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে চোখ—তার উপর অতন্দ্র বিজলী বাতির তীব্র আলোর উৎপাত।

ভিক্টর শক্ত একটা চেয়ারে উঠে বসতে গিয়ে ব্যথায় ককিয়ে ওঠে। সারা দেহে যেন বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। পা টনটন করছে। সারাদিন হাঁটাহাঁটি গেছে; ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। একটু কম লেগেছে যেখানে পিছনের সেই অংশটা কোনরকমে ঠেকিয়ে চেয়ারে বসে সে মুখবিকৃত করে গোঙাতে থাকে। ধীরে ধীরে দৈহিক যন্ত্রণার অনুভূতি কমে আসে ভাবনায় ডুবে যায় ভিক্টর।

চিন্তাটা হঠাৎ তার মনে এল—অপ্রত্যাশিত এই চিন্তা তাকে চমক দিয়ে যায়—নিশ্চয়ই পরদিন, কি তার পরদিন, না হলে অন্তত তিনদিনের মধ্যেই তার অবধারিত মৃত্যু। অতল দুরন্ত দুঃখে সে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। হতাশায় ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। দৈনন্দিন জীবনের যত তুচ্ছ খুঁটিনাটি ব্যাপার বিরাট আকার ধরে মনে ভীড় জমায়। যে কোণটাতে তার বিছানা ছিল, ক্যান্টিনের যে টেবিলটাতে সে ইদানীং খাবার খেত, বহুদিন আগে পড়া বইটার অংশবিশেষ, পরিচিত দৃশ্যের রঙের খেলা, কবে শোনা সুরের রেশ—এসব মনে পড়ে, অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্ত্রী, মা, প্রিয়জন—সকলের কথা মনে হলে কান্না পায়। কত অবাস্তব হয় তাদের ভালবাসা, তাদের মহত্ব। প্রথম জীবনের নানাস্মৃতি, যা মানুষের অনুভূতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ, একসঙ্গে আঘাত করতে থাকে তার মনের দরজায়। সবকিছু স্পষ্ট মনে পড়ছে, অপূর্ব সুন্দর মনে হয়। যেসব

কর্তব্য সে শেষ করতে পেরেছে তার টুকরো টুকরো কথাও উঁকিদিয়ে যায় মনে। ভিক্টর কিছুটা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে পৌরুষে, উদ্দীপনায়। হারানো জীবনের জন্যে নিজের উপরেই হিংসা হয়। কারণ গতকালের ভিক্টরের মধ্যে সে এমন পরিপুর্ণ সুখের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে—যার কথা আগে তার জানা ছিল না। এখন সে স্পষ্ট বুঝতে পারে কি সম্পদ সে হারিয়েছে। যে কাজকর্ম তার জীবনকে ভরাট করে রেখেছে বলে মনে হত তা এখন গুরুত্বহীন, একেবারেই নিরর্থক মনে হয়। তার নিজস্ব জীবনধারা এতদিন তার কাছে ছিল অপ্রধান এখন তাই তার অস্তিত্বের একমাত্র সার কথা হয়ে দাঁড়ায়।

হঠাৎ সে বিকারগ্রস্তের মত, পাগলের মত নিজেকে বাঁচাবার কথা ভাবতে সুর করে। সফল পলায়ন আর অলৌকিক উদ্ধারের যত কাহিনী সে শুনেছে, সব তার মনে নতুন আশা জাগায়। ঘরের দেয়ালগুলো সে পরখ করল। লোহার শিকগুলো পরখ করবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়। বহু সময় কেটে যায় এসব করতে। এই অন্বেষণ কত নিষ্ফল তা বুঝতে না পারলে সে বোধ হয় সারারাত কাটিয়ে দিত পথের খোঁজে। চেষ্টা সে ছেড়ে দিল, কিন্তু ছাড়তে পারল না সব আশা। হয়ত পরদিন কোন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। আবার সে ফিরে যায় তার স্মৃতি কথার রাজ্যে—স্মৃতিই এখন জীবনের সঙ্গে তার একমাত্র যোগসূত্র।

ভিক্টরের ভাবনাগুলো ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসে। প্যাদেরেস্কি পার্কের সেই কোনটা, সেই বেঞ্চিটা—যার উপরে বসে তাদের বাগ্‌দান হয়েছিল, গোপন আন্দোলনের সময় যেখানে তারা কত সময় কাটিয়েছে, তার কথা ভিক্টরের কল্পনাকে পেয়ে বসে। যে লাইলাক ঝোপের আড়ালে সেই বেঞ্চিটা, আর যে বিরাট বাদাম গাছটার পাতার মর্মরে ঝরে পড়ত মৃদু স্নিগ্ধতা—যা সে বুঝতে পারত না, কিন্তু অনুভব করতে পারত গভীর ভাবে—সেই সুদুর অতীত ফিরে এল আর দুরে সরে গেল বর্তমানটা—অতীত জীবনের ঝোপঝাড় আর গাছপালার মর্মর ধ্বনির স্নেহস্পর্শে ভিক্টর ঘুমিয়ে পড়ল কখন।

সকালে গোলমালে ভিক্টরের ঘুম ভেঙে গেল। পাশের কুঠরিতে কিছু

লোক আমদানী হয়েছে। তারা কাশছে, গোঙাচ্ছে ; তাদের চোখ, বন্দীর ভাষাময় চোখ ভিক্টরের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। বারান্দায় গেস্টাপোগুলো পায়চারী করছে। রেডিওটা খোলা হয়েছে এর মধ্যেই। এয়ার গানের আওয়াজও ভেসে আসছে। একজন প্রহরী এসে ওর হাতকড়া খুলে কলঘরে নিয়ে গেল। ফিরে আসতে না আসতেই পোলটা এসে হাজির।

পোষা কুকুরকে যে ভঙ্গিতে লোকে ডাকে সেরকম কর্কশ স্বরে লোকটা বলল, "এই বেরিয়ে আয়"

ভিক্টর হাঁটতে থাকে আগে আগে, সেটাই দস্তুর। কোনদিকে গন্তব্য জানবার জন্যে মাঝে মাঝে পিছন ফিরে পোলটার দিকে তাকায়। চার তলার ৩১৭নং কামরাতেই যেতে হবে। ঘরে ঢুকে ভিক্টর কেরাণী আর দোভাষীটাকে দেখতে পেল—দুজনেই উর্দী চড়িয়ে ফিট্ফাট্। উর্দী দেখে ভিক্টর তাদের পদমর্যাদা বেশ বুঝতে পারে। সে ঘরের চার পাশে তাকাল। ঝকঝকে দেয়াল, বড় বড় জানলা। জানলা দিয়ে সকালের রোদ ঘরে ঢুকছে। দুটো ডেস্ক, কয়েকটা চেয়ার আর একটা বড় টেবিল আফিসের সাধারণ সরঞ্জাম। খুব খারাপ লাগে না। পোলটা ওকে পৌঁছে দিয়ে তখনি ঘর ছেড়ে চলে গেল।

দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে ভিক্টর মুহূর্তের জন্যে বিব্রত বোধ করে—নিশ্চল হয়ে দাঁড়ায়। নিজেকে নিয়ে সে কি করবে বুঝতে পারে না। গেস্টাপোগুলো চেয়ারে বসে আপাদমস্তক তাকে খুঁটিয়ে দেখছে।

ভদ্রভাবেই দোভাষীটা ওকে বসতে বলল। জার্মান ভাষায় ক্রস্ট জিজ্ঞাসা করল, "জার্মান বলতে পারো?"

সেই মুহূর্তে একটা মাছি ভোঁ ভোঁ করে উড়ে বেড়াতে সুর করে। ভিক্টর অবাক হয়ে ভাবে শীতকালে মাছি কোথা থেকে এল।

দোভাষীটা এবার মুখখোলে, "আর ভান করতে হবে না। আসলে জার্মান তুমি বলতে চাও না।"

ভিক্টর হতভম্ব হয়ে যায়। অন্যায় ভাবে তাকে মিথ্যাবাদী বলছে। সে যে মিথ্যা বলছে না তাই বা সে কি করে প্রমাণ করবে। সে তাই কিছুই বলল না। জবাবের জন্যে পীড়াপীড়িও অবশ্য কেউ করে না। ক্রস্ট

লাঠিটা তুলে নিয়ে টেবিলের এক কোণে ঠুকতে থাকে, দোভাষীটা চাবুক নিয়ে নাড়াচাড়া করে। এ দুটোর সঙ্গেই গতরাত্রে ভিক্টরের পরিচয় হয়েছে। মুহূর্তের জন্যে সব নীরব, কেবল লাঠিটার ভোঁতা আওয়াজ আর চাবুকের মিহি হিস্ হিস্। ভিক্টরের হাঁপানির আওয়াজ বেশ শোনা যায়, মোহগ্রস্তের মত সে লাঠিটার গতির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ ক্রস্ট মুখে কেমন শব্দ করে উঠল। মুচকি হেসে দোভাষীটা জেরা শুরু করল, "লেফ্‌টেনাণ্ট ভিক্টর, ওরফে ইয়ান জ্যাসিন্‌স্কি, তোমার আসল নামটা কি?"

ভিক্টর আবার নিরুত্তর থাকে। বসে বসে সে চিন্তার জট ছাড়ায়। ক্রস্ট আবার শব্দ করল, আবার দোভাষীটা আর একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারল, উত্তরের জন্যে অপেক্ষাও করল না। ভিক্টর বেশ বুঝতে পারে যে কি একটা পরিবর্তন ঘটেছে। এই মুহূর্তের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। সে প্রশ্নগুলোকে আর গুরুত্ব দেয় না। দোভাষীটা হঠাৎ তাকে অবাক করে দিল। সে বিশদ ব্যাখ্যা করে বলল যে ভিক্টরের পরিচয়, কাজ কর্ম সবই তাদের ভাল ভাবেই জানা আছে। সে তারপর প্রমাণ দাখিল করতে সুরু করে—সামরিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তার যোগসাজস, সহ-কর্মীদের ঠিকানা, এখন অব্যবহৃত আশ্রয়ের ঠিকানা, ভিক্টর ইদানীং যে সমস্ত কাজে যোগ দিয়েছে তার তারিখ, উদ্দেশ্য—সব। এমন কি দোভাষীটা দুঃখ প্রকাশ করে বলে যে ভিক্টরের স্থির নিষ্ঠা সত্ত্বেও জেলার গোপন আন্দোলনের নেতৃত্বের পক্ষে তার কাজের খবরদারী করার জন্যে অপর লোককে পাঠান উচিত হয় নি। তারা এমন একজনকে পাঠাল—যে ভিক্টরের উপর সর্দারী ফলাতে শুরু করল। তার ফল তো হল এই।

যতক্ষণ ধরে দোভাষী কথা বলতে থাকল, সে প্রায় আধঘণ্টা হবে, ক্রস্ট ভিক্টরের উপর থেকে চোখ সরায় না।

পুলিশের এই খোঁজ খবরের নির্ভুলতায় ভিক্টর প্রথমে অবাক, তারপর ভীত হয়ে পড়ল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কোথাও কোন ছিদ্র রয়েছে, তার দলেই হয়ত কোথাও, হয়ত একটা গুপ্তচর ঢুকে বসতে পেরেছে। মনে

মনে সে সহকর্মীদের প্রত্যেককে যাচাই করে দেখে, তাদের কেউ গুপ্তচর হতে পারে না। কিন্তু ঘটনা বলছে অন্যকথা। যেভাবেই হোক, এতো ভুল নয় যে পুলিশের কাছে এ সব খবর পৌঁছেচে।

ভিক্টরের মনে তখন এক চিন্তা, ওদের সাবধান করতে হবে—না হলে সর্বনাশ। এই ইচ্ছা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে সে অন্য সব চিন্তা ভুলে যায়।

দোভাষী তার শেষ কথা বলল, "এখন তোমাকে বলতে হবে, যে লোকটাকে তোমার কাজকর্ম দেখা শোনা করতে পাঠানো হয়েছিল, সে কে? তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

পরিপূর্ণ নিঃস্তব্ধতা। ফ্রস্ট অর্থপূর্ণ ভাবে তার লাঠিটা নাড়াচাড়া করছে, আর দোভাষী চাবুকটা—দুজনেরই চোখ ভিক্টরের উপর স্থিরনিবদ্ধ।

হঠাৎ দোভাষীটা চীৎকার করে ওঠে, "উত্তর দে বলছি।" দরজাটা তখন খুলে যায়, ঘরে ঢুকল পোলটা। সে এসে ভিক্টরের পাশে দাঁড়িয়ে তার কোটটা খুলে নেয়।

ভিক্টরের ইচ্ছা ছিল এমন কিছু বলে যাতে কারো ক্ষতি হবে না, অথচ যা নিরর্থকও নয়। কিন্তু কিছু ভেবে না পেয়ে সে চুপ করে থাকে। ফ্রস্টের সঙ্গে দোভাষীর দৃষ্টি বিনিময় হয়। দোভাষী এগিয়ে এসে তাকে বলল, "আমি যেমন করছি ঠিক তেমনি কর।"

হাত সামনে বাড়িয়ে উবু হয়ে বসে সে ভিক্টরের দিকে তাকায়, "ঠিক এমনি, বুঝতে পেরেছিস?"

ভিক্টর জবাব দেয় যে সে বুঝেছে।

তাকে আর কিছু করতে হবে না জেনে সে সুখী হয়। বেশ কষ্ট করে তাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে হল। সারা শরীরে আঘাত এত বেশী যে হাত সোজা করা মাত্র বুক আর পিঠের পেশীতে টান লাগে। উবু হয়ে বসতে গিয়ে পাছা আর পায়ে দ্বিগুণ ব্যাথা লাগতে থাকল। পায়ের উপর বসে সে টলতে থাকে, বৈঠকী অবস্থায় হাতের ভর দিয়ে তাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে হচ্ছে। লজ্জা করে ভিক্টরের—হাস্যকর মনে হয় নিজের অবস্থাটা। তার মত একজন পাকা খেলোয়াড় তিনজন

শত্রুর সামনে এমন অপটুভাবে কসরৎ করছে—এই চিন্তা ওকে পীড়া দেয়। কিন্তু বেশি চিন্তার সময় সে পেল না। উবু হয়ে বসতে যেতেই য়ুক্রেনবাসীটার চাবুক শিস দিয়ে উঠল। নির্ভুলভাবে কর্কশ আঘাতটা পায় ঘেঁষে গিয়ে পড়ল তার অণ্ডকোষের উপর—তার দেহের অবস্থান অনুযায়ী সেটাই স্বাভাবিক। ঘা খাওয়ামাত্র ভিক্টর সামনের দিকে লাফিয়ে উঠল কসাক নাচে যেমন লাফায় ঠিক তেমনি। তারপর মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে গেল মেঝেয়। কসাক নাচে অবশ্য এই গড়িয়ে পড়াটা নেই। চীৎকার করতেও ভুল হয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের এই পদ্ধতিটা ওকে চমকে দিল। খুব অবাক অবশ্য সে হয় না, কারণ কে না জানে পুরুষ দেহের কোন অংশটা সবচেয়ে স্পর্শকাতর। এই মুহূর্তে সে যে যন্ত্রণা পাচ্ছে তার জন্যে সে তীব্রভাবে ঘৃণা করে নিজের দেহকে। জানলা গলে আসা রোদের মধ্যে পড়ে থাকত বহুক্ষণ যদি না য়ুক্রেনবাসীটা তাকে লাথি মারতে মারতে অধৈর্যভাবে বলত, "ওঠ, বলছি, ওঠ।" আঘাতে আর চীৎকারে ভিক্টর আবার উঠে বসে। আবার তাকে হাত সোজা করে সেই ভঙ্গিতে বসতে হয়। আবার প্রথম ঘা যেখানে লেগেছিল ঠিক সেখানে নেমে আসে দ্বিতীয় আঘাত। এবার সে সামনে গড়িয়ে পড়ে না—বসে পড়ে মাটিতে। এ যন্ত্রণার তীব্রতা কল্পনাকেও হার মানায়। মানুষ এত যন্ত্রণাও সহ্য করতে পারে ভেবে সে অবাক হয়ে যায়। আর্তনাদও করে না। কোন অঙ্গ নাড়াতে পারছে না, গোঙাতেও পারছে না। লাল লাল কি যেন নাচতে থাকে চোখের সামনে—কানে কি যেন ঝাঁ ঝাঁ করে। তার পরাজয়ের আর কিছুই বাকী নেই—সব চুরমার হয়ে গেছে। আঘাত আর চীৎকারে আবার সে বাধ্য হয় উচু হয়ে বসতে। একটা বিকার, তাকে ঘিরে ধরেছে—অসহায়তা, প্রতিবাদ আর ভয়ের বিকার। গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে, সারা দেহ দমকে দমকে কেঁপে উঠছে, পক্ষাঘাত যেন শাখা-বিস্তার করছে নিম্নাঙ্গ থেকে গলা অবধি। মুখে ফেনা, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন সে বমি করছে। মানুষকে চুরমার করে দেবার আর পোষ মানাবার বিদ্যায় অভিজ্ঞ দোভাষীটার কথায় সে উঠে বসতে চেষ্টা করে, আবার পড়ে যায়। ছোটখাটো বেদনার হাত থেকে

অব্যাহতি চায় বলেই সে বিনা বাধায় এই তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা গ্রহণ করে। ওদের মনোবাঞ্ছা তাইই। ওদের মনে কোন বিকার নেই, এ বিদ্যায় ওরা পাকা।

অবশেষে সূর্যদেবের কৃপায় ভিক্টর মুক্তি পেল। যখন সে বলছিল তখন রোদ যেন পাশব আনন্দে চোখে ছুঁচ ফোটাচ্ছিল, উঠে দাঁড়ালে সিক্ত চোখে লাগছিল ছায়ার প্রলেপ। একবার পড়ে গিয়ে সে আর উঠতে পারল না—ভারসাম্য আর বজায় রাখতে পারল না। মাথায় লাথি পড়ছে, লাঠির ঘা পড়ছে, ওরা ওকে পা দিয়ে মাড়াচ্ছে—তবু সে নিশ্চল হয়ে থাকে, ক্লোরোফর্ম্ করা রোগীর মতন। ব্যথার অনুভূতি থাকলেও প্রতিক্রিয়া আর রইল না। ওরা ভাবল ভিক্টর জ্ঞান হারিয়েছে। মার বন্ধ হয়—ওরাও ক্লান্ত হয়েছে। বসে পড়ে দোভাষীটা, কপালের ঘাম মোছে। ফ্রস্ট জানলা দিয়ে তাকায় বাইরে—সেখানে নব বসন্তের প্রথম স্পর্শ জেগেছে। কেবল পোলটা পরখ করে বন্দীকে, চোখের মধ্যে তাকায়, এখানে ওখানে পা দিয়ে গুঁতো মারে। এই বিরাম মুহূর্তে ভিক্টর জ্ঞান ফিরে পায়।

যথাসম্ভব মনোবল প্রয়োগ করে সে ভাবতে থাকে, একটু সময় আমাকে নিতেই হবে, ওদের জানাতেই হবে সব কথা।

সহসা সে উঠে দাঁড়ায়—তার দাঁড়ানোতে শত্রুপক্ষ হক্‌চকিয়ে যায়। পোলটাও তাকে বাধা দেয় না। তাদের তিনজনেই এমনভাবে তাকাল ওর দিকে, যেন ভূত দেখছে।

দোভাষীটাই প্রথম সামলে নেয়। চিমটি কাটা ভঙ্গিতে সে শুধোয়, "কি রে, মুখ কি খুলবি ?"

নীরবে মাথা নাড়ে ভিক্টর। কোন রকমে সে বলে, "কিছুই বলবার নেই।" করুণভাবে বলে চলে, "সহরের রাস্তায় কত লোক যায় আসে। বাঁধা ঠিকানা তাদের নেই। আমি জানিনা। আমি সেই লোকটার ঠিকানা বা নাম জানি না, তবে কোথায় তাকে পাওয়া যেতে পারে, সেটা বলতে পারি।"

কটা বাজে আন্দাজ করার চেষ্টা করে সে। ভাবে, এক ঘণ্টা সময় পেলেও হয়।

ভিক্টর আবার বলে, "কোথায় তাকে দশটার সময় পাওয়া যাবে, সেটা আমার জানা আছে।"

ওকে আবার নিয়ে ঢুকানো হল সেই কুঠরিতে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে ওর জীবন বেরিয়ে যায়। কুঠরিতে ফিরে মাথাটাকে মনে হয় যন্ত্রণা আর রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার একটা পিণ্ড তবু এক মুহূর্তও সে নষ্ট করে না। পকেট হাতড়ে এক টুকরো পেন্সিল আর কাগজ বের করে সে এক সম্ভ্রান্ত মহিলার ঠিকনা লিখতে সুরু করে। বার বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে কেউ দেখছে কি না। ভিক্টর লিখল, আবহাওয়া খারাপ পড়েছে। কোন কোন নেকড়ের শরীরে বিষ ঢুকেছে। সাবধান থাকা দরকার। ভিক্টর বিদায়। ভিক্টর।"

খানিকটা বাদে যা তার হিসেব মত মিনিট পাঁচেক হবে—ওরা তিনজন ঘরে এল। ইউনিফর্ম পরা। ওকে নিয়ে চলল বাইরে। গাড়িতে উঠবার ঠিক আগে দোভাষী একটা বন্দুক উঁচিয়ে—তাকে বলল। "পালাবার চেষ্টা করলেই কিন্তু—"

এ হুঁশিয়ারী ভিক্টরের মনে দাগ কাটতে পারে না। মৃত্যুকে আর চরমতম দুর্ভাগ্য বলে মনে হচ্ছে না। কালো গাড়িটাতেই তাকে চড়ানো হয়েছে। থিয়েটার স্কোয়ারে যখন গাড়িটা এল তখন সে কোনও রকমে বলল, "এখানে থামাও।" গাড়ি থেমে যায়। ওরা ভিক্টরকে নামতে সাহায্য করল। সামনে সে, পিছনে ত্রিমূর্তি। কাগজে লেখা খবরটা কি করে মাটিতে ফেলে দেওয়া যায়—তাই ভাবতে থাকে সে। যে হাতে কাগজটা ধরা—সেটা সেঁটে রাখে গায়ের সঙ্গে। এই হাতে ভরদিয়ে হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ওরা টেনেতুলল ভিক্টরকে আশপাশের লোকজন কৌতূহলী হয়ে তাকাতে শুরু করে। কাগজের টুকরোটা পড়ে রইল রাস্তার উপরে। কাগজটার গতি কি হবে—সেভাবনা তার মোটেই হয় না—কারণ তাতে তার হাত কিছুই নেই। ভিয়েস বোভা ষ্ট্রীটের একটা বাড়ির ফটকে ঢুকে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাস্তার লোকজনের উপর নজর রাখার ভান করে। বসন্তের উষ্ণতা তাকে মাতিয়ে দেয়, মুহূর্তের জন্যে মনে হয়, দুঃখ কি, কোন চিন্তা নেই, ব্যথা নেই। ক্লান্তিতে সব

যেন ভেঙে আসছে। একটু পরে সে বলল, "এবার ফেরা যাক। কাউকেইতো দেখতে পাচ্ছি না।"

—উত্তর না দিয়ে গেস্টাপোগুলো ওকে ঠেলে গাড়িতে তুলল। চলতে থাকে গাড়িটা। ব্রাচ্‌কা আর চ্‌মিয়েন্‌রার মোড়ে একটা ঘটনা ঘটে গেল। ভিক্টর জানলাদিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল তবে শূন্য-দৃষ্টিতে। হঠাৎ দখতে পেল তার স্ত্রীকে—আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে বিষণ্ণ, হতাশমুখ—মাথাটা নোয়ানো! সে অবশ্য ভিক্টরকে দেখতে পায়নি। ভিক্টর যেন জীবন ফিরে পেল। জানলায় মুখ লাগিয়ে চেঁচিয়ে কিছু বলতে চাইল—যাই হোক কিছু। কিন্তু নিজেকে সে সামলে নেয়। গেস্টাপোগুলো ওর এই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেছে।

দোভাষী সুধোল, "কে যাচ্ছে রাস্তায় ?"

ভিক্টরের জবাবে স্ফূর্তির আভাস, "কই, কেউ নাতো।"

খেঁকিয়ে উঠল দোভাষী, "দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি।"

মনে হয় যেন জ্বর হয়েছে। একবার, মাত্র একবার যদি ওকে বাঁধতে পারত আলিঙ্গনে। মাত্র পাঁচমিনিটের জন্যে দেখা হত ওর সঙ্গে, ওর চোখে চোখ রাখতে পারত, চুম্বনে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারত। তার এই ক্ষতবিক্ষত দেহে এখনো প্রেমের ঠাঁই রয়েছে।

উপর থেকে পাঠানো লোকটার খোঁজ ওরা কি করে পেল। ভিক্টর ভাবতে থাকে। ওরা চায় যে ভিক্টর লোকটাকে ধরিয়ে দিক। কোথায় সে আসে, তা ওর জানা আছে। সমস্ত ব্যাপারটাই মনে কেমন ধোঁকা লাগায়। সহকর্মীদের প্রত্যেককে সে চেনে, বছরের পর বছর পাশাপাশি কাজ করে এসেছে। বেশ চলছিল কাজ, হঠাৎ উপর থেকে পাঠিয়ে দিল লোকটাকে তালিম দেওয়ার জন্যে। সে এসেই বলতে লাগল, সব ঢেলে সাজানো দরকার। তারপরই ভিক্টর গ্রেপ্তার হয়ে গেল। বিমর্ষ ভাবে ও সেলে ফিরে আসে-ফিরে আর এ চিন্তার সময় পাওয়া যায় না, কারণ ওরা তিনজন আর একমুহূর্তও নষ্ট না করে কাজে লেগে গেল। পোলটার হাতে লোহার ডাণ্ডা, আঘাত পড়তে থাকে ঘাড়ে, মাথায়, সারা গায়ে।

মারবার এই পদ্ধতিটাতে বেশ করুণার পরিচয় আছে, কারণ বেশিক্ষণ জ্ঞান থাকে না। ভিক্টর অজ্ঞান হয়ে গেল।

জ্ঞান ফিরে এলে সে বুঝে উঠতে পারে না যে এই অবস্থায় কতক্ষণ ছিল। ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়ে। গায়ে, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা বাঁ চোখটা ফুলে ঢোল, কিছু দেখা যাচ্ছে না। আর কখনো সে ভাবতে পারেনি যে নিজের শরীরটা এত বিরাট, শরীরে এত কোষ আর স্নায়ুর সমাবেশ। মনে হয় যেন সে হাজার হাজার ব্যথার টুকরোয় খান্ খান্ হয়ে যাচ্ছে; আবার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ওই ব্যথার টুকরোগুলো জুড়েই তার দেহটা তৈরী হয়েছে। এই শীত শাত করছে, আবার কখনো বা কেমন গুমোট মনে হচ্ছে। নিজের মনে কি যেন বিড়্ বিড়্ করে বলে ভিক্টর আর্তনাদ করে উঠল।

এখন তার মনে নানা চিন্তার ভিড়। এসব ঝামেলায় সে আর থাকবে না, তালিমদারকে ধরিয়ে দেবে। তা হলে ও নিশ্চয়ই ছাড়া পাবে, ফিরে যাবে স্ত্রীর পাশে। তার পর নিরুপদ্রবে কাটিয়ে দেবে সারা জীবন। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। শুধু মা, আর স্ত্রীর জন্যেই বেঁচে থাকবে। ভিক্টর চীৎকার করে বলতে চাইল, ছেড়ে দাও। বলতে, চাইল যে তাকে যা বলা হবে, তাই করবে। কিন্তু সে শক্তি তার ছিল না। আর ভিতরে লড়াই চলছে নিজের সঙ্গে। ওরা তিনজন ঢুকল ঘরে—প্রত্যেকের হাতে চাবুক লক্‌লক্ করছে।

দোভাষীটা জিজ্ঞাসা করে, "কিরে, মুখ খুলবি?" ফিস্ ফিস্ করে ভিক্টর জানায় সে রাজী আছে।

তুই কেবল ওই লোকটা ধরিয়ে দে। তোকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তোকে নয়, তাকেই আমাদের দরকার।"

ভিক্টর খুসী হয়। ওকে তো ছেড়ে দেবে। ধরবে তালিমদারটাকে।

আবার গাড়িতে। ভিক্টর ড্রাইভারটাকে এমন সব জয়গায় যেতে বলল, যেখানে লোকটাকে পাওয়া যাবে না। ওর কেবল ভয় হচ্ছে, যদি দেখা হয়ে যায়। মনে মনে ভালই জানে যে বিশ্বাসঘাতকতা সে করতে পারবে না। সমস্ত জগতের বিনিময়েও না। কিন্তু তবু তারই সাথেই নিজের

জন্যে সে শেষ সম্বলের ক্ষত জ্বালিয়ে রাখতে চাইল একটু আশার আগুন।

সারা জলিবর্জ এলাকাটা চষেবেড়ায় ওরা, কারণ ভিক্টর জানত যে তালিমদারটা, তখন থাকবে মোকোতভ্ অঞ্চলে। কাফে, বার, রেস্তোরাঁ সর্বত্র ঘুরে বেড়ান হল। হাঁটছিল অবশ্য ওরা তিনজন ভিক্টর টলতে টলতে যাচ্ছিল। কখনো বা বাড়ীর দরজায় ওঁৎ পেতে রইল। খোঁজাখুঁজি চলল, এদিক ওদিক লক্ষ্য করা হল। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। শেষে চটে গিয়ে ফ্রস্ট আদেশ দিল ফিরে যাবার। ফিরে এসে ফালতু আসা যাওয়া মিথ্যা কথা আর সময় নষ্টের জন্যে আবার চলল মারের পালা।

আর্ত্তনাদ করে ভিক্টর বলে যে দোষ তার নয়, কিন্তু ফল হয় না প্রতিবাদে। ওরা নিজেদের কাজ করেই চলেছে। অবশেষে এলিয়ে পড়ে ভিক্টর, কোন আঘাতই যেন ওকে স্পর্শ করতে পারে না। তখন ওরা ছেড়ে দিল ওকে।

অসাড়, বুদ্ধিভ্রষ্ট অবস্থায় বহুক্ষণ পড়ে থাকে সে। ব্যথার বিষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে যেন তিরস্কার করছে। সমস্ত পোষাক রক্তে ভিজে গেছে, এখনো ক্ষতমুখ থেকে ঝরে পড়ছে রক্ত। এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে তার মধ্যে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। যন্ত্রণার কবলে অসাড় অবস্থায় নিজেকে আর জীবন্ত মানুষ বলে মনেও হয় না, অথচ সে তো মরেও যায় নি। এত কষ্ট, কিন্তু উপশমের কোন উপায় নেই। ভিক্টর যেন ভূত দেখতে সুরু করে, বিচিত্র অসংলগ্ন চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কখন জ্বরতপ্ত ঘুমে ঢলে পড়ে, বিভীষিকায় আর্তনাদ করে জেগে ওঠে। ঘুমে শ্রান্তির কোন উপশম নেই। জেগে উঠে শূন্যদৃষ্টিতে তাকায় চারপাশে আবার ঢলে পড়ে অবসন্ন নিদ্রায়। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, কিন্তু ভিক্টরের কাছে সময় নিশ্চল। কঠোর বাস্তব ওকে ঘিরে রেখেছে দুঃস্বপ্নে। যে একদিন মানুষ ছিল—আজ ভগ্নজানু, স্ফীতদেহ, স্বপ্নাচ্ছন্ন, অচেতন অবস্থায় সে কোন রকমে প্রাণপ্রদীপ জেলে রাখে।

বিকট তৃষ্ণায় ভিক্টর জেগে উঠল। শুকনো জিবটা আটকে গেছে। গলায় অসম্ভব জ্বালা। জলের জন্ম চীৎকার করার শক্তি নেই; অবশ্য

চাইলেই যে ফল হত, তা নয়। তাকে যন্ত্রণা দেবার জন্যেই যেন এক থোলো আঙুর এসে ঝুলতে থাকে তার চোখের উপর। নিটোল, সবুজ, রসে টলমল করছে। ছবিটা এত বাস্তব যে টলটলে আঙুরগুলোর সুগন্ধ যেন ওকে মাতিয়ে তোলে। শুধু রসটা নিঙড়ে খাওয়াই তার আয়ত্তের বাইরে।

পোলটা দোভাষীর সঙ্গে আবার এল তার কাছে। মুখে কথা নেই, হাতে লাঠি আর চাবুক। ঘরে পায়চারী করে আর ভিক্টরের দিকে তাকায়।

নির্মম প্রভুর দিকে কুকুর যে ভাবে তাকায়, ভিক্টর ওদের দিকে সেই দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কি চায় ওরা। হঠাৎ দোভাষীটা খেঁকিয়ে ওঠে। "এই ওঠ্। তোকে জেরা করা হবে।"

ভিক্টর নিশ্চল হয়ে থাকে, যেন দেখাতে চায় যে তাকেও তাচ্ছিল্য করলে চলবে না, তারও বলবার কিছু আছে। তাকে ওরা মারধর করেছে, আহত অবস্থায় সে উঠতে পারবে না। অবশ্য যদি ওরা আর মারধর না করে, তবে সে উঠতে পারে।

ওরা অবশ্য বুঝিয়ে দেবার ত্রুটি করলনা যে উঠে তেতালায় যাবার শক্তি ভিক্টরের যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ৩১৭নং কামরায় ক্রস্ট ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। অচঞ্চল, আহত দৃষ্টিতে সে তাকাল ভিক্টরের দিকে।

কোথা থেকে ওরা অস্ত্রশস্ত্র কেনে আর ওদের ছাপাখানাটাই বা কোথায়, ভিক্টরকে জিজ্ঞাসা করা হল। দুর্বলকণ্ঠে ভিক্টর অস্পষ্ট জবাব দেয়। দুর্বল হলেও ওর গলায় দৃঢ়তার অভাব ছিল না।

আবার শুরু হল মার। হাতে আর আঙুলে। এখানে ওরা যত খুশী মারতে পারবে, ভিক্টরের অজ্ঞান হবার সম্ভাবনা নেই।

অসহ্য যন্ত্রণা, তবু সে আর্তনাদ না করবার চেষ্টা করছে। লজ্জা বোধ হয়। দাঁতে দাঁত চেপে সে দাঁড়িয়ে থাকে, ভীষণ মুখভঙ্গিতে মুখটা বিকৃত হয়ে যায়। মাঝে মাঝে নিজের অজান্তে চীৎকার করে উঠেই আবার চুপ করে যায়। ওরা পালা করে কাজ চালায়। দোভাষীর পরে পোলটা, পোলটার পরে দোভাষী। হাত দুটো আস্তে আস্তে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়—সবটা মিলে যেন একটা রক্তাক্ত ক্ষত। এবার ওরা উরুতে আঘাত

করে। ছটফট করে ভিক্টর—ব্যথা আর সইতে পারে না। লোকগুলো ওকে ধরে চেপে রাখল।

এমন সময় কোন চিন্তা না করেই, সম্পূর্ণ নিজের অজান্তে হঠাৎ প্রাণপণ চেষ্টায় ভিক্টর জানলাটা লক্ষ্য করে লাফিয়ে পড়ল। ওখানে কাঁচের সার্সীর ওপারে আছে মুক্তি—এই মুক্তিই সে চেয়েছিল। কিন্তু তাহলে ও পড়ে গিয়ে এত আঘাত পেল কি করে। এসব বিস্ময় ওস্তাদ দোভাষীটা পা দিয়ে ওকে প্যাঁচ কষে মাঝপথেই ফেলে দিয়েছে।

আর কোন উপায় তার রইল না।

মেঝেয় পেড়ে ফেলে সারা শরীরে ওরা তাণ্ডব সুরু করল। ভয়ংকর ভাবে, নির্মম ভাবে আঘাত করে, মেরে ফেলতে চায় ভিক্টরকে। ঠোঁট দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে লালা। সারা ঘর ভারী হয়ে যায় মলের দুর্গন্ধে—আঘাতে আঘাতে পাকস্থলীতে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। চাষী মেয়েরা পাটে কাপড় আছড়ানোর সময় যেমন শব্দ হয়, ওর মলে ভরা প্যাণ্টের উপর লাঠির ঘা পড়ে তেমনি শব্দ হতে থাকে।

অর্ধচেতন অবস্থায় ও নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে। গোঁ গোঁ করে, কাকুতি মিনতি করে, মার বন্ধ করলে সত্যিকথা বলবে প্রতিজ্ঞা করে, চীৎকার করে কাঁদতে থাকে। তার অঙ্গভঙ্গিতে মনে হয় যেন শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে যাচ্ছে।

মার থেমে যায়। ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভিক্টর বলল ওকে শহরের দিকে নিয়ে যেতে, ও নিশ্চয় ধরিয়ে দেবে লোকটাকে।

ওদের কিছুই ক্ষতি নেই, ভান করল যেন তার সব কথা ওরা বিশ্বাস করেছে। গাড়ির মধ্যে একটু শান্ত হয় ভিক্টর। খোলা জানলা দিয়ে ঢুকছে টাটকা বাতাস—একটু আরাম বোধ হয়। দেহে, মনে সে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। সে তখন এত অবসন্ন যে সেই অবস্থায় তাকে যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিয়ে ফেলত। ঘৃণা, ভালবাসা—সবকিছু সে হারিয়ে বসেছে। এত দিন যতকিছুকে সে মূল্য দিয়ে এসেছে—সব কিছু সেই মূল্য হারিয়ে ফেলেছে—সবই নিরর্থক মনে হয়।

দোভাষী যখন জিজ্ঞাসা করল কোথায় লোকটাকে পাওয়া যাবে, তখন বলছে না জেনেই ভিক্টর একটা জবাব দিয়ে বসে।

এক সময়ে সে ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলল। ঘুম ঘুম এলিয়ে পড়া ভাব সত্ত্বেও সে কিছুটা তৃপ্তি আর সজীবতা অনুভব করে। আত্মপ্রবঞ্চনা না করে সে চিন্তা করে। সামনে কি আসছে তা ওর অজানা নেই। ভিক্টর স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেচে। হঠাৎ সে ভিতর থেকে কিসের তাগিদের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায়—চার পাশে তাকিয়ে দেখে, চোখ খোলে, চোখ বন্ধ করে, নিজের মনে কথা বলে। সব মিলিয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে। মহাশূন্যের দুর্নিবার আকর্ষণে সাড়া দিতে সে প্রস্তুত, এই সে চায়।

গাড়িটা থামল। গাড়ি থেকে নেমে ওরা ভিক্টরকে টেনে নিয়ে চলল। ওকে ক্ষতবিক্ষত হাত দুটো পকেটে ভরে রাখতে হুকুম দেয়—যদিও আহত মুখটা ঢাকা পড়ে না তাতে। একটা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে ওরা থামল। ঠিক ভিতরটায় ভিক্টর কোন রকমে দাঁড়িয়ে থাকে। পিছনে তিন জল্লাদ। ওদের দিকে চেয়ে সে একটু হাসে। তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে, যেখানে ঠিক সেই সময়ে একটাও লোক নেই। তারপর হঠাৎ টলতে টলতে ছুটতে সুরু করে।

ভাগ্য ভাল যে ঠিক সেই মুহূর্তে ক্রস্ট সিগারেট ধরাচ্ছিল, পোলটা পিছনে তাকিয়ে কি যেন দেখছিল, আর দোভাষীটা নাক ঝাড়ায় ব্যস্ত ছিল।

দড়াম করে ফটকটা টেনে দিয়ে ছুটতে থাকে রাস্তায়। ছোটা বললে ভুল হবে, টলতে টলতে কাঁপতে কাঁপতে ছোট ছোট ধাপে এগিয়ে চলে ভিক্টর। প্যান্টে জমে থাকা মলে পাছায় তীব্র যন্ত্রণা হয়।

পোলটা পিছু ধাওয়া করতে চায়। কিন্তু ক্রস্ট এবার দয়া করতে চায় ভিক্টরকে। ভিক্টরের চেহারা আর সে দেখতে পারে না, যথেষ্ট হয়েছে সময় নষ্ট করে, আর লাভও নেই। প্রভুর মনের কথা বুঝতে পোলটার এক মুহূর্ত দেরী হয় না। অটোমেটিকটা বাগিয়ে সে পর পর কয়েকটা গুলি ছুড়ল।

ঠিক যে মুহূর্তে ভিক্টরের মনে হচ্ছিল যে আর দৌড়ান বা হাঁটা অসম্ভব,

এখনি সে পড়ে যাবে। ঠিক তখনই তার গায়ে গুলি বিঁধল। অমানুষিক মনের জোরে সে আরো চলতে চায়,—তারপর ঝাঁঝরা হয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

যখন জীবনের সীমানা খুলে গেল ভিক্টরের সামনে তখন কাছের কোন ঘড়িতে ছটা বাজছিল। আঙুলগুলো সোজা হয়ে গেল, হাত দুটো উপরে উঠে গেল, চেপে বন্ধ করল মুখ, তারপর যেন আনন্দের উচ্ছ্বাসে চোখ বুঁজল। তারপর চিরকালের মত....মাটি আঁকড়ে ধরে ভিক্টর পড়ে গেল।

"মৃত্যুর চব্বিশঘন্টা"
—ইয়ার্সি পিৎলাকাউস্কি

ও অঞ্চলটা আমার পরিচিত, তাই ওখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে। সেই পাহাড়, উপত্যকা, সব একাকার করে দেওয়া গাছপালার সার, আর আকাশের বুকে সেই জ্বলন্ত নিষ্ঠুর সূর্য—কিছুই ভুলতে পারি নি। ভাসমান মেঘমালায় আকাশের একঘেয়েমীতে মাঝে মাঝে কিছু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হত—তাও এত ক্ষীণ যে চোখে তার কোন ছাপ পড়ত না।

কাঁটাতারে ঘেরা শিবিরটা যেন মৃত্যুর পাশের ঘর; ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে রোগীরা বা রঙরুটরা যেখানে নগ্ন শরীরে অপেক্ষা করে, সেই প্রতীক্ষা কক্ষের মত।

এ লোকগুলির বর্ণনায় লাভ কি। স্ত্রী, পুরুষ, ছেলেমেয়ে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাদের তুচ্ছ ক্রিয়াকলাপ, তাদের ঈর্ষাদ্বেষ, অথবা তাদের আত্ম-সংযম আর বীরত্ব—যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিঃস্বার্থ, কারণ পরমুহূর্তেই এরা পা বাড়াবে মৃত্যুর পথে—কেউ বাদ যাবে না, যারা দেখছে তারাও, যারা—এই মহত্বের পরিচয় দিচ্ছে, তারাও।

সে বছরে জুনমাসে গুমোট গরম। ফসল মাড়াইএর উঠোনের মত সমান, আর রক্ত, দেহ নির্গত তরল পদার্থে জমাট বেঁধে যাওয়া, গোয়াল ঘরের মেঝের মত জমিটায় ছ হাজার মানুষ নিজেদের পালার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। এরা এখনো জীবনের স্পর্শে চঞ্চল, দু চোখে গেঁথে নিচ্ছে ছবির পরে ছবি। বিশ্বাস হয় না, তবু এই শেষ বার। বুক জোড়া তৃষ্ণা, এক চুমুক জলও আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে যেন তাদের মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু জল জোগাড় করা অসম্ভব। এ রকম মুহূর্তে মানুষের প্রবৃত্তি সক্রিয়

থাকে না—মৃত্যুই মনে হয় একমাত্র আকাঙ্খিত মুক্তি যখন তৃষ্ণা আর থাকবে না, নয়ত তৃষ্ণার শান্তি হবে মহাসাগরের অতল শীতলতায়।

যখন এক এক দলে দুশো লোকে ভাগ হয়ে খাড়া পথ বেয়ে নগ্ন লোকগুলো এগিয়ে চলতে থাকে সেই দিকে, যে দিক থেকে শিকারক্ষেত্রের মত চাপা গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে মৃদু বাতাসে, তখন চার পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যে কেমন নিষ্ঠুর ছাপ। তার চোখ দুটো প্রকৃতির দেয়াল ভেদ করে ওপারে কোন চরম সত্য আবিষ্কার করতে চাইল। কিন্তু ওপারে কিছু নেই, আছে শুধু নিজের আত্মা যা রেখার মত ঘিরে আছে পৃথিবীকে, আর আছে আকাশ, ধোঁয়ার থামে ভর দিয়ে। রয়েছে শুধু মহাশূন্য—যেখানে বাধাহীন মানুষ নিজের পায়ে স্পর্শ করতে পারে যে কোন পথ, হাত বাড়িয়ে যে কোন ডাল ধরতে পারে, যে কোন গাছকে পছন্দ করতে পারে।

জীবনের কাছ থেকে বিদায় পর্ব তাদের এই ভাবেই শেষ হল। শরীর এত শুকিয়ে গেছে যে এক ফোটা জল এল না চোখে, রোদে পোড়া পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া মানুষের পায়ে পায়ে যে ধুলো উড়ছে—তাতে চোখ ব্যথা হয়ে রয়েছে।

ওরা এসে থামল মূল খাড়িটার মুখে, শেষ বারের মত। মূল খাড়িটা ভাগ হয়ে গেছে কয়েকটা শাখায়, জল শুকিয়ে যাওয়ার পর হলদে কাদার প্রলেপ সেখানে। বন্দীদের গুণতি শেষ হল, এক এক দলে দশজন করে ভাগ করে দেওয়া হল। তার পর তাদের হুকুম দেওয়া হল ছুটতে—যেদিক থেকে ভেসে আসছে হাজার বন্দুকের গুলির তীক্ষ্ণ আওয়াজ, আর মাঝে মাঝে দু একটা গুলির একক আর্তনাদ।

নিজের পালা যখন এল তখন সে সৈনিক জীবনে প্রথম টাইফয়েডের টিকা নেবার সময় যে রকম ভয় পেয়েছিল তার চেয়ে বেশি ভয় পায় না। এটা বোধ হয় খাঁটি কথা যে, জীবনে দুঃখ যত ঘন হয়ে আসে, মৃত্যুও ততই অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

মানবচরিত্রের বৈচিত্র্যের উদাহরণ হিসাবে সঙ্গী সাথীদের বিচিত্র ব্যবহারের শত শত কাহিনী উদ্ধার করা যায়। অনেকের এই ধারণা

বদ্ধমূল হত—যে যা ঘটছে, তা সব দুঃস্বপ্ন, এর পরে তারা জেগে উঠতে পারবে নিরাপদ আশ্রয়ে, হৃৎপিণ্ড বেজে উঠবে জীবনছন্দের তালে তালে। বাচ্চাগুলো, তাদের সাথে বয়স্করাও লুকিয়ে থাকতে চাইত এক গোছা ঘাসে মাথা গুঁজে, বুঝত না যে একমাত্র দেবদূতই পাখার আড়ালে তাদের জার্মান সৈন্যদের শ্যেনদৃষ্টি থেকে বাঁচাতে পারে। জার্মানরা হতভাগ্যদের লাথি মারতে মারতে লাইনে ঢুকিয়ে দিত। অবশেষে এল তার পালা, দশজনের দলে দুতিন জনের পরে তার স্থান। চাপড়ে জার্মানগুলো চীৎকার করে, লাঠিপেটা করে ওদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল। যেমন করে পশুদের বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। খাড়িটার দিকে ছুটে যাওয়ার সময় শেষবারের মত ওর চোখে পড়ল সব শেষের জার্মানটার উত্তেজিত মুখ— ওর চীৎকার গুলির শব্দে ডুবে গেছে, তর্জনীটা উদ্যত হয়ে ওদের দেখিয়ে দিচ্ছে গন্তব্য কোথায়।

তার সেই মুহূর্তের আবেগ অনুভূতি আমাদের কল্পনার অতীত। মৃত্যুর সঘন সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতা কার নেই। যে উদ্যত ক্ষুর একটুর জন্যে লক্ষ্য হারিয়েছে, তার ধারের সঙ্গে এর তুলনা। জার্মানরা ঢালু পাহাড়ের গায়ে অর্ধবৃত্তাকারে স্থান নিয়েছে। চারদিক থেকে গুলি চলছে। সামনে যারা ছুটছিল, তারা কাটা গাছের মত গড়িয়ে পড়ছে। ও ঠিক সামনে দেখতে পেল একটা বিরাট, লাল টকটকে মুখ আর একটা উদ্যত অটোমেটিক পিস্তল। সেই মুহূর্তে কারো একটা রক্তাক্ত পায়ে হোঁচট খেয়ে সে পড়ে গেল। ঠিক সেই সময় থেকে ওর মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়ে উঠল। ও ভাবতে থাকে এই হল রক্তমাংসের অস্তিত্ব থেকে চেতনার উজ্জ্বল মুক্তি।—তখনই সে আবিষ্কার করল যে চিন্তাই জীবনের দ্যোতক। কার যেন একটা ঊরু ওর গায়ের উপর পড়ে আছে, পেশীর সংকোচনে পিঠে শুড়শুড়ি লাগছে। বেঁচে আছে অনুভব করামাত্র আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষা ওর এত তীব্র হয়ে উঠল যে প্রত্যেকটি গুলির আওয়াজ ওকে বিদ্ধ করতে থাকে ভয়ে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যেমন হয়, তেমনি। মুহূর্তের নিঃস্তব্ধতার অবসরে সে এই পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পেরে যে সুযোগ পেয়েছে, তার হিসেব করতে থাকে। বরং বলা চলে যে এই মুহূর্ত থেকেই তার জীবনের সুরু। সে

বুঝতে পারে যে বেঁচে থাকবার একমাত্র উপায় হল নিঃসাড়ে পড়ে থাকা। মনে এভাবনাও এল যে চিন্তা করা বন্ধ করা উচিত কিনা, যেন কেউ তার মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ আবিষ্কার করে ফেলতে পারে। বেঁচে থাকার জন্যে আনন্দিত হবার সময় এখনো আসে নি—তবু ……সে আনন্দ বশ করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। বারবার সে মনে মনে আওড়ায়, "এখনো বিপদ কাটে নি। এখনো আমি নিরাপদ হতে পারি নি। যে কোন সময়ে একটা গুলি এসে আমায় বিঁধতে পারে। সেটা হবে বোকার মরণ।"

গুলিবর্ষণ একসময় থেমে যায়। ও আন্দাজ করে যে খাড়িটার এই শাখাটা নিশ্চয়ই ভরাট হয়ে গেছে, তাই জার্মানগুলো নিশ্চয় এখানে কয়েকজন প্রহরী রেখে অন্যত্র কাজ করছে। প্রহরীগুলোর জার্মান য়ুক্রেনিয়ান মিশোন খিস্তি কানে ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে রাত্রের মত দুএকটা গুলির আওয়াজ—আর তার পরেই কারো আর্তনাদ, বা কোন মৃত্যুপথযাত্রীর হাত পা ছোঁড়ার শব্দ।

বিকেলটার যেন শেষ নেই, রোদের তেজ একটুও কমছে না। চোখে রোদ লাগলেই মনে হচ্ছিল যে অন্ধকারের সূচনার বদলে সূর্যের আলোই আরো প্রখর হয়ে উঠছে। সবগুলো ইন্দ্রিয় আর তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বশে রাখার মত শাস্তি মানুষের আর কিছু নেই। একটা বিরাট মাছি যদি নগ্নদেহের উপর দিয়ে চলাফেরা করে, উড়ে যায়, আবার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত জায়গায় এসে বসে, তাকে তাড়াবার অক্ষমতার মত দুরবস্থা আর কি হতে পারে। যে কোন অঙ্গে তার পায়ের সুড়সুড়ি আর হুলের খোঁচার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। নিজের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এই লুকোচুরি কতক্ষণ চলেছিল কে জানে। একটু পরেই কিন্তু সে বুঝতে পারে—সে যে বেঁচে আছে এ খবর এই পোকামাকড়েরই জানা, আর কেউ তা জানে না।

এক সময় কখন চোখের পাতা খুলে সে দেখতে পেল যে অপ্রত্যাশিত ভাবে নেমে এসেছে সন্ধ্যা, যেন খাড়িটা কে হঠাৎ ঢাকনী দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। ঠাণ্ডাতেও হতে পারে, প্রবল স্নায়বিক পীড়নের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যেও হতে পারে, ও কাঁপতে শুরু করে। এই কাঁপুনির

জন্মে ধরা পড়ে যেতে পারে, এ ভয় থাকলেও এর উপর তার হাত ছিল না। পাছে কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে প্রায় পনের মিনিট ধরে মাথা আধ ইঞ্চি মত উঠিয়ে সে ঠিক সামনে দেখতে পায় নিজের হাতটা। ভারী আনন্দ লাগে, একটু শান্তি হয়। হাতের কাঁপুনী তার চোখে পড়ে না। তারপর সে মাথাটা ঘুরিয়ে এমন জায়গায় চাইল যেখান থেকে চার পাশের সব কিছু দেখা যায়। এই চেষ্টায় তার সময় লাগল প্রায় তিরিশ মিনিট। মাঝে মাঝে এত মন্থর ভাবে সে মাথা তোলে যে পেশীগুলো সেই মন্থরতার সঙ্গে তাল রাখতে পারে না।

ওর সামনের দিকে খাড়িটা সরু হয়ে এগিয়ে গেছে। ছোট ছোট চারাগাছ আর ঝোপঝাড়, ঝিরঝিরে বাতাস, দূর যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কোথা থেকে ভেসে আসছে শিসের আওয়াজ। দেখা না গেলেও বেশ বোঝা যায় যে একজন পাহারাদার ধারে কাছে কোথাও আছে। চাঁদ ওঠার ঠিক আগে অন্ধকার দ্রুত ঘনিয়ে এল—যদি প্রাণ বাঁচাতে হয়, তবে চাঁদের আলো নেমে আসবার আগেই পালাতে হবে। একটু আগেই মন বলছিল যে খাড়ি বেয়েই যাওয়া উচিত, যার মানে ঐ শিস দেওয়া প্রহরীটার দিকেই যাওয়া। এখন কোন পথে পালাবে স্থির করার আগে সমস্যার কথা সে না ভেবে পারে না, যদিও এ চিন্তা এ অবস্থায় হাস্যকর। পরনে কিছুই নেই, সেই হল সমস্যা। সহস্র শবের এই রাজ্যের ঈষৎ ঔজ্জ্বল্য অতিক্রম করে যখন সে দূরের পথে এগিয়ে যাবে তখন তার নগ্ন দেহ সমস্যার সৃষ্টি করবে। সে লক্ষ্য করেছে যে অন্ধকারে জলের চেয়েও মানুষের দেহ নজরে পড়ে বেশি। এর যেন নিজস্ব ঔজ্জ্বল্য আছে। ও বুঝতে পারে না, যে কজন পাহারাদার উপরে পায়চারি করছে। তাদের চোখ তখন এদিকে নেই। ওরা এ দিকে তাকাচ্ছেই না—আবর্জনাস্তূপের পাশ দিয়ে যাবার সময় লোকে যেমন সেদিকে তাকাতে চায়না, সেই রকম। এসবে যে তার মনে খুব দাগ কেটেছে এমন নয়। তবু এতগুলি হিমশীতল মানবশরীরে ভরাট খাড়িটার পাশ দিয়ে চলাচল করার সময়ে মনটা যে একটু কেমন কেমন করে না—এমনও নয়। মনস্থির করে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠতে

গিয়ে সে ভয় পেয়ে গেল—বহুদিনের মধ্যে এই প্রথম প্রকৃতপক্ষে তার ভয় লাগল; স্বাধীন অবস্থাতেই এই অনুভূতির অস্তিত্ব ছিল। সে ভয় পেল কারণ আশপাশে কোথাও মোটরের কাদা ছিটানর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।—সেই পরিচিত জঘন্য শব্দটা বাতাসের বুক চিরে ফেলছে।

মোটরটা থামল, কিন্তু ইঞ্জিন চলতেই থাকে। মানুষের গলা শোনা যায়, তারপর মৃতের স্তূপের উপর ঘুরতে থাকে সন্ধানী আলোর শ্যেনদৃষ্টি।

সেদিনের পরিশ্রমের ফলাফল সম্পর্কে দু একটা মন্তব্য, মাটিচাপা দেবার সবচেয়ে ভাল উপায় সম্বন্ধে আলোচনা—তারপর দরজা বন্ধের আওয়াজ। মোটরটার চলে যাবার শব্দে তার ভয়ও কমে যায়। শব্দটা রাতের নিঃস্তব্ধতায় যতক্ষণ না মিলিয়ে যায়, ততক্ষণ সে কান পেতে শোনে।

এ দলটা এসেছিল কাজকর্মের তদারক করার জন্যে। আগে যেমন ডাক্তার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর মৃত্যুর সাক্ষ্য দাখিল করত, এরাও তেমনই····মৃত্যুযজ্ঞের সাফল্য নিজের চোখে দেখে গেল। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এটা নেহাৎই প্রথাগত ব্যাপার। গাড়িটা চলে গেলে সে বুঝতে পারে যে শুধু মাত্র সে-ই এর প্রতীক্ষায় ছিল না। নানা গলার আওয়াজ শোনা গেল। যে প্রহরীটা খাড়ি আগলে ছিল সে উঁচু গলায় ঘোষণা করল যে সে এখন ওপাশের বন্ধুদের সঙ্গে একটু গলা না ভিজিয়ে পারবে না।

মন বলছিল যেদিকে যাওয়া উচিত সে পথ এইভাবে পরিষ্কার হয়ে গেল। যতক্ষণ প্রহরীটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে না গেল, ততক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে চার হাত পায়ে উঠে পিছন ফিরে চাইল। উপর থেকে নীচ পর্যন্ত তাকিয়ে দেখে গুটিসুটি মেরে বসে রইল, যাতে কেউ দেখতে না পায়। তারপর এই অস্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে সে এগিয়ে চলল যেদিকে খাড়িটা সংকীর্ণ হয়ে গাছপালায় ঢাকা একটা সোজা পথে পরিণত হয়েছে।

এই অবস্থায় সে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল যে নিঃসঙ্গ গতিই সাফল্যের

একমাত্র উপায়। নিঃশব্দ ভাবে তাকে এমন করে চলতে হবে যাতে তার চলার আওয়াজ কেউ না শুনতে পায়,অথচ বাইরের সব আওয়াজ তার কানে ঢোকে। এ যে এত কঠিন ব্যাপার তার ধারণা ছিল না। জন্তু জানোয়ার চলবার সময় একটা ইন্দ্রিয়ে সম্পুর্ণ মনোনিবেশ করে কানপেতে দাঁড়ায় শুধু নিজের পায়ের শব্দই নয়, মনোযোগের ব্যত্যয় হয়, এমন সব শব্দ এড়াবার জন্যেও বটে। একটু পরে সে ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ রেখে খুব আস্তে নিঃশব্দে চলতে পারল, অবশ্য তার চলাটা মানুষের স্বাভাবিক ছন্দ বার বার ভঙ্গ করছিল।

চলার পথে মসৃণ মানবদেহের স্তূপের মধ্যে হঠাৎ তার হাত লাগল এমন একটা জিনিষে যে সে ভয় পেয়ে গেল। সেটা হল একটা এ্যাক্সল গাছ। গাছটা যেন তার নিঃসঙ্গতার একমাত্র সঙ্গী হয়ে দাঁড়াল। মনে মনে স্থির করতে পারল যে তার চলার পথে যে-ই বাধা দিতে আসুক, তাকে মরতে হবে। এটা অবশ্য তার দৃঢ় সিদ্ধান্তের প্রতীকমাত্র। সেই মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের মুখোমুখি হবার একমাত্র অর্থ হল এক পক্ষের মৃত্যু— মৃত্যুটা তারই। যে সৈনিক সঙ্গীন বাগিয়ে শত্রু শিবিরে হানা দিতে যায়, অথচ বোঝে না যে তার নিজের বাঁচার সম্ভাবনা নেই তারই মত মানসিক অবস্থা অনুভব করতে থাকে। হাতে সুধু একটা এ্যাক্সল গাছ—তাতেই সে পেল একটা আদিম দৈহিক আত্মবিশ্বাস, যার উৎস হল হাতে অস্ত্র ধরে থাকার আনন্দ।

প্রহরীটা যে জায়গা ছেড়ে আগে চলে গেছে সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র তার সন্দেহ হয় ফাঁদে পড়বে না তো। যদিও সে বোঝে যে এই সন্দেহের ভিত্তি নেই—নিজের মনেই এর মূল।

এর পরেই সে তার ধারণার নিশ্চয়তা সম্পর্কে হতাশ বোধ করে। দূরত্ব সম্বন্ধে সে যা ধারণা করেছিল, তা ভুল। বিপদের আসন্নতায়, হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্যে সব কিছুই মনে হচ্ছিল কত কাছের। যে খানে প্রহরীটা ছিল বলে তার ধারণা হয়েছিল, সেখানে কেউ নেই। আরো কয়েক পা দূরে দেখা গেল পায়ে মাড়ানো ঘাস, সিগারেটের টুকরা আর প্রহরীটা যে পথে উঠে গেছে সে পথের এলোমেলো হয়ে যাওয়া ঝোপঝাড়। আর

ভয় রইল না। মনটা এমন হালকা হয়ে গেল যে সরু খাতটা যেখানে গিয়ে খোলা মাঠে মিশেছে সেই পর্যন্ত সে কি ভাবে চলেছে তার কথা তার মনেই পড়ে না। সাধারণ চেনা পথে লোকে যে ভাবে দুবেলা যাতায়াত করে—সেই ভাবেই সে এপথটুকু এসেছিল।

ভিজে মাঠের মধ্যে দিয়ে এতজোরে ছুটতে থাকে যে মনে হয় সে যেন বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। পিঠে যেন বাতাস হাতবুলিয়ে দিচ্ছে। সামনে, চারপাশে ব্যাঙগুলো হঠাৎ চমক খেয়ে ডাক বন্ধ করে, সে আরো কয়েক গজ এগিয়ে গেলে আবার ডাকশুরু হয়; আর এই আওয়াজে তার পিছনে একটা নিরাপত্তার আবরণ সৃষ্টি হয়। তাড়িত জন্তুর মত সে ছুটে এসে পৌঁছল একটা পুকুরের পাড়ে—ঝোপঝাড়ের মধ্যে সেটা চোখের তারার মত জ্বল জ্বল করছিল। হাঁটুপেতে বসে ও জল খেতে সুরু করল, কখনো মনে হয় জ্ঞান হারিয়েছে, কখনো চেতনা ফিরে পাচ্ছে; দেহে শক্তির বদলে নেমে এল অপরিসীম ক্লান্তি। তৃষ্ণার শান্তির মত ইন্দ্রিয়গত সুখ আর কিছু নেই। কয়েক ঘণ্টা আগে সে জীবন সম্পর্কে সচেতন ছিল, কারণ তার মস্তিষ্ক ছিল সক্রিয়। এই প্রথম সে অনুভব করতে পারল যে জীবনের মত সম্পদ আর কিছু হতে পারে না। প্রাণ ভরে জল খাওয়ার পরও মনে হয় এখনো যেই কোষে কোষে তৃষ্ণা—সেখানে জল তখনো পৌঁছয় নি। জীবন বোধের এই নবস্ফূরণের আকস্মিকতায় হৃৎপিণ্ড চঞ্চল হয়ে উঠেছে; চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে ও দেখতে পেল যে দিগন্তের ওপারে কোথা থেকে দ্রুত উপরে উঠছে বিরাট চাঁদটা; নীচের প্রকৃতির উপর বিছিয়ে দিচ্ছে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার আস্তরণ।

জন্তুর মত ও এপাশ ও পাশ তাকিয়ে দেখে। যে পাহাড় থেকে সে পালিয়ে এসেছে, সেগুলো এখনো পিছনে ঘন অন্ধকারে খাড়া হয়ে তারা ছুঁয়ে রয়েছে। তার চার পাশে যেন এই ভাবে খাড়া হয়ে আছে কত পাহাড়। দুরের গ্রাম, বন, মাঠ—সবকিছুকে মনে হচ্ছে বর্ণহীন নেগেটিভ্ ছবির মত—বিষন্ন, শীতল। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দুর থেকে এক দমক জোলোবাতাসের সঙ্গে ব্যাঙের আওয়াজ ভেসে আসে—মনে হয় মুক্তির নিঃশ্বাস। ওই মুখেই সে চলবে,

ঠিক করল। ওদিকে গেলেই সোজাসুজি খাড়ি ছেড়ে দূরে যাওয়া যাবে।

সবচেয়ে গভীর অভিজ্ঞতার কথাই নতুন করে মনে পড়ে। সারারাত একটা ফসলের খেতে পড়ে থাকবার পর ভোর হল। তেতে ওঠা মাটিতে কেঁচোর যে অবস্থা হয়, ওরও সেই অবস্থা হয়। শরীরে, মনে সমান অস্বস্তি। রাত্রি তার নগ্নতাকে ঢেকে রেখেছিল, কিন্তু ভোরের আলো সাথে নিয়ে এল একটা নিষ্ঠুর সমস্যা কাপড় কোথায় পাওয়া যায়।

যে পোষাক পরে আছে সে বুঝতে পারবে না নগ্নতা কত বড় সমস্যা। মাত্র এই ভোরবেলাতেই যে সম্পদের অভাবে জীবন জীবনই নয়, তার অভাব সে বেদনার সঙ্গে অনুভব করতে পারে। যদি সে একটা ছেঁড়া কাপড়ও পেত-যা পরে সে নিজেকে লোকসমাজে বের করতে পারত যাতে লোকে মনে করতে পারত যে সে স্নান করতে বা রোদ পোয়াতে বেরিয়েছে কিম্বা সে একজন খনিমজুর, বা অন্য কিছু।

যে গ্রামে সে প্রথমে পৌছিল, সেখানে এক পাশে একটা বাড়ির দিকে এগিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে সে বসে পড়ল। মানুষের বসতির পাশে এই হল বিপদের সীমানা।

হাতের গাছটা বাগিয়ে ধরে সে উঠোনটা খুটিয়ে দেখল। কি না জানলেও সে মনে মনে একটা অমানুষিক কাজের জন্যে প্রস্তুত হয়। তার ভাগ্য ভাল যে বাড়িটায় কুকুর, নেই। কেবল খোঁয়াড়ে বসে একটা মোরগ ডেকেই চলেছে—সে যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বাস্তব অবস্থাকে, নিজের নগ্নতা সম্পর্কে ওকে সচেতন করে দিচ্ছে। এ এক চরম মুহূর্ত।

মনে মনে সে যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত। অথচ যার সঙ্গে প্রতিযোগিতা হতে পারে এমন একজনের বদলে খালি পায়ে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে। আঙিনাটা ছুটে পার হয়ে গেল বোধ হয় মোরগটাকে ছেড়ে দিতে। ডালপালা একটু সরিয়ে ফিস ফিস করে যতটা সম্ভব ততটা জোরে সে বলে উঠল, "খুকী, আমি বড় গরীব, পরবার মত একটা কিছু দিতে পারো?" বলবার সময় সে শক্তকরে চোখ বন্ধ করে থাকল, যেন কাউকে সে মারাত্মক আঘাত হানছে। কয়েক মুহূর্ত

পরে চোখ খুলে সে দেখতে পায় মেয়েটা সেখানে নেই। একটু পরেই তাকে আবার দেখা গেল—চোখের ইসারায় ঝোপটা দেখিয়ে দিচ্ছে একটা স্ত্রীলোককে। সে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। চাষী ঘরের মেয়ের মতই সে আর এদিকে তাকাল না। চলে গেল ঘরের দিকে। বোধ হয় ভিতরেই ঢুকে গেল।

এর পরে কল্পনা করে নিতে অসুবিধা নেই যে খানিক পরে সে যখন ঝোপটার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে একটা ছেঁড়া প্যাণ্ট আর জামা ছুঁড়ে দিয়ে গেল, তখন বেলা অনেকটা এগিয়ে গেছে।

খবর

মানুষের বুকে তোমাদের কথা যেন চিরদিন ধরে
জেগে থাকে অম্লান—
অনাগত ভবিষ্যতের স্মৃতির গভীরে
করাল, কঠিন, মৃত্যুবিজয়ীরূপে।
হাড় কাঁপানো পৌষের শীত,
খাদে ঠাসাঠাসি অসংখ্য শবদেহ ;
মাথার উপর নির্মম আকাশ
নীচে কাঁটাতারের বেড়া ;
আর কাকদের একটানা কর্কশ চীৎকার
সহরের বাইরে বিশাল প্রান্তর ;
শোঁ শোঁ শব্দে বইছে প্রচণ্ড তুষারঝড়
খাদের উপর দিয়ে ;
আজও আমি স্পষ্ট দেখছি—
নতজানু, সারবন্দী অজস্র মানুষ
শতছিন্ন তাদের জামা,
পিঠ তাদের গেছে বেঁকে,
নিজের হাতেই ওরা খুঁড়ে চলেছে
নিজেদেরই কবর।
ওদের শেষ নিঃশ্বাস
যখন সবে পড়েছে,
যখন জল্লাদদের হাত
ওদের ঢেকে দিল মাটির কবরে—
তুষার কণা এসে মিশে গেল সে মাটিতে
মুছে দিল সমস্ত চিহ্ন।

আজ,
আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে

কাঁটাতারের নিষ্ঠুর বেড়াগুলো ;
বরফে চাপা পড়েছে
মৃত্যুর বীভৎস নগ্নতা।
শহীদ নগরী—
বিদায়, চির বিদায়।
কিন্তু না,
ঐ তো আবার সগর্বে
আকাশে উঠছে তোমার উন্নতশির
আবার আজ দেখলাম
মৃত্যুজয়ী তোমাকে।
শুনে রাখ তবু,
তোমাকে ভুলিনি আমি
হে আমার বিষণ্ণ সহর।
ভুলতে পারি না
তোমার চুনকাম করা বাড়ীগুলো
আর কচি কচি
অনাথ অজস্র কিশোরের মুখ।
সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে
কর্কশ স্বরে ওরা হুকুম দিল,
আর করাল রাত্রি নামল
এক মহানগরীর জীবনে—
জেগে রইল বরফের স্তূপ
অনন্ত নিস্তব্ধতা আর
মাঝে মাঝে কাকদের কর্কশ চীৎকার

গর্জন করে ছুটে চলে ট্রেন
কেঁপে ওঠে বন্ধ শার্সি যত,
ঘাসে জমাট বেঁধে থাকে
দানা দানা বরফের কুচি।
একশত মাইল ধরে পড়ে আছে
নির্জন সীমাহীন প্রান্তর।
গভীর রাত্রে ভেসে আসে
হত্যার সেই বর্বর কাহিনী,

প্রত্যেক ঘরেতে নামে
তুষার কঠিন নীরবতা।
কিছুতেই, কোনমতেই
ভাঙ্গা যায় না তাকে—
চারিদিকে শুধু অন্ধকার,
করাল, ভয়ঙ্কর;
আর মৃত্যুর চেয়ে ভয়ানক
সেই নিস্তব্ধতা—
আমি ভুলবনা।

মিয়েজিস্লাভ ইয়াস্ত্রুণ

শিশুদের হত্যালীলা

বাচ্চারা কেঁদে উঠল :
"মাগো
সত্যি বলছি,
আমি বরাবরই তোমার ভাল ছেলে··
উঃ কী অন্ধকার
কী ভীষণ কালো অন্ধকার।"

তাকিয়ে দেখ,
খাদের অতলে নামছে ওরা,
ওদের কচি ছোট্ট পা গুলো
গহ্বরে পৌঁছেছে।
দেখতে পাচ্ছ ?
এখানে, ওখানে, সেখানে
নরম, কচি পায়ের কত ছাপ !

ওদের পকেটে ভরা ছিল
একতাল সুতো
কয়েকটা নুড়ি
আর খেলনার ছোট ঘোড়া।

বিরাট প্রান্তর ছেয়ে গেছে,
যেন জ্যামিতির একটা ছবি—
আর সোজা
খাড়া উঠে গেছে
তালগাছের মত
কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী
এগাছের প্রাণ নেই
সাথী নেই
রাতের একটিও তারা।

তাদিয়ুশ্ রোজেভিচ্

শোকযাত্রা

অতুগৃহের চুল্লীটা যেন শবাধার
হাল্কা বাতাস তার ঢাকনী ;
জীবন্ত যাকে পোড়ান হ'ল
তারই ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে
ইতিহাসের চিমনী দিয়ে।

স্বর্গ আর পৃথিবীর মাঝখানে
তুমি ভেসে চলেছ—
ঘরছাড়া, দেশছাড়া
একমুঠো জ্বলন্ত ছাই।
কেমন করে যোগদেব তোমার শোকযাত্রায় ?
কেমন করে জানাব তোমাকে শেষ সম্মান।
ইথার প্রবাহে স্পন্দিত যে সমাধি
যার উপর বারবার
আঘাত করছে হানাদারের দল
পৃথিবীর চারিকোণ থেকে
কেমন করে সেখানে রাখব আমি
চিরসবুজ স্মৃতির মালাটিকে ?

যেমন গড়িয়ে নামে সৈনিকের শবাধার
কামানের গা বেয়ে,
তোমার বেলা তা তো হ'বে না।
চিহ্ন কই শবাধারের ?
শুধু বাতাসের একটা স্তম্ভ
জেগে থাকবে মৃত্যুহীন,
এসে পড়বে এক ঝলক সূর্যের আলো—
তোমার মৃত্যুর অনন্ত সাক্ষী।

এখানে ক্রমে বিদ্ধ হ'লো যে মানুষেরা
তাদের আর্ত চীৎকার,

আর জীবন্ত পোড়া দেহের
দম আটকে আসা ধোঁয়া—
সব কিছুই বুকে নিয়ে,
পায়ে মাড়ান একটা ছেঁড়া পতাকার মত
অনির্বান জেগে আছে
বিশাল, নিস্তব্ধ প্রান্তর।

মিয়েচিস্লাভ, ইয়াস্তুন

পোলিশ্ ইহুদীদের প্রতি—

পোল্যাণ্ডের সহর-বন্দর থেকে
ধ্বনিত হয়নি কোন হতাশার সুর ;
ওয়ারশর ইহুদী পল্লীর রক্ষাকারী বীরেরা
প্রাণের মূল্যে জয় করল মৃত্যুকে।

ওগো পোলিশ ইহুদীরা
আমি লিখে যাই তোমাদের গাথা
আমি পোল্যাণ্ডের এক চারণ।
বুকে আমার চোখের জলের সমুদ্র
কলমে ঝরে রক্ত আর আগুণ—

মানুষ নয়, ওরা রক্তপায়ী জানোয়ার ;
সৈন্য নয়, ওরা জহ্লাদ।
ওরা এসেছে
তোমাদের প্রাণ নিতে
খুন করতে তোমার স্ত্রী
আর দুধের বাছাদের।
বিষবাষ্পে ভরা বন্দীশালায়
শ্বাসরুদ্ধ করে মেরেছে লাখো মানুষকে ;
জীবন্তে পুড়িয়ে ছাই করেছে তোমাদের—
বিদ্রূপ করেছে
অসহায় মৃত্যু-যাতনাকে।

পৃথিবীর বুক থেকে
তোমাদের পল্লীকে মুছে দিতে
তোমাদের ঘরবাড়ীর দিকে
কামান দেগেছে ওদের গোলন্দাজ।
আর তোমরা—
তোমরা

রাস্তা থেকে পাথর কুড়িয়ে
ছুঁড়ে মেরেছ কশাইদের কামানের মুখে।
ব্যাকাবীদের সন্তান তোমরা—
পূর্বপুরুষদের মত
তোমরাও জান
মরণের মুখোমুখি দাঁড়াতে।

শরৎকালে সুরু হ'ল লড়াই,
নির্ভয়ে তোমরাও ঝাঁপিয়ে পড়লে তাতে ?'
যদিও জানতে
এযুদ্ধে নেই বিজয়ের পালা।
পাথরে খোদাই করে রেখ
ইতিহাসের এই কাহিনী।
খোদাই হয়ে থাক
দেশবাসীর মর্মের গভীরে।

যে বাড়ী ওরা গুঁড়িয়ে দিল
তা আমাদের সবার ;
সবাই মিলে যে রক্ত ঢেলেছি
তাতেই রচিত হ'ল
ভ্রাতৃত্বের, অচ্ছেদ্য বাঁধন।
অস্‌ভিয়েচিম্ আর ডাখাউএ
বন্দীশালার প্রতিটি জানালায়,
ফাঁসীকাঠের ছায়ায় দাঁড়িয়ে,
নামহীন প্রতিটি সমাধিক্ষেত্রে
দুর্জয় হয়েছে আমাদের একতা।

যুদ্ধের আগুণে ছারখার
ওয়ারশর আকাশ,
আমাদের সবারই মাথার উপর
আজকের রক্তঝরা
আর মর্মভেদী সংগ্রাম
যেদিন অবসান হ'বে

সেদিন
বিজয়ীর মুকুট পরে ঝলমল করবে
তারা ভরা ওয়ারশ'র আকাশ।
মুক্তি পাবে প্রতিটি জীবন
ঘরে ঘরে আসবে মানুষের অধিকার
আর ফসলের প্রাচুর্য—
পৃথিবীতে জেগে উঠবে
একটি মাত্র মহাজাতি
সবল, প্রাণোজ্জ্বল
মহান মানুষ।

ভ্লাদিস্লাভ্ ব্রোনিভ্স্কি

"প্রেম আর চারণ নীতি"

"শোন শোন সুন্দরী তরুণী
শুনতে যে সে কোন কথাই চাইছেনা·
দেখ, দেখ, ঝলমল ঐ করে সুর্যের আলো
চেয়ে দেখ, কেমন ছোট্ট সহর······
কোথায় সেই ছোট্ট সহর ?
চিহ্ন নেই কোন মানুষের।

শুধু ভাঙ্গা ইঁটের স্তূপ ;
আর পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে
নগ্ন তার দেহ
মাথাভর্তি ঘনলাল চুল,
তেরবছরের বাচ্চা মেয়ে রীফ্‌কা।

পাশ দিয়ে ঘড় ঘড় করে চলেছে
দানবের মত জার্মান সাঁজোয়া গাড়ী
তাতে বসে আছে হোঁৎকাগুলো
(হুঁশিয়ার রীফকা। লুকোও
পালাও তোমার প্রাণ নিয়ে।)
"মামনি যে ইঁটের তলায়
বাবা মাইদানেক বন্দীশালায়।"
তার পর,
হা হা করে অট্ট হেসে
হাওয়ায় যেন মিলিয়ে গেল
মেয়েটা।

মনটা তার নরম,
এক মিনিট থামল
লুবারতোভের সেই লোকটি :
"রীফকা,

এই রুটিটা নে
খেলে একটু ভাল লাগবে তোর।"
এক কামড় খেল,
মিষ্টি করে হাসল তার দিকে—
"বাকীটা নিয়ে যাই কেমন ?
বাবা আর মা-মনিকে দেব।"
পথে যাচ্ছিল এক চাষীর ছেলে
ওকে ছুঁড়ে দিল একটা টাকা ;
এক থুড় থুড়ে বুড়ী,
ওকে উজাড় করে দিল
তার জীবনের সঞ্চয় !
যত লোক সে পথ দিয়ে গেল
তাদের সবার মনে একই কথা :
মেয়েটা দাঁড়িয়ে কেন নগ্ন দেহে ?
কোনই বা ওর মাথায়
অত ঝাঁকড়া রাঙা চুল ?
অবশেষে

যীশু এলেন
স্বর্গীয় দুঃখ আর বেদনা নিয়ে।
এই তাঁর শেষ যাত্রা ;
পিছনে বন্দুক হাতে
জার্মান ঝটিকা বাহিনী।
ওদের দুজনকেই নিয়ে গেল
জঙ্গলের শেষ সীমান্তে
দাঁড় করাল পাশাপাশি—
তারপর টোটা ভরল রাইফেলে !

"শোন্ তুই ইহুদী বদমাশ
যীশু আররীফকা—
এই বনের কোনে ভাল করে শোন !
তোর মাথায় যে কাঁটার মুকুট
আর তোর ঝাঁকড়া রাঙা চল

আর তোদের দুজনেরই নগ্ন সারা দেহ—
তাই তোরা মরবি এখন গুলিতে,
মরবি চিরদিনের মত।
জঙ্গলেতেই থাকবে তোদের গোর।
জেনে রাখিস
আমরা শয়তানেরই চর।"
খালিলি থেকে ভেসে এল
খাদেলুইয়া
মহাসঙ্গীত ধ্বনি ;
সোজা হয়ে দাঁড়াল ওরা,
ছুটি মৃত্যুহীন দেবদূত,
ঝরে পড়ছে স্বর্গীয় মাধুরী।
তারপর
গর্জন করে উঠল অগ্নিবর্ষী রাইফেল।
"শোন শোন সুন্দরী তরুণী
শুনতে যে সে কোন কথাই চাইছেনা।"

ভ্লাদিস্লাভ্ ব্রোনিভ্স্কি

ট্রেনে মা বাবাকে গ্রেপ্তার করে জার্মানীতে যখন চালান করল তখন চাষীটির দয়ার উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন উপায় রইল না। গাদাখানেক টাকা দিয়ে ওদের কাছে ছ'টি চিম্‌সে আলু আর রোজ সাত আউন্স রুটি পেতাম্। চাষী, চাষী বৌ আর তাদের মেয়ে জান্‌ত আমরা ইহুদী ; ওদের জামাইকে জানতে দেওয়া হয়নি। কারণ সে ছিল ফ্যাসিষ্টপন্থী পোলিশ্ ন্যাশানাল ডেমোক্রাটিক্ পার্টির সভ্য। সে জানলে নিস্তার ছিলনা। কুঠুরীর মধ্যে তিনটে গর্ত ; তাতে খুব রোদের দিনেও অন্ধকার হ'ত। বাইরে আকাশ মেঘ্‌লা হ'লে ভেতরে সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যেত। দিনরাত আমরা পড়ে থাকতাম সেখানে। বসন্তে বরফ গল্‌লে জল এসে ভেতরটা ভাসিয়ে দিত, সব ভিজে যেত ; শীতকালে আমরা জমে যেতাম। আমাদের লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল বলে চাষীবৌ দিবারাত্র খিটিরমিটির করত। নিজদের জন্য কিছুই না রেখে যথাসর্বস্ব আমরা দিয়ে দিলাম। কেউ যদি খুনের ভয় দেখিয়ে দুটো *গ্রোসি চাইত তা-ও আমরা দিতে পারতাম্ না—কেন না আর তা-ও ছিলনা।

এত অনশন চলছিল যে পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারতাম না, শেষের দিকে চাষীবৌ জলও এনে দিত না। একদিন রাতে ভাইটি বেরিয়ে গিয়ে ডোবার জল খেয়ে মারা গেল। রাতে তাকে বনে কবর দিলাম আমরা।

কাকা একদিন কুঠুরী ছেড়ে গেলেন, আর ফিরলেন না। এভাবে ১৮মাস লুকিয়ে ছিলাম। তারপর লালফৌজ এসে গেল। তখন আমাদের হাঁটা শিখতে হ'ত। কেননা পাগুলো তখন অসাড়প্রায়। আজকলা রোজা বড় মনখারাপ করে। প্রায়ই কাঁদে, বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতেও চায় না.......................।

—ক্রিস্তিনা গোল্ড

(১৪ বছর)

* দুই নয়া পয়সার মত ছোট ভাঙানি।

আজ কয়েকদিন ধরে দুপুরবেলাটা আমাদের বেশ আনন্দেই কেটে যাচ্ছে। জার্ম্মানদের জন্যে রিজার্ভ করা ব্যারাক থেকে একদল লোক মার্চ্চ করে বেরিয়ে আসছে আর গান গাইছে 'কাল যাব বাড়ী'। এরা ক্যাম্পের চারিদিকে ঘুরতে লাগল আর তাদের প্রধান অফিসার হাতের বেতটা দিয়ে তাল ঠুকতে লাগল। এই লোকগুলো কেউ আসামী, কেউবা স্বেচ্ছাসেবক, এরা সৈন্যদলে কাজের জন্য এসেছে। যাদের জামার হাতায় সবুজ ত্রিভুজ আঁকা তাদের আলাদা করে রাখা হয়েছে এবং যারা ছোটখাট অপরাধে অপরাধী তাদের ফ্রন্টে পাঠান হবে। যে লোকটি তার স্ত্রী ও শাশুড়িকে খুন করেছিল; কিন্তু ক্যানারি পাখির কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তাকে খাঁচা থেকে মুক্ত করেদিয়েছিল সেই লোকটিই সবচেয়ে সৌভাগ্যবান। কিন্তু সম্প্রতি সবাই এক সঙ্গেই আছে।

তারা মার্চ্চ করা অভ্যাস করছে কেননা তাদের নাগরিক গৌরব দেখাতেই হবে। এই কাজ তারা ইতিমধ্যে অনেক রকম ভাবেই করে দেখিয়েছে। এরা খুব অল্প দিনই এক সঙ্গে আছে কিন্তু এর মধ্যেই দোকানের ভিতর ঢুকে পার্শেল চুরি করেছে ক্যান্টিনকে ভেঙে ফেলেছে এবং বেশ্যালয়ের ভিতরটা একদম নষ্ট করে দিয়েছে (এই জায়গাটি আবার বন্ধ হওয়ায় অনেকেরই মনস্তাপের কারণ ঘটেছিল)। ওরা জিজ্ঞেস করত আমরা ত এখানে বেশ আরামেই আছি, শুধু শুধু গার্ড্দের সামনে গলা বাড়িয়ে দেবো কেন? আমাদের পিতৃভূমি ত ভালই চল্ছে এবং আমাদের সাহায্য ছাড়াও ভালই চলে যাবে কিন্তু ফ্রন্টে আমাদের জুতো পরিষ্কার করবেই বা কে, সেখানে কি কোন অল্পবয়সী ছেলে আছে।

সুতরাং সব এক হয়ে মার্চ্চ করতে লাগল আর গান গাইতে লাগল "কাল যাব বাড়ী।" সবাই ডাক সাইটে খুনী। একজন আর একজন অপেক্ষা বেশী বৈ কম নয়। জেপেল ছিল সকলের কাছে আতঙ্ক স্বরূপ, লোকটা ভারি নির্দয়। সকলকে জলে, বৃষ্টিতে, বরফে জোর করে কাজ করাত এবং একটা সামান্য ত্রুটি হলেই ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিত। আট নম্বর 'আরনব্যম' বহুদিন ক্যাম্পের পাণ্ডা ছিল এবং পরে' ক্যাপো, এবং সিনিয়রক্যাপো' হয়েছিল। সে চা বিক্রী করলে আর্দালীদের খুন করত এবং এক মিনিট দেরী করে এলে বা সন্ধ্যায় ঘণ্টার পর একটাও কথা বললে ২৫ ঘা বেত লাগাত। এই লোকই আবার ফ্রাঙ্কফুটে তার বুড়ো বাবা মার কাছে সুন্দর মর্মস্পর্শী চিঠি লিখত। চিঠিতে কতদিন বাবা মাকে দেখেনি এবং কত শীঘ্র তাদের কছে ফিরবে তাই লেখা থাকত। যে লোকটি ভভ'তে সবাইকে মারত, যে লোকটি 'বুনা' তে সবাইয়ের আতঙ্ক স্বরূপ ছিল, যে নরম সরম লোকটি অসুখের সময় ব্যারাক সিনিয়ারের তামাক লুঠ করে মার খেয়ে নীল হয়ে গেছল এবং পরে তাকে ক্যাম্প থেকে বের করে দিয়েছিল। তার যাবার পর যারা এলো তাদের সবাইকে আমরা চিনি। মার্চের সময় লোকেদের সারির ভেতর কত নপুংসক, কত মাতাল কত নেশাখোর এবং কত নৃশংস লোককে দেখা যেত। সবার পেছনে চমৎকার সাজগোজ করে কুর্ট আসত। সে এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে তাল হারিয়ে ফেলছিল এবং গানও গাইতে পারছিল না। ওকে দেখে আমার মনে হ'ল এই লোকটাই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল এবং আমাদের চিঠি পত্র নিয়ে গিছল্। আমি সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে তার কাধ ধরে বললুম "কুর্ট, তোমার নিশ্চয়ই ক্ষিধে পেয়েছে আমার সঙ্গে উপরে চলো, এই বলে তাকে আমার ঘরের জানলাটা দেখালুম। সন্ধ্যার দিকে সে আমাদের কাছে এলো ঠিক যে সময় আমরা মাজলিকা টালির ষ্টোভে খাবার তৈরী করছিলুম। কুর্ট বড় ভাল ছেলে। এটা শোনায় একটু অদ্ভুত বটে কিন্তু এর চেয়ে ভাল বর্ণনা দেওয়া কষ্টকর হবে। সে কথা বলতেও পারে ভাল। সে চেয়েছিল গায়ক হতে। কিন্তু তার দোকানদার বাবা

তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বাধ্য হয়ে কুর্ট বার্লিনে যায়। সেখানে একটি দোকানদারের মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। মেয়েটির সঙ্গে সে থাকত, খেলাধুলার কাগজে প্রবন্ধ লিখত। একবার 'ষ্টাল হেলবো' র সঙ্গে ঝগড়া করেছিল বলে এক মাস জেল ভোগ করে এবং এর পর থেকে মেয়েটির সঙ্গে আর কোনদিনও দেখা করতে সাহস করেনি। সে একটা স্পোর্টস গাড়ী কিনেছিলো এবং সোণা ও নোটের চোরা কারবার করত। কোন একদিন বেড়াতে বেরিয়ে সে মেয়েটিকে দেখেছিল কিন্তু ভাল বুঝে দূরে সরেই ছিল। এর পরে সে অষ্ট্রীয়া আর যুগোশ্লাভিয়াতে যাওয়া আসা আরম্ভ করল। শেষে ধরা পড়ে জেল হয়। কিন্তু এইটি তার দ্বিতীয় অপরাধ বলে তাকে ক্যাম্পে পাঠান হয়। যুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে তার দণ্ড কাল শেষ হওয়া পর্যন্ত।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। ক্যাম্পে নামডাকা শেষ হয়ে গেছে। টেবিলের চারিধারে বসে আমরা অনেক গল্প করছি। আমরা সব জায়গায় এইরকম গল্প করতাম, কাজে যাবার সময়, ক্যাম্পে ফেরার সময়, লরী বোঝাই করার সময়, মাটী খোড়ার সময় এমন কি সন্ধেবেলা নিজেদের শোবার জায়গায় যখন নাম ডাকার জন্যে দাঁড়াতে হতো তখনও। কাঁটাতারের ওধারকার যত গল্প হতো। আজকের গল্প ক্যাম্প নিয়ে, বোধ হয় কুর্ট শীগগির খালাস পাবে তাই।

ষ্টাশেক একজন সুষ্ঠ সংগঠক ছিল, সে বললে "দু বছর আগে যদি আসতে শরতের বাতাস তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে চিমনির বাইরে ফেলে দিতো।" আমি খালি একটু কাঁধ ঝাঁকালাম।

"না ও তো হতো। তোমাকে যখন উড়িয়ে নিয়ে যায়নি, আমাকে কেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে? তুমি জানো "পাভিয়াকে" একজন ছিল সে আউশভিৎজ থেকে এসেছিল।"

"তাকে সেখানে আনা হয়েছিল নিশ্চয় বিচারের জন্য।"

"ঠিক বলেছো। আমরা তাকে অনেক প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু তার মুখ একেবারে বন্ধ। সে খালি বলতো তোমরা যখন সেখানে যাবে দেখতে পাবে সব, এখন কথা বলে কি লাভ। তোমরা সব বড় ছেলেমানুষ।"

"তুমি কি ক্যাম্পকে ভয় করতে ?"

"হ্যাঁ করতুম। সকাল বেলায় পাভিয়াক ছেড়ে ওরা আমাদের গাড়ী করে ষ্টেশনে নিয়ে গেলো। পিছন দিকে সূর্য্য ছিল, এটা খুবই অশুভ লক্ষণ। এর মানে ওরা আমাদের পশ্চিমদিকে আউশৎভিজে নিয়ে যাবে কি ক্ষিপ্রগতিতে ওরা আমাদের মালগাড়ীর ভেতর পুরে দিলো। আমাদের বর্ণানুক্রমিক ভাবে গাড়ীতে তুলে দিলে, এক একটা গাড়ীতে ৩০ জন করে, কোনো ঠেসাঠেসি নেই।"

"তোমরা কি সঙ্গে কম্বল নিয়েছিলে ?

"নিশ্চয়ই নিয়েছিলুম। আমার প্রণয়িণীর কাছ থেকে একটা কম্বল ১ জোড়া বিছানার চাদর, একটা স্নানের জামা নিয়েছিলাম।

"কি লোভী ছেলে, জিনিষগুলো বন্ধুদের জন্যে রেখে দিতে পারলেনা। তুমি কি জানতে না হে ওগুলো তোমার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে ?

"সত্যি ও গুলো ছাড়তে যে কি কষ্ট হয়েছিল। মালগাড়ীর একটা দিকের সমস্ত পেরেকগুলো খুলে নিয়ে লোহার পাতটা সরিয়ে আমরা পালিয়ে গেলাম। গাড়ীর মাথায় একটা মেসিন্‌গান্‌ দিল। সেটা থেকে গুলী ছুঁড়ে আমাদের প্রথম তিনজনকে মেরে ফেলে দিল। শেষ জনের যেই মাথা বেরিয়েছে অমনি একটা গুলী তার ঘাড়ে লেগে গেলো। তক্ষুনি ট্রেণ থামিয়ে ফেললো, আমরা এক কোনে লুকিয়ে রইলাম। ও! তারপর কি, শব্দ কি গণ্ডগোল, কি নরক গুলজার হল।" যত সব ভীরুর দিল ওদের মোটে পালানো উচিত হয়নি। আমরা হলে একসঙ্গে সব কটাই মরতুম। তারপর সে কি গালাগালি, মেয়েদের গালাগালির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।"

"না কম তো নয়, বরং খুব রসালো। ঘাড়ের ওপর একগাদা লোক পড়ে আমার তো প্রায় পিষে যাবার অবস্থা। ভালই হয়েছে, মনে হোলো; ওরা যখন গুলি করবে তখন আমি প্রথমে মরবো না। তাই ঠিক হলো; ওরা গুলী চালাতে লাগলো। ভিড়ের মধ্যে গুলী করতে দুজন মরে গেলো একজনের পাশে গুলী লাগলো। তারপর আমাদের মাল পত্র নিয়ে নেবে

যেতে বললো। আমি তো ভাবলাম যে এবারে সব শেষ, এতে আর কোনো ভুল নেই। আমার প্রণয়িনী যে স্নানের জামা দিয়েছিলো তার ভেতর আমার বাইবেলটা ছিল, সেটা ছেড়ে আসতে বড় কষ্ট হয়েছিল।"

"কম্বলটাও তো সে দিয়েছিল বললে?"

হ্যাঁ, সেটাও ছেড়ে আসতে কষ্ট হচ্ছিল বই কি? কিন্তু কি করবো, আমি কিছু নিইনি। ওরা আমাকে ধাক্কা মেরে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিলে।''

তুমি বোধ হয় জানো না যে বন্ধমালগাড়ির ভেতর থেকে বাইরে এলে পৃথিবীটা কত বড় লাগে। কত উঁচু আর কত নীল আকাশ, গাছগুলোর কি মিষ্টি গন্ধ। সবুজ বনগুলো দেখলে যেন জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। চারিদিকে গার্ডরা মেসিনগান নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। আমাদের চারজনকে একটা আলাদা গাড়ী করে নিয়ে গেলো। আমরা ১২০ জন ছিলুম। তিনজনে মারা গেলো আর একজন আহত হয়েছিল। আমরা ঐ গাড়ীর ভেতর প্রায় দমবন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিলাম। গাড়ীর ভেতরটায় এত গুমোট যে ছাদ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিলো।, গাড়ীতে একটাও দরজা ছিল না, এমন কি একটা ছোট ছিদ্র পর্য্যন্ত না। একটু হাওয়া আর একটু জলের জন্যে আমরা চীৎকার করতে লাগলুম, কিন্তু ওরা গুলী চালাতেই চুপ করতে হলো। ক্লান্ত হয়ে আমরা গাড়ীর মেঝেতে পড়ে রইলাম ঠিক যেন কাটা শুয়োরের মতন। আমার সমস্ত গা ঘামে জবজব করছিল, আমি সোয়েটার আর সার্ট দুটো খুলে ফেললাম। আস্তে আস্তে নাক দিয়ে আমার রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো। কানের ভেতর যেন হাতুড়ী পিটতে লাগলো। আউশভিৎসের খোলা হাওয়ার জন্যে আমার মন কেমন করতে লাগলো। প্ল্যাটফর্মে গাড়ী পৌঁছতেই গাড়ীর দরজা খুললো, ঠাণ্ডা বাতাসে আমি যেন পুনর্জীবিত হলাম। এপ্রিল মাসের ঠাণ্ডা তারায় ভরা রাত্রি। যদিও আমার গায়ে ভিজে সার্ট ছিল তবুও আমার শীত করছিল না। পেছন থেকে কে একজন আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল।

লোকটা চুপি চুপি বললে "ভাই, বাঁচা গেছে।"

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ক্যাম্পের ওপরের লাল আলোটা ঠিক যেন আগুনের শিখা। আলো আঁধারে মিশে মনে হচ্ছিল যেন একটা আকাশচুম্বী পাহাড়ের ওপর আগুন জ্বলছে।

সমস্ত লোকদের মধ্যে একটা গুঞ্জণ শোনা গেল "দাহস্থান, দাহস্থান।"

ভিটেক হঠাৎ বলে উঠলো "তুমি দেখছি একজন কবি, বেশ বানিয়ে গল্প বলছো তো।"

"আমরা মৃতদেহগুলো নিয়ে ক্যাম্পের দিকে চললুম। আমার পেছনে যেন দ্রুত নিশ্বাসের শব্দ পেলুম, মনে হলো যেন আমার প্রিয়া আমার খুব নিকটেই। মাঝে মাঝে একটা ধপ ধপ আওয়াজ হচ্ছিলো। গেটের ঠিক বাইরে ওরা আমার উরুতে একটা বন্দুকের খোঁচা মারলো। আমার কিছু লাগেনি, কিন্তু আমি যেন কেমন গরম বোধ করতে লাগলুম। আমার উরু দিয়ে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো গোড়ালিতে। কয়েক পা যাবার পর আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেলো, আমি টলতে লাগলুম। আমাদের সঙ্গে যে গার্ডগুলো যাচ্ছিলো তারা আমার সামনের কয়েকজনকে মারলে। আমরা গেটটা পার হয়ে,ক্যাম্পে ঢুকতেই গার্ডগুলো বললে "নাও এবার এখানে খুব ভাল বিশ্রাম হবে। সেদিনটা বৃহস্পতিবারের রাত ছিলো। তার পরের সোমবার আমি একদল শ্রমিক লোকের সঙ্গে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে গেলুম, সেখানে আমায় টেলিগ্রাফের পোল বইতে হয়েছিল। আমার পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল তবুও আমি ভালই বিশ্রাম করেছি।"

ভিটেক বললে "ও কিছু না, ইহুদীদের ওর চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, সুতরাং তোমার নালিশ করার কিছু থাকতে পারে না"

আমাদের যাত্রা ও ইহুদীদের সম্বন্ধে নানারকম মন্তব্য হতে লাগলো। টাশেক বললে "ইহুদীদের তো জানো, ওরা ঠিক ক্যাম্প থেকেই ব্যবসা সুরু করে দেবে, জেনে নিও। দাহস্থানেই বলো বা অবরুদ্ধ এলাকাতেই বলো একটা ইহুদী এক বাটী শালগমের সুরুয়ার জন্যে মাকেও বেচে দিতে পারে। একদিন সকালে আমরা কাজে যাবার জন্যে লাইন করছিলুম। আমাদের পাশেই ছিল স্পেশাল ব্রিগেড, ওদের ছেলেগুলো ঠিক ষাঁড়ের মতন শক্তিমান

আর জীবনকে উপভোগ করতে পারে। এ আর আশ্চর্য্য কি বলো। আমার পাশে আমার বন্ধু মইশে ছিল, তাকে তুমি বোধহয় জানো ?

আমার মতন সেও মালভা থেকে এসেছিল। তুমি তো জানো বন্ধু এরা ব্যবসাদার এদের মধ্যে কি রকম বোঝাবুঝি আর বিশ্বাস। "কি হলো মইশে, এত চুপচাপ, তোমার সব ফন্দীফিকির কোথায় গেল ?"

"আমি আমার পরিবারবর্গের ছবি পেয়েছি।"

"বা! তাহলে তো মজা, তবে আবার ভাবনাটা কি ?"

"গোল্লায় যাও তুমি, মজা মানে কি। জানো আমিই আমার বাবাকে মৃত্যুর দ্বারে পাঠিয়েছি।"

"না, না, তুমি তা করতে পারোনা।"

"হ্যাঁ, আমি পারি আর আমি করেওছি। একদল বন্দীর সঙ্গে বাবা এসেছিলেন, আমাকে গ্যাস চেম্বারের সামনে দেখে জড়িয়ে ধরে, চুমু খেয়ে আমাকে জিগ্যেস করলেন যে কি হবে এবার। আরও বল্লেন যে তাঁর খিধে পেয়েছে কেননা দুদিন ধরে রাস্তায় কিছু খান নি। ঠিক সেই সময়ে ব্রিগেড অধিনায়ক চেঁচিয়ে বললে যে কাজ আছে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না বাধ্য হয়ে বাবাকে বললুম "বাবা এখন স্নান করো, পরে কথা বলবো। দেখছো তো এখন আমার একটুও সময় নেই।" বাবা আমার গ্যাস চেম্বারে চলে গেলেন। এই ছবিগুলো আমি তার পকেট থেকে নিয়েছিলুম। বলতে পারো এ ছবিগুলো আমার কি কাজে লাগবে ?"

আমরা জোর করে হাসতে লাগলুম। জার্ম্মানরা তখন আর্য্যদের হত্যা করছিলেন।—

রুগীদের যে লোকটা দেখাশোনা করতো সে রোজই আমাদের সঙ্গে গল্পে যোগ দিতো। সে বললে "না না ওরা আর্য্যদেরও হত্যা করতেন। আমি এই ব্যারাকে বহুদিন কাজ করছি, অনেক কিছুই আমার মনে আছে। আমার কত বন্ধু কত পরিচিত লোক আমারই হাতে থেকে গ্যাস চেম্বারে গেছে। কিন্তু এখন তাদের মুখ শুদ্ধ মনে করতে পারিনা। খালি একটা বিরাট জনস্রোত মনে পড়ে। তখন আমার কাজ ছিল রোগীদের দেখাশোনা করা ভাল করে রোগীদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতেও পারতুম না, তাদের

নিয়ে বাড়াবাড়ি করার সময় ছিল না। কারোর পেছনে, কারোর হাতের ক্ষত তাড়াতাড়ি করে ধুয়ে একটু কাঠের টুকরো দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেই তারা চলে যেতো। তাদের মুখের দিকে তাকাবার ফুরসৎ ছিলনা। কেউ কখনও এ কাজের জন্ম আমায় ধন্যবাদ দেয়নি কেননা ধন্যবাদ দেবার মতন কিছু ছিল না। অনেক সময় হয়ত কারোর ঘায়ে পায়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছি সে হয়তো ধন্যবাদ দিয়েছে। সেই লোকটী এত ফ্যাকাসে এবং দুর্ব্বল ছিল যে তার ফোলা পায়ে মোটে দাঁড়াতে পারছিল না। আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলুম, একটু সুরাও নিয়ে গিয়েছিলুম। তার বাঁদিকের পাছায় একটা ফোড়া সেটা পরে সমস্ত উরুতে ছড়িয়ে পড়েছিল, একেবারে শেষ হয়ে গেছলো। ছেলেটা ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করেছিল, অনবরত চীৎকার করতো আর তার মায়ের কথা বলতো। আমি তাকে বলতুম "চুপ করো আমাদের মা আছে তবে আমরা তোমার মত কাঁদিনি। ছেলেটীকে যতদূর সাধ্য সান্ত্বনা দিতুম, কেননা সে বলতো সে আর তার মায়ের কাছে ফিরে আসবেনা। তাকে দেবার মতো আমার কি বা ছিল? এক বাটী সুপ বা কখনও এক টুকরো রুটী এ ছাড়া আর কি দেবো? আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলুম টোলিয়াকে লুকিয়ে রাখতে যাতে তাকে গ্যাস চেম্বারে না নিয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ওরা ওকে ধরে ফেললো। কথাটা শুনেই আমি তার কাছে ছুটে গেলাম। তার তখন গায়ে জ্বর। আমাকে দেখে বললে "আমাকে যে মরতে হবে তাতে দুঃখ নেই। হয়তো এই আমার কপালে ছিল। কিন্তু যুদ্ধ যদি শেষ হয়ে যায় তুমি বেঁচে থাকবে আশা করি। "আমি বললুম "টোলিয়া, ঠিক থানিনা আমি বেঁচে থাকবো কিনা।" সে জোর দিয়ে বললে "তুমি নিশ্চয় থাকবে, এবং আমার মার সঙ্গে দেখা করবে। যুদ্ধ শেষে নিশ্চয়ই কোনো যুদ্ধক্ষেত্র, কোনো ক্যাম্প থাকবে না, মানুষ আর মানুষকে মারবেনা। জানো তুমি, এইটে সব শেষ যুদ্ধ, সব শেষ।" আমি বললুম "হ্যাঁ ঠিক বলেছ"। সে বললে "আমার মাকে বোলো, যে আমি এমন এক পৃথিবীর জন্যে মরেছি যেখানে যুদ্ধক্ষেত্র নেই, যুদ্ধ নেই বা ক্যাম্প নেই। বলবে তো ঠিক।" আমি ঘাড় নাড়লুম। "মনে রেখো আমার

মা পূর্ব দিকে খাবারোভস্ক সহরে থাকে, ২৫ নং লেভ্‌ টলষ্টয় ষ্ট্রীটে, বুঝেছো? আমি বললুম "বুঝেছি।" আমি ব্যারাক সিনিয়র সারীর কাছে গেলুম কেননা তারই ক্ষমতা ছিল আসামীদের নামের তালিকা থেকে টোলিয়ার নাম কেটে দেবার। সে আমার মুখে চড় মেরে বের করে দিলে। টোলিয়াকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করা হলো। কয়েকমাস বাদে সারীকে একদল বন্দীর সঙ্গে পাঠানো হলো। যাবার আগে সে একটা সিগারেট চেয়েছিল, আমি সকলকে বারণ করে দিয়েছিলুম সিগারেট দেবার জন্যে। কেউ তাকে দেয়নি। হয়তো আমি ভুল করেছিলুম কেননা সারীর জীবনের শেষ হয়ে গিছলো মাউথাউসেন'এ। টোলিয়া যে ঠিকানা দিয়েছিল সেটা আমার এখনও মনে আছে—

আমরা সবাই চুপ করে রইলুম। কুর্ট কিছুই বুঝতে পারেনি তাই ব্যস্ত হয়ে আমাদের জিগ্যেস করতে লাগলো। ভিটেক সংক্ষেপে তাকে বুঝিয়ে দিলে।

"আমরা ক্যাম্পের কথা বলছি আর ভাবছি পৃথিবীটা আরও সুন্দর জায়গা হতে পারে কিনা। কুর্ট তুমিও কিছু বলো।" কুর্ট আমাদের দিকে একটু হেসে আস্তে আস্তে বলতে লাগলো যাতে সকলে বুঝতে পারে।

"আমি খুব সংক্ষেপেই বলছি। আমি যখন মাউথাউসেন'এ ছিলুম তখন ২০ জন পলাতক বন্দী ধরা পড়ে। সেদিন ক্রীষ্টমাসের আগের দিন। মস্ত বড় ক্রীষ্টমাস বৃক্ষের পাশেই চত্বরের উপর ফাঁসীমঞ্চ তৈরী হলো। সমস্ত বন্দীদের ডাকা হলো সেইখানে যেখানে ঐ ২০ জনের ফাঁসী হচ্ছিল। গাছের ওপর আলো দেওয়া হয়েছিল। ক্যাম্প অধিনায়ক আমাদের দিকে ফিরে হুকুম দিলে—

"বন্দীগণ, টুপি খোলো।"

"আমরা টুপি খুললুম। ক্যাম্প অধিনায়ক সেই চিরাচরিত ক্রীষ্টমাসের দিনের উপদেশ দিলে এই বলে "যারা শুয়োরের মতন ব্যবহার করবে তাদের ঠিক শুয়োরের মতনই মারা হবে। বন্দীগণ টুপি পরো।"

আবার আমরা টুপি পরলুম।

"এবার ছুটি"।

',আমরা সব ছড়িয়ে পড়লুম।"

কুর্টের গল্প শুনে আমরা নিঃশব্দে বসে রইলুম একটা করে সিগারেট ধরিয়ে। সকলেই গভীর চিন্তায় মগ্ন।

"অস্ট্রিয়েচিয় থেকে আমরা এসেছি"

— তাদিয়ুশ্‌ বোরোভ্‌স্কি

শব্দ দিয়ে ছবি আঁকতাম্ আমি....একাজে পটু আমি ..অথচ শব্দ খুঁজতে গিয়ে আজ কেন এ স্তব্ধতা।

আমি কবি।.......................।

আমি একজন পোল্যাণ্ডবাসী.......প্রায় সব পোলীশ দেশপ্রেমিকদের মত গেষ্টাপো-কারাগারে আমাদের যেতে হয়েছে নৈতিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে.......যেভাবে ইহুদীরা শহীদ হয়েছে তা বর্ণনার অতীত.......যৌবনে সৈনিক ছিলাম, কত বন্ধুকে যুদ্ধে ধরাশায়ী হ'তে দেখেছি। যেভাবে "ঘেটো" ঘেটোতে ইহুদিদের বন্দী করা হোল এবং পরে গ্যাসচেম্বারে নিয়ে গেল তা বস্তুনিষ্ঠভাবে ও পুর্ণভাবে বর্ণনা করার মত পোক্ত আমি নই....... অভ্যুত্থান ও ধ্বংসের সেই বীরত্বপুর্ণ দিনগুলোতে ওয়ার্শ থেকে দুরে ছিলাম আমি....পোল্যাণ্ডের সেদিন সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা.......শুধু কি দৈহিক মৃত্যু।.......ইতিহাসে হাজার হাজার বছর ধরে শহীদের মৃত্যু দেখেছি.........কিন্তু এবার? একটা আদর্শের জন্য যে মরবে.......শহীদের মৃত্যু-ও যে বরণ করবে তা-ও হোলো না.......কেড়ে নেওয়া হোল নিজের মৃত্যু বরণ করার মর্য্যাদা...........মানবতার কি অপমান।........নাৎসীরা ইহুদীদের মৃত্যুকে মৃত্যু-ও বলতে দেয়নি........।

আমার লেখনী কাঁপছে............।

যদি একটা কাব্যিক শব্দেও হয় তবুও, যতদিন না ঐ অতি বীভৎস পাপের বোঝা তুলতে পারছি নিজকে আমি মুক্ত কবি বলে মনে করবনা, অনুভব করব না যে আমি তাদেরই একজন যারা বেঁচে গেছে.......যে, লোক ঘৃণা, শহীদ হওয়া ও সংগ্রামের ঐ দিনগুলোতে মারা যায়নি।

ইউলিয়ান্ প্র.শিবস্ এর বিবৃতি থেকে।

অনেক দিন লাগ্‌লো প্রতীক চিহ্নগুলো দিয়ে ওদের সকলের নামের তফাৎ বুঝতে। কত প্রতীকচিহ্ন—কমাণ্ডাণ্ট। ওবেরক্যুরার, ষ্টুর্মফ্যু'রার। গার্ড আর ওভারসীয়ার। মাল গুন্‌তি করার মত লোকের সার গুন্‌তির জন্য ওরা আমাদের কাছে রোলকলের সময় আস্‌ত।………………ওপরের সঙ্কীর্ণ জান্‌লা থেকে আমাদের ওপর চোখ বোলাতো কোনো মানুষ নয় বন্দুক, প্রায়ই সেটা নীচু করে গুলীচালানো হ'ত।

আমাদের যারা মাঠে কাজ করতে নিয়ে যেত আমাদের "ক্যাপো"টি তাদের ডাক্‌ত "মুরুব্বি" বলে।

তারা আমাদের কাজ ভাগ করে দিত আর ভারী বেত্‌ নাচিয়ে তালিম দিত।…………কিছুটা দূরে সন্ধানী চোখ…………কাজের অমানুষিক গতি যেন বন্ধ না হয়…………বিশ্রাম করতে গিয়ে কেউ যেন না পালাতে প্রলুব্ধ হয়…………আমরা নির্বিকার।

ঐসব ঘৃণ্য পোষাকের আস্তরণে আসতে আসতে জাগ্‌ল সব পাণ্ডারা। স্মৃতিতে ভাস্‌ছে মান্দেলের চমৎকার, সুন্দর চেহারা………মেয়ে "ওবের ক্যাপো" ছিল সে………তাকে দেখ্‌লে বন্দীরা ভয়ে চুপ মেরে যেত…ওর নিষ্ঠুর দৃষ্টির সামনে আমাদের পা কাঁপত………তার পাত্‌লা ছড়িটা মাঝে মাঝে চল্‌ত…………তার ঝকঝকে বুটজুতো বন্দীদের চর্মসার পশ্চাদ্দেশে মাঝে মাঝে পড়ত…ও বদলী হ'লে আমরা বাঁচলাম। ড্রেশলার আর টাউবার; গ্যাস দেবার জন্য ওরা লোক বাছ্‌ত। চোখ একেবারে তীক্ষ্ণ, ভুলটি ওবার যো নেই। ঠিক বাছাই করে যাকে শ্মশানে পাঠাবার আর যাকে আরও

সাংঘাতিক কাজে পাঠাবার তা পাঠাতো। অথবা "মেধাবী বন্দীদের" "মজার" জন্য বেশ্যালয়ে পাঠাতো।

নাম ওদের অনেকেরই জানা ছিলনা। ব্রিগেডের পাণ্ডা হিসাবে ওদের আমরা নামকরণ করতাম········স্মৃতিতে শুধু মুখগুলো আসে—কিছুটা নিষ্প্রাণ এবং নিষ্ঠুর···········আর তাদের কীর্তিকলাপ!

"আউশভিৎজ মৃত্যুশিবিরের কর্মচারীদের বিচারকালীন এক সাক্ষীর জবানবন্দী" থেকে উদ্ধৃত।

যারা নতুন আসতো তাদের ইচ্ছাশক্তিকে অসাড় করে দেবার জন্যে অনবরত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হুকুম জারি করাই ওদের বিশেষত্ব ছিল। আদেশ জারি করার এই স্বর জার্মান সেনাবাহিনীর গৌরবের জিনিষ ছিল। এই স্বরই বুঝিয়ে দিতো যে জার্মানরা উচ্চতমজাতিরই স্বগোত্র। ওরা কথা বলে যেন এক একটা চাবুকের সপাৎ আওয়াজ হয়। চারিদিকে চুপচাপ এই স্তব্ধতা ঠিক সীসের মতন বুকের ওপর চেপে বসে। স্তব্ধতার মাঝে খালি একটা কথাই ভেসে এলো "আকটুং" (ঠিক হয়ে দাঁড়াও) এবং তার পরই সার্জেণ্ট মুখস্ত বলার মত হুকুমজারি আরম্ভ করলো। এই কথাগুলো যে সে গত কয়েকমাসে রোজ কতবার বলেছে তার ঠিক নেই।

"পুরুষেরা যে যেখানে আছো, সেইখানে থাকো। মেয়েরা আর শিশুরা পাশের ব্যারাকে গিয়ে কাপড়চোপড় ছাড়ো।

এই আদেশের পরই যে হৃদয়বিদারক দৃশ্য ঘটতো তা যারা স্বচক্ষে দেখেছেন তারা বর্ণনা করেছেন। বন্দীদের ভেতর যে মাতৃস্নেহ যে স্বামী স্ত্রীর প্রেম, যে পিতাপুত্রের ভালবাসা থাকে সেই আদিম ভালবাসার শক্তিই তাদের জানিয়ে দিতো যে এই শেষবারের মতন তারা পরস্পরের কাছে বিদায় নিচ্ছে। ভালবাসার ছোটখাট নিদর্শন—আলিঙ্গন, চুম্বন, হাত ঝাঁকুনি, আশীর্ব্বাদ, চোখের জল, দুটো শেষ কথা সবই থাকে। বন্দীদের দুঃখ, তাদের কোমলতা তাদের বুকভরা নিরাশা এও থাকে বইকি। মনস্তাত্বিক গার্ডরা খুব ভালই জানে যে এই সব কোমল বৃত্তিগুলোকে অসাড় করে দেওয়াই সকলের আগে দরকার। পৃথিবীর সকল জায়গার কসাইখানায় যে কতকগুলো সহজ নিয়ম আছে এই মৃত্যু পথের প্রহরীরা তা জানে।

এইখানে ট্রেবলিঙ্কায় কতকগুলো পশু মানুষের ওপর এই নিয়মগুলি প্রয়োগ করে চলে। জীবনের এই এক সংকট মুহূর্ত্ত যখন পিতার কাছ থেকে কন্যাকে, মাতার কাছ থেকে পুত্রকে, দিদিমার কাছ থেকে নাতি নাতনীদের ও স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

আবার সেই স্বর চত্বরের চারিদিকে ছড়িয়ে পরলো" "আকটুং" কেননা ঠিক এই মুহূর্তে মানুষের সাধারণ বুদ্ধিকে আশার আলোকে ঢেকে দিতে হবে। মরণের চরম ক্ষণকে জীবনের নিয়ম দিয়ে ভুলিয়ে দিতে হবে। সেই স্বরেই আদেশের পর আদেশ জারি চললো।

"স্ত্রীলোকেরা আর ছেলেমেয়েরা ব্যারাকে ঢোকার দরজার সামনে জুতো খুলে রাখো" মোজাগুলো জুতোর ভেতর ঢুকিয়ে রাখো। ছেলেমেয়েদের চটি আর বুট জুতোর ভেতর রোখো। পরিষ্কার করে রাখো সকলে" আরো—

"বাথরুমে যাবার সময় সকলে গয়নাগাটী, কাগজপত্র, টাকাকড়ি, তোয়ালে আর সাবান সঙ্গে রাখো। আবার আমি পরে বলবো।"

মেয়েদের ব্যারাকে একটা চুলকাটার ঘর আছে। সেখানে বিবস্ত্রা মেয়েদের চুল ছাঁটা হয়, বৃদ্ধাদের পরচুলো খুলে নেওয়া হয়। মৃত্যুর আগে চুল ছাঁটা; মনস্তত্ত্বের অদ্ভুত নিদর্শন। যারা চুল ছাঁটতো তারা সকলেই বলেছেন যে এই চুল ছাঁটার ফলে মেয়েরা ভাবতো তারা স্নান করতে যাবে। কোনো কোনো তরুণী নিজেদের চুলে হাত দিয়ে দেখতো আর যে চুল ছাঁটতো তাকে বলতো "দেখোতো, এই জায়গাটা ঠিক হয়নি একটু দয়া করে ঠিক করে দাওনা"। চুল কাটার পর ভীত মেয়েদের বেশীর ভাগই শান্ত হয়ে আসতো। ব্যারাক থেকে যারা বেরিয়ে আসতো সকলের হাতেই সাবান আর একটা ভাজ করা তোয়ালে থাকতো। কোন কোনো তরুণী মেয়ে তাদের সুন্দর চুলের জন্যে কাঁদত। কেন এই মেয়েদের চুল ছাঁটা হতো; একি তাদের ছলনা করার জন্যে না, তা নয়। এই চুল রাইখের প্রয়োজনে পাঠানো হতো। আমি অনেক লোককে প্রশ্ন করেছি যে এই জীবন্তে মৃতপ্রায় মেয়েদের অপর্যাপ্ত মাথার চুল দিয়ে জার্মানরা কি কাজ করত। অনেক সাক্ষীর সাক্ষ্যে প্রকাশ এই কালো,

সোনালী, লাল চুল খোঁপাই হোক আর বেনীই হোক, পরিশোধন করে, থলের ভেতর পুরে জার্মানীতে পাঠানো হতো। কিসের জন্য? কেউ সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। কেবল কেনে লিখিত এজেহার থেকে জানা যায় এই চুল রাইখের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী গ্রহণ করতো। এই চুল গদীর ভেতর ঠাসা হতো, সাবমেরিনের দড়ি হ'তে, অন্যান্য শিল্পকর্ম্মে ব্যবহার হ'ত।

আমার মনে হয় এই এজাহারের সম্পূর্ণ সত্যতা আমরা গ্রসঅ্যাড্‌-মিরাল রয়েডারের নিকট হতে পাবো। তিনি ১৯৪২ সালে জার্মান নৌবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন।

পুরুষরা চত্বরেই জামাকাপড় ছাড়তো। সকালের প্রথম দল থেকে যারা শক্ত সমর্থ সেইরকম দেড়শো থেকে তিনশো লোক যারা বেঁচে থাকতো, তাদের কাজছিলো মৃতদেহ কবর দেওয়া। এদের আবার পরেরদিন মেরে ফেলা হতো। পুরুষদের চটপট করে কিন্তু সাবধানে জামা কাপড় ছাড়তে হতো এবং সারি সারি তাদের জুতো, মোজা, ইজের, কোট ও প্যাণ্ট সাজিয়ে রাখতে হতো। আর একদল লোক এদের বলা হতো, "লাল দল" বন্দীদের কাপড় চোপড় আলাদা করতো। এই লোকদের হাতে লাল বন্ধনী থাকতো-- যারা যানবাহন বিভাগে কাজ করতো তাদের থেকে আলাদা করবার জন্যে এই ব্যবস্থা। জার্মানীতে পাঠাবার মতন প্রতিটী পরিধেয় তক্ষুনি গুদামে পোরা হতো। এই কাপড়গুলি থেকে সবরকম চিহ্ন বা নাম সযত্নে তুলে ফেলে বন্দীদের বাদবাকী কাপড়গুলি হয় পুড়িয়ে ফেলা হতো নয়তো গর্ত্তে পুঁতে ফেলা হতো।

প্রতিটি গতিশীল মুহূর্ত্তের সঙ্গে বন্দীদের মনে ভয়ের ভাব ফুটে উঠতো। নির্বাপিত চুল্লীর গন্ধ বা অন্য কোন বিকট গন্ধ নাকে এসে লাগতো। মোটা মোটা বিরক্তকর মাছিগুলোকে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। এবড়ো খেবড়ো মাটিতে পাইন গাছের ওপর ওরা কি করছে। বন্দীদের নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠতো। প্রতিটি ক্ষুদ্র জিনিষকেই তারা ভয়ের চোখে দেখতে লাগলো। তাদের ভবিষ্যতের ওপর যে

কালো পর্দ্দার আবরণ তার একটী ক্ষুদ্র অংশও যদি তোলা যেতো দক্ষিণের দিক থেকে বিরাট বিরাট খননকারক যন্ত্রের যে কান ফাটানো আওয়াজ আসছে তারই বা মানে কি বন্দীরা বুঝে উঠতে পারতোনা।

কাঠের একটা ছোট পাটাতনের ওপর সার্জ্জেণ্ট ও তার পাশে গার্ডরা বসে আছে। তাদের পায়ের কাছে কতকগুলি কাঠের বাক্স, একটা নোট রাখবার, একটা খুচরো পয়সা আর তৃতীয়টা ঘড়ি, আংটি ব্রোচ ব্রেসলেট ও অন্যান্য জড়োয়া গহনার জন্য। দলিলপত্রগুলি মাটিতে স্তূপাকার করা আছে, পৃথিবীতে এগুলো আর কোনদিন কারো কাজে লাগবেনা। জীবন্ত মৃতদের এই কাগজপত্র আর ঘণ্টাখানেক বাদেই গর্তের ভেতর সমাধি লাভ করবে। কিন্তু সোনাদানা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যের কথা আলাদা, জহুরী বসে আছে সোনায় খাদ মেশানো আছে কিনা দেখতে মণিমুক্তোর দর কসতে আর হীরার আসল নকল ধরতে।

এই পশুগুলো সব জিনিষই কাজে লাগায়—মানুষের প্রয়োজনীয় যা কিছু, চামড়া হোক, কাগজ হোক, সুতোর জিনিষ হোক সবই তারা কাজে লাগায়—শুধু পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিষ মানবজীবন তারা পায়ের তলায় পিষে ফেলে। কত মহৎ প্রাণ, কত উচ্চ মন। কত শিশুর নিষ্পাপ চক্ষু, কত সুন্দরী মেয়ে, প্রকৃতির কত দিনের কত সাধনার ফল এখানে নিমেষের মধ্যে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। যে জীবনের সৃষ্টি করতে ভগবান তার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি প্রয়োগ করেন এখানে মুহূর্তের মধ্যে তার নাশ হয়ে যায়।

এই কোষাধক্ষ্যের টেবিল থেকেই তাদের জীবনের মোড় ঘোরে। যে ছলনার জাল এতক্ষণ এই বন্দীদের উদভ্রান্ত করে রেখেছিল কয়েকটী মুহুর্তের মধ্যে সে জাল ছিন্ন হয়ে অত্যাচারের স্বরূপ প্রকাশ হতেই বন্দীরদল আশা থেকে নিরাশায়, জীবন থেকে মৃত্যুর দ্বারে এসে পৌঁছায়। যেমন কনভেয়ার বেল্ট মেশিনে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কত সহজেই পৌঁছেদেয় তেমনি ছলনার অন্তরালে এই অত্যাচার বন্দীরের কত সহজেই মৃত্যুর দ্বারে ঠেলে দেয়। যখন এই অসহায়দের দেহ থেকে শেষ চিহ্নটুকুনও কেড়ে নেওয়া হয় তখন বন্দীদের

প্রতি জার্মানদের ব্যবহারেরও পরিবর্তন হয়। মেয়েদের আঙুল ভেঙে দিয়ে আংটী কেড়ে নেয়, কান ছিঁড়ে দিয়ে কানের দুল নিয়ে নেয়। মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দেবার এই কনভেয়ার বেল্টের শেষ কাজ অন্যরূপে প্রকাশ পায়—সেই জন্যেই "ঠিক হয়ে দাঁড়াও" এর বদলে শোনা যায় "পা চালাও, দ্রুত, দ্রুত, আরো দ্রুত, মৃত্যুর পথে আরও দ্রুততর চলো।"

বর্তমান দিনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা থেকে জানা গিয়েছে মানুষের দেহ থেকে বস্ত্র কেড়ে নিলে তার প্রতিরোধের ক্ষমতাও কেড়ে নেওয়া যায়। ভাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো ক্ষমতাই তার থাকেনা। পরিধেয় বস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে থাকার স্পৃহা তার চলে যায় এবং দুর্ভাগ্যকে মাথা পেতেই নেয়। জীবনকে যারা বিনা আপোষেই মেনে নিত তারাও আজ জীবনের প্রতি উদাসীন হয়ে ওঠে। ঘটনার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার জন্য এই গার্ডরা মৃত্যুর শেষ অঙ্কে আরো নিষ্ঠুরতম উপায় প্রয়োগ করে বন্দীদের মানসিক আঘাত দেয়। কি করে এ আঘাত দেওয়া হতো ?

এ আঘাত দেওয়া হতো কতকগুলি অর্থহীন এবং যুক্তিহীন নিষ্ঠুরতার দ্বারা। এই উলঙ্গ বন্দীদল যাদের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া সত্ত্বেও যারা মানুষ— ওই য়ুনিফর্মপরা জার্মান সেনাবাহিনীর পশুদের চেয়ে ঢের বেশী মানবতার যারা অধিকারী--যারা এখনও নিঃশ্বাস নিচ্ছে, দেখছে, ভাবছে, যাদের হৃৎপিণ্ড এখনও দ্রুততালে চলেছে ; হঠাৎ তাদের হাত থেকে সাবান আর তোয়ালে গুলো ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়। তাদের পাঁচজন করে এক সারিতে দাঁড় করানো হয়।

"হাত ওপরে তোলো, এবার মার্চ করে যাও, জলদি, জলদি।"

বন্দীর দল একটা ১৩০ গজ লম্বা ও ২ গজ চওড়া রাস্তায় এসে পৌঁছালো। এ রাস্তার দুপাশেই গাছ আর ফুলের সমারোহ। এই পথই তাদের নিয়ে যাবে মৃত্যুর দুয়ারে। রাস্তার দুপাশে কাঁটা তারের বেড়া সত্ত্বেও কালো আর ছাই রংএর য়ুনিফর্ম পরা দু সারি গার্ড কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাটিতে সাদা বালি ছড়ানো। যারা হাত উঁচু করে সামনে যাচ্ছিলো তারা সেই পদদলিত বালিতে কত খালি পায়ের ছাপ

দেখতে পেলো—ছোট ছোট মেয়েদের পায়ের ছাপ, অতি ক্ষুদ্র শিশুর পায়ের ছাপ আর বৃদ্ধের গভীর পায়ের ছাপ। কত সহস্র হতভাগ্য কিছু পূর্বে এই পথ দিয়ে চলে গেছে, তাদের পায়ের ছাপ ছাড়া আজ আর কিছুই নেই। সেই পথেই এই নতুন চার সহস্র হতভাগ্যের দল চলেছে, আরও কত সহস্র যে অপেক্ষা করে আছে। ঘণ্টা দুই পরে এই পথেই চলবে। এরা যেমন চলেছে তেমনি করে আগের দিন বা দশদিন আগেও কত লোক চলেছে, আবার এদের পরের দিন কি আরো পঞ্চাশদিন ধরে কত লোক এই পথে চলবে তার ইয়ত্তা নেই। ট্রেবলিঙ্কায় যে ১৩ মাস নরকের বীভৎসতার সৃষ্টি হয়েছিল সেই নরকে যে কত লোক চলে গেছে তা কে বলতে পারে।

জার্মানরা এ পথকে বলতো "ফেরার পথ নয়।" সুখেমিল বলে মনুষ্যনামধারী এক পশু এই বন্দীদের দেখে মুখ ভেংচে, চীৎকার করে, ইচ্ছে করে বিকৃত কথা বলতে আরম্ভ করতো—

"ও ছেলেরা তোমরা শিগ্গীর এসো; তোমাদের চানের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।" সেই পশুটা এই কথা বলে হাসতে হাসতে চারিদিকে লাফিয়ে বেড়াতো।

সেই দু সারি প্রহরীর মাঝ দিয়ে বন্দীর দল হাত উঁচু করে চলেছে, মাঝে মাঝে বন্দুকের খোঁচা বা রবারের লাঠির দু এক ঘা খাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বড়দের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছেনা তাই দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে। অনেক সাক্ষী খুব জোর দিয়েই বলেছে যে বন্দীদের ক্যালভারীতে যাওয়ার পথের শেষ যাত্রায় সেফ বলে একটি মনুষ্যনামধারী পশুর নৃশংসতার তুলনা হয় না। সে শিশু ও বালক বালিকা হত্যায় বিশেষজ্ঞ ছিল। এই পিশাচটা অসম্ভব শক্তির অধিকারী ছিল। বন্দীদের দু এক পাক ঘুরিয়েই মাটিতে তার মাথা ঠুকে ভেঙ্গে দিতো, কখনো বা ছেলেটিকে ছিঁড়ে দু টুকরো করে ফেলতো।

আমি যখন এই পিশাচটির কথা শুনেছিলাম তখন বিশ্বাস করতে পারি নি যে নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে কোনো লোক এত নিষ্ঠুর হতে পারে। কিন্তু আমি যখন যারা স্বচক্ষে দেখেছে তাদের কাছ থেকে

শুনলাম যে ট্রেবলিঙ্কায় যে বীভৎস নরকের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ওই পিশাচটির ব্যবহার কিছুই আশ্চর্যজনক নয় তখন বুঝলাম যে জগতে সব কিছুই সম্ভবপর।

সেফের নিষ্ঠুরতারও প্রয়োজন ছিল—এই মৃত্যুপথ যাত্রীদের মানসিক আঘাত দেবার পক্ষে এ এক মস্ত বড় সহায়ক, যে অযুক্তিসিদ্ধ নিষ্ঠুরতা মানুষের চেতনা ও ইচ্ছাশক্তিকে অসাড় করে দেয় এ তারই একটা অংশ মাত্র। যে বিরাট দানব শক্তি ফ্যাসিস্ট রাজ্য চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেফ্ তারই একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। প্রকৃতি যে এরকম অধঃপতিত মানুষের সৃষ্টি করতে পারে, এ ভেবে আমাদের ভয় পেলে চলবে না। এই পার্থিব জগতে কত অদ্ভুত বস্তুই না আছে। কত প্রকাণ্ড জীব, মানসিক অধঃপতনের শেষ সীমায় উপস্থিত কত বিকটাকার দানবই না এই পৃথিবীতে বাস করছে। ভয় আমাদের অন্য জায়গায়। এমন কতকগুলো জীব আছে যাদের সমাজের বাইরে রেখে মনস্তাত্বিক দিয়ে চিকিৎসা করা প্রয়োজন তারাই পৃথিবীর কোনো কোনো রাজ্যে নাগরিকের ন্যায় সক্রিয় জীবন যাপন করে চলেছে। এদের বিকৃত কল্পনা, এদের নির্দয় মনস্তত্ব, এদের অদ্ভুত অপরাধ প্রবণতা এই সবই ফ্যাসিস্ট রাজ্যের অত্যাবশকীয় উপাদান। এই রকম শত সহস্র জীব নাৎসী জার্মানীর ভিত্তি গড়ে তুলেছে। য়ুনিফর্ম পরে, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, বিভিন্ন পদকে বিভূষিত হয়ে এই পশুরাই বহু বৎসর ধরে ইউরোপের জনগণের জীবন মৃত্যুর প্রভুত্ব করেছিল। এরা মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে না, করে সেই রাজ্য, যে এদের অন্ধকারের গর্ভ থেকে নিয়ে এসে নিজেদের প্রয়োজনে তৈরী করে নিয়েছিল। ওয়ারসর কাছে ট্রেবলিংকায়, আউস-ভিসে, লুবলিনের একটু দূরে মাইদানেকে, বেলসেনে, সোবিয়েবোর্রো, বাবিসারে, ওডেসার কাছে ডোমানেস্কায়, মিন্স্ক'এর কাছে ট্রোস্টিয়ানেটে, লিথুনিয়াম পোনারীতে, ছোট খাট কত লেবার ক্যাম্পে যেখানে জীবনের চিহ্ন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়, সেখানে এই পশুর দল অপরিহার্য্য ছিল

রাজ্য শাসনের এই প্রণালী কখনই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন আকাশ থেকে পড়েনি। একটা জাতির প্রাকৃতিক ও মানসিক উপাদানই এরকম

শাসন প্রণালীর সৃষ্টি করে। এই বিষয়েই আমাদের গভীর ভাবে চিন্তা করা উচিত এবং এই জন্যেই আমাদের আতঙ্কিত হওয়া দরকার।

ক্যাশিয়ারের ডেস্ক থেকে মৃত্যুপুরীতে যেতে দুই কি তিন মিনিট লাগে। গার্ডদের মারের ঠেলায় আর চেঁচানির জোরে বন্দীরা যখন তৃতীয় চত্বরে এসে পৌঁছোতো তখন এক মিনিটের জন্যে তারা স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে থাক্‌ত। তাদের ঠিক সামনেই একটা সুন্দর বাড়ী, পুরাকালের মন্দিরের মত মাথার ওপর কাঠ দেওয়া। পাঁচটা চওড়া কিন্তু নীচু নীচু সিঁড়ি দিয়ে তার কারুকার্যকরা মস্ত দরজায় পৌঁছোনো যায়। ঢোকার মুখে কত ফুল ফুলদানীতে সাজানো রয়েছে। এত সুন্দর বাড়ীর চারিদিকেই কিন্তু বিশৃঙ্খল। এপাশ ওপাশে সদ্য মাটি খোঁড়ার চিহ্ন রয়েছে, বড় বড় খননকারী যন্ত্র নিখুঁতভাবে মাটীতে কবর কেটে যাচ্ছে, এদের সঙ্গে কতকগুলো জার্মান কুকুরের বিশ্রী ঘেউ ঘেউ আওয়াজ মিশে গেছে।

এই মৃত্যুপুরীর দুদিকেই ছোট মাপের রেললাইন পাতা আছে। রেল-লাইনে কয়েকজন লোক ওভারঅল গায়ে দিয়ে কতকগুলো মালগাড়ী ঠেলে দিচ্ছে। এই মালগাড়ীগুলো আপনা থেকেই কাত হয়ে মাল খালাস করে।

আস্তে আস্তে মৃত্যুপুরীর বিরাট দরজা খুলে গেলো, ভেতর থেকে এই মৃত্যুপুরীর প্রধান কর্তা'র দুজন সহকারী বেরিয়ে এসে দরজার মুখে দাঁড়ালো। দুজনেই তারা ক্ষিপ্ত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। একজনের বয়স বছর তিরিশ হবে, লম্বা, কাঁধ চওড়া, রংটা ময়লা, মুখে এক পৈশাচিক হাসি, উত্তেজনার চোটে মুখটা লাল হয়ে গেছে, কাল চুলগুলো উস্কো খুস্কো। অপরটী অল্প বয়সী, বেঁটে খাটো, চুলগুলো বাদামী; মুখের রং ধবধব করছে সাদা যেন এখুনি এক্রিডি খেয়ে এসেছে। লম্বা লোকটীর হাতে একটা এক গজ লম্বা গ্যাসের নল আর একটা চাবুক; অন্য লোকটীর হাতে একটা ছোরা।

ঠিক সেই মুহূর্তে গার্ডরা তাদের শিক্ষিত কুকুগুলোর গলার চেন খুলে দেবার মাত্র তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে এই অসহায় উলঙ্গ বন্দীদের দেহে তাদের তীক্ষ্ণ দাঁত বসিয়ে দিল। ভীতা সন্ত্রস্তা মেয়েদের বন্দুকের খোঁচা মারতে মারতে গার্ডরা নিয়ে চললো।

বাড়ীর ভেতরে যেখানে শিঙ্‌ৎ'এর সহকারীরা কাজ করছিল সেইখানে এই হতভাগ্যদের খোলা দরজা দিয়ে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো।

ট্রেবলিঙ্কা ক্যাম্পের অধিনায়ক কুর্ট ফ্রান্‌জ্‌ আর তার চেনে বাঁধা কুকুর 'বারি' ঠিক এই সময়ে বাড়ীর সামনে এসে উপস্থিত হতো। কুর্ট বিশেষ করে তার কুকুরকে শিখিয়েছিল—খুলে দেবা মাত্র সে লাফ দিয়ে পড়ে পুরুষ বন্দীদের পুরুষাঙ্গ কামড়ে ছিড়ে নিয়ে আসতো। কুর্ট ফ্রান্‌জ্‌ এই ক্যাম্পের এক উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। সে নিম্নতম কর্মচারী থেকে উচ্চতম কর্মচারীর পদে উন্নীত হয়েছিল। তিরিশ বছরের এই লম্বা রোগা লোকটী শুধু যে মৃত্যুর এই অভিযান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতো তা নয়, সে নিজের কাজকে একরকম পূজা করতো। ট্রেবলিঙ্কায় যেখানে তার সদা জাগ্রত চোখের সামনে সব কাজ হতো, সেই ট্রেবলিঙ্কার বাইরে সে নিজের জীবন কল্পনা করতেও পারতো না। এক হিসাবে সে কল্পনাপ্রবণ লোক ছিল এবং নিজের কাজের মানে সবিস্তারে বর্ণনা করতে ভালবাসতো। এই গ্যাস চেম্বারের ভয়ঙ্কর মুহূর্তগুলোয় যদি হঠাৎ পোপ বা হিটলারধর্মী কোন মানুষ দর্শক হিসাবে এসে উপস্থিত হতো তবে তারা নিজেদের ধর্মপুস্তক, বা অন্যান্য প্রবন্ধের জন্য অনেক নূতন তর্কবিতর্কের বিষয় সংগ্রহ করতে পারতো সন্দেহ নেই।

মানবতার শক্তি কতখানি? মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কখনই মানবতার মৃত্যু ঘটেনা। ইতিহাসের পাতায় যখন সেই কলঙ্কময় দিনগুলো আসে যখন মানুষের পর পশুর রাজত্ব হয় তখন সেই হতভাগ্য মানুষরা শেষ নিশ্বাস অবধি তাদের চিন্তা করার ক্ষমতা ও ভালভাসার শক্তি বজায় রাখে। বিজয়ী পশু কিন্তু মানুষকে হত্যা করেও পশুই থেকে যায়।

কি করে এই জীবন্ত মৃতরা ট্রেবলিঙ্কায় শেষ মুহূর্ত অবধি তাদের আত্মার সম্মান বজায় রেখে গেছে, সে সব শুনলে চোখের ঘুম চলে যায়, বুক ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।

কত স্ত্রীলোক তাদের সন্তানদের বাঁচাবার জন্যে কত মহান ত্যাগ স্বীকার করেছে! কত তরুণী মাতা তাদের শিশু সন্তানদের কম্বলের তলায়

রেখে নিজেদের দেহ দিয়ে বৃথাই ঢাকতে চেষ্টা করেছে। এই অজ্ঞাত মায়েদের নাম কেউ জানে না, কেউ কোনদিন জানবেও না। লোকে বলে একটি ১০ বৎসরের মেয়ে তার ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে কত রকমে মা বাবাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, একটি ছোট ছেলে গ্যাস চেম্বারে ঢোকবার আগে চেঁচিয়ে গেছলো "মা, গো, কেঁদনা, রাশিয়ানরা আমাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে।" এই সব ছেলেমেয়েদের নামও কেউ জানে না, কেউ বোধ হয় কোনোদিনও জানবে না। আমরা এমনও শুনেছি যে কত শত শত বন্দী নিরস্ত্র অবস্থাতেই অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত গার্ডদের সঙ্গে লড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে বুকে বন্দুকের গুলী খেয়ে মারা গেছে। সকলের পাশেই নিজের অস্ত্র ছিল। অস্ত্র ছিল ছোরা, লাঠি আর ক্ষুর।

যারা এই মারণ যজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়েছিল তাদের নাম পৃথিবীর শেষ দিন অবধি কেউ জানতে পারবে না। একটি মহিমাময়ী নারী গার্ডদের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে একলাই যুদ্ধ করেছিলো শত শত গোলাগুলী ছোঁড়া সত্বেও। দুটি পিশাচ এই যুদ্ধে মারা যায়, তৃতীয়টির হাত ভেঙ্গে যায়। সে ট্রেবলিঙ্কায় ফিরে যায় এক হাত নিয়ে। মেয়েটির কপালে যে নিষ্ঠুরতা ঘটেছিল তা কল্পনাতীত। মেয়েটির নাম কেউ জানে না কেউ তাকে সম্মানও দেখায়নি। কিন্তু এমন কি চিরকাল থাকবে? এই যে এত মা নিজের দেহ দিয়ে সন্তানের দেহ রক্ষা করেছে, এত সন্তান বাপের চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছে, এত লোক ছোরা আর হাত বোমা নিয়ে যুদ্ধ করেছে, এত লোক রাতের অন্ধকারে প্রাণ দিয়েছে, এই যে মহিমাময়ী বিবস্ত্রা নারী গ্রীক দেবীর মত একলা অসংখ্যের বিরুদ্ধে লড়েছে তারা সবাই আজ বিস্মৃতির গর্ভে লীন হয়ে গেছে কিন্তু তারা যে নাম রেখে গেছে সে নাম গণ্ডা গণ্ডা হিটলার বা হিমলার পায়ের তলায় পিষ্‌তে পারবে না—সে নাম হচ্ছে 'মানুষ'। তাদের স্মৃতিফলকে ইতিহাসের পাতা লিখে যাবে—"এখানে ঘুমোচ্ছে একজন যে ছিল সত্যিকার মানুষ।"

ট্রেবলিঙ্কার কাছে ভলকা বলে একটি গ্রামের অধিবাসীরা বলেছে যে এক এক সময় এই মৃত্যুপথযাত্রী মেয়েদের চীৎকার এত বীভৎস হয়ে উঠতো যে মনে হতো সমস্ত আকাশ বাতাস যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। গ্রামবাসীরা

এই চীৎকার এড়াবার জন্যে অনেক সময় দূরে বনে পালিয়ে যেতো। এক এক সময় এই চীৎকার স্তব্ধ হয়ে যেতো আবার তেমনি হঠাৎ শোনা যেতো — এ চীৎকার মানুষের মজ্জায়, অস্থিতে এমন কি তার আত্মায় গিয়ে আঘাত করতো। দিনের মধ্যে এ চীৎকার তিন চার বার শোনা যেতো।

গ্যাস চেম্বারের দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ নিস্তব্ধতা নেমে আসতো। নতুন একদল বন্দী গ্যাস চেম্বারে আসলে সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েরা আবার চেঁচিয়ে উঠতো। এই রকম দিনে দুই, তিন এমন কি চার বারও হতো। কেন না ট্রেবলিঙ্কার কসাইখানা ঠিক সাধারণ কসাইখানার মতো ছিল না। বর্তমান যুগের যন্ত্রশিল্পে কনভেয়ার বেল্ট যেমন অনবরত মাল জুগিয়ে যায় তেমনি ট্রেবলিঙ্কার কসাইখানার জন্যেও অনবরত মানুষ জোগানো হতো।

আজকালকার দিনে কোনো কারখানা যেমন আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে এখন যে ট্রেবলিঙ্কার বর্ণণা আমরা দিয়েছি সেও এই রকম তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল। নতুন নতুন কত কারখানা আস্তে আস্তে তৈরী হয়েছিল। প্রথমে তিনটী ছোট ছোট গ্যাস চেম্বার তৈরী করা হয়েছিল। ঐ চেম্বার গুলো যখন গঠনের পথে তখন একদল বন্দী এসে পড়ে। চেম্বার সম্পূর্ণ না হওয়ায় সেই বন্দীদলকে বন্দুকের বাঁট, কুড়ুল, হাতুড়ী ও লাঠি দিয়ে মারা হয়েছিল। ট্রেবলিঙ্কার আশে পাশের গ্রামবাসীরা যাতে সেখানকার কাজের কথা কিছু জানতে না পারে সেইজন্যে গার্ডেরা গোলাগুলীর ব্যবহার করেনি। প্রথম তিনটী গ্যাস চেম্বার কংক্রীট দিয়ে তৈরী ছিল এবং খুবই ছোট ছিল, মাত্র ৫×৫ মিটার বা ২৫ বর্গ মিটার ছিল (১মিটার ৩৯·৩৭ ইঞ্চি)। চেম্বারগুলো ১৯০ সেন্টিমিটার উঁচু ছিল (৬ফিট ২½ ইঞ্চি)। প্রত্যেক চেম্বারের দুটি করে দরজা ছিল। একটী দিয়ে জীবন্ত বন্দীদলকে ঢোকানো হতো, অপরটি দিয়ে মৃতদেহগুলি বার করে দেওয়া হতো। দ্বিতীয় দরজাটী খুবই চওড়া প্রায়, ২½ মিটার হবে। একই ভিত্তির ওপর সব চেম্বারই তৈরী ছিল।

বার্লিন থেকে যে কসাইখানা তৈরী করবার আদেশ এসেছিলো, এই তিনটী গ্যাস চেম্বারের সেই আদেশ পালন করবার মত ক্ষমতা ছিল না।

সেই জন্য উপরে যে বাড়ির কথা বলা হে'াল সেই বাড়ি তখন থেকে তৈরী করা আরম্ভ হোল। ট্রেব্লিঙ্কার অধিনায়করা গর্ব করে ব'লতো যে সেখানে যে রকম কাজ হ'ত এমন কাজ মাইদানেক, সোবিয়েবোর, বেলসেক প্রভৃতি অন্যান্য গেস্টাপো ক্যাম্পে পূর্বে কখনও হয়নি।

প্রায় পাঁচ সপ্তাহ ধরে সাতশো এই বন্দী নতুন মৃত্যুপুরী তৈরী করে চলেছিল। কাজ পুরোদমে চলার সময় জার্মানী থেকে একজন বিশেষজ্ঞ তাঁর দলবল নিয়ে এসে উপস্থিত—পরামর্শ দিতে। একটা চওড়া কংক্রীটের করিডরের দু পায়ে সমান দূরত্ব রেখে মোট দশটা চেম্বার তৈরী হয়েছিল। প্রত্যেক গ্যাস চেম্বারে পুরনো তিনটির মত, দুটো করে দরজা ছিল। একটার মুখ করিডরের দিকে, যেটা দিয়ে জীবন্ত বন্দীদের ঢোকান হ'ত। অপর দরজাটি প্রথম দরজার উল্টো দিকে ছিল এবং এটা দিয়ে মৃতদেহ গুলিকে বার করা হ'ত। (আগেকার গ্যাস চেম্বার গুলি থেকে পুরনো নিয়মে মৃত দেহ গুলিকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে দড়ি দিয়ে টেনে বার করা হত)। এই দরজাগুলি দিয়ে দুপাশের প্ল্যাটফর্মে পৌঁছান যেত। এই প্ল্যাটফর্মের পাশে ছোট লাইনের রেলপথ ছিল। মৃতদেহগুলি প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর সেগুলো মালগাড়ীতে ভর্তি করা হতো। মস্ত মস্ত খননকারী যন্ত্র দিন রাত্রি এই কবর গুলো খুঁড়ে চলেছিল।

গ্যাস চেম্বারের মেঝেগুলো প্ল্যাটফর্মের দিকে ঢালু থাকায় চেম্বারের মাল খুব তাড়াতাড়ি খালাস করে ফেলা হতো।

প্রত্যেক গ্যাস চেম্বারের ক্ষেত্রফল ৭ × ৮ মিটার অর্থাৎ ৫৬ বর্গ মিটার। দশটা নতুন চেম্বারের সবশুদ্ধ ক্ষেত্রফল ছিল ৫৬০ বর্গ মিটার। এর সঙ্গে যদি পুরোনো তিনটে চেম্বার—যে গুলো তখন অল্পসংখ্যক লোকের জন্য ব্যবহার হচ্ছিল—যোগ করা যায় তবে ট্রেবলিঙ্কার মৃত্যুপুরীর সীমা হতো ৬৩৫ বর্গ মিটার। ৪০০ থেকে ৫০০ লোককে এক একবারে একটা চেম্বারে পুরে দেওয়া যেতো। সুতরাং যখন দশটা চেম্বারই ভরে দেওয়া হতো তখন একসঙ্গে গড়ে ৪৫০০ লোকের জীবননাশ করা যেতো। ট্রেব্লিঙ্কার গ্যাসচেম্বারগুলো প্রত্যেকবার পুরো ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও, দিনে দু'তিন বার ব্যবহার করা হ'ত। (এমন দিন গেছে যখন চেম্বারগুলো দিনে

পাঁচবারও ভর্ত্তি হয়েছে।) খুব কম করে ধরলেও আমরা গুনে দেখেছি যে নতুন চেম্বারগুলো দিনে দুবার লোক ভর্তি করলেই ট্রেবলিঙ্কায় একদিনে দশ হাজার বা এক মাসে ৩লক্ষ লোককে হত্যা করা হোত। তের মাস ধরে প্রত্যেকটি দিন ট্রেবলিঙ্কায় কাজ হয়েছে। যদি আমরা বাড়ী সারান বা বন্দী না আসার জন্য নব্বই দিন বাদ দি, তবুও ১০ মাস সময় থাকে। যদি এক মাসে গড়ে তিন লক্ষ লোক মারা গিয়ে থাকে তবে দশ মাসে নিশ্চয়ই তিরিশ লক্ষ লোক মারা গেছে। আবার আমরা সেই তিরিশ লক্ষতেই ফিরে এলুম। আমরা প্রথম. এই সংখ্যাতে পৌঁছেছিলাম, যখন যে সব বন্দী আসতো তাদের সংখ্যা কম করে ধরেছিলাম। আবার আমি বলছি :—

প্রথমতঃ—কয়েকজন সাক্ষীর এজাহারে প্রকাশ যে জার্মনরা সবদিনই কাজ করত এমন কি তারা রবিবার, ক্রীষ্টমাস, ঈষ্টার বা নববর্ষের দিনও পালন করত না। যদিও এই কাজ খৃষ্টান ধর্ম বিরুদ্ধ ছিল।

দ্বিতীয়ত—একটা চেম্বারে যে লোক ধরতো তার সংখ্যা কম করেই ধরা হয়েছে। অন্য জায়গায় যে সব মৃত্যুকারখানা ছিল, সেখানকার গ্যাস চেম্বারে কোনদিনই এত ঠাসাঠাসি করে লোক পোরা হতো না যেমন এইখানে ট্রেবলিঙ্কায় পোরা হতো। অনেক সময় একটা চেম্বারে ৭০০ থেকে ৮০০ জীবন্ত লোককে পোরা হতো। ছোট ছোট শিশু ও রুগীদের ঠাসাঠাসি পুরুষ ও মেয়েদের মাথার উপর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হোত।

তৃতীয়তঃ—আমি আগে দেখিয়েছি যে গড়ে চেম্বারগুলো দিনে দুবার ভর্তি করা হতো। কিন্তু অন্য সব জায়গা থেকে প্রমাণ পাওয়া গেছে সে দিনে তিনবার ভর্ত্তি করা হতো। সুতরাং যদি আমরা ইচ্ছে করে প্রমাণকে নির্ভুল বলে মেনে না নিই - কেননা অনেক সময় বন্দীদল ঠিক সময়ে এসে পৌছুত না বা চেম্বারগুলিতে সব সময় বেশী লোক ধরতো না—তবুও আমরা সেই তিরিশ লক্ষতে এসেই পৌঁছুই। ১৩ মাসে মৃতের সংখ্যা এত অসম্ভব বেশী যে এটাকে নিছক পাগলামী বলে মনে হয়।

গ্যাসচেম্বারে মৃত্যুযন্ত্রণা ১০।১৫ মিনিট থাকত। প্রথম যখন গ্যাস-চেম্বার চালু হয় তখন হত্যাকারীরা জানত না কিভাবে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার

করতে হয় সেইজন্য তারা অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করত ফলে বন্দীরা অসম্ভব মৃত্যুযাতনা ভোগ কর:ত এবং প্রায় দু তিন ঘণ্টা বেঁচে থাকত। ঠিক প্রথম দিনেই 'ভ্যাকসান পাম্প আর কমপ্রেসার' ঠিক মতন কাজ না করায় বন্দীরা আট থেকে দশ ঘণ্টা পর্য্যন্তও মৃত্যু-যাতনা ভোগ করেছিল। মৃত্যুযন্ত্রনা দেবার বহু উপায় ছিল। ট্রেবলিঙ্কা 'পাওয়ার' ষ্টেশানের একটা বিরাট সাঁজোয়া গাড়ীর ইঞ্জিন থেকে যে গ্যাস বেরুতো সে গ্যাস কাজে লাগান হ'ত। এই গ্যাসে শতকরা দুই থেকে তিন ভাগ 'কার্বন ডাই অক্সাইড' গ্যাস থাকত এবং এই কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্তের লাল কণিকার সঙ্গে মিশে গিয়ে তৎক্ষণাৎ "কার্বোহিমোগ্লোবিন" নামে এক পদার্থের সৃষ্টি করতো। বাইরের বাতাস থেকে টেনে নেওয়া অক্সিজেনের সঙ্গে যখন রক্তের সংমিশ্রন ঘটে তখন ফুসফুসে যে 'অক্সিহিমোগ্লোবিন' তৈরী হয়, এই 'কার্বোহিমোগ্লোবিন' তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ও স্থায়ী। পনের মিনিটের ভেতর রক্তের 'হিমোগ্লোবিন'—'কার্বন ডাইঅক্সাইডের' সঙ্গে এক হয়ে যায় তখন আর মানুষের দেহে অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারে না। অক্সিজেনের জন্যে মানুষ তখন ছটফট করে। হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যায়, ফুসফুসে অত্যাধিক রক্ত চালিত হয়, কিন্তু 'কার্বন ডাইঅক্সাইড' দ্বারা দুষিত রক্ত বাতাস থেকে কিছুতেই অক্সিজেন নিতে পারে না। আস্তে আস্তে নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার সব লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং জ্ঞান হারিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায়।

ট্রেবলিংকায় যে দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করা হয়েছিল - সেটা প্রায় সব জায়গায়ই প্রচলিত ছিল। কোন বিশেষ একটি হাওয়া নিষ্কাষনের যন্ত্র দ্বারা চেম্বারের ভিতরের হাওয়া টেনে নেওয়া হত। কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্বারা দুষিত হাওয়ায় যে ভাবে মৃত্যু হয় এ স্থলেও ঠিক সেই ভাবেই মৃত্যু হত।

সর্বশেষ প্রণালীটি খুব কম জায়গায়ই ব্যবহার করা হ'ত। উষ্ণ বাষ্প দ্বারা বন্দীদের দগ্ধ করা হ'ত। চেম্বারের ভিতর বাষ্প ঢোকানর জন্য সমস্ত বাতাস নিষ্কাষিত হয়ে যেত এবং তার ফলে মানুষের

দেহ একেবারে অক্সিজেন শূণ্য হয়ে যেত। এছাড়া নানারকম বিষাক্ত পদার্থ পরীক্ষা হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত। একসঙ্গে বহু জীবন নাশ করবার পক্ষে প্রথম দুই প্রণালী সাধারণত ব্যবহার করা হ'ত।

যুগ যুগ ধরে মানুষ জীবনের যে সুখ সম্ভোগ করে আসছে, ট্রেবলিঙ্কার মৃত্যুপুরীর এই পশুরা মানুষকে সে সুখ সম্ভোগ থেকে বিচ্যুত করেছে। সর্বপ্রথমে মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে তাকে তার স্বদেশ থেকে তাড়িয়ে নাম না জানা কোন নির্জনতায় নিয়ে যেত তারপর ক্যাম্পে এদের যা কিছু সম্পদ, চিঠিপত্র, প্রিয়জনের ছবি সবই লুঠ করা হ'ত। তারপরে ক্যাম্পের সীমানার পিছনে তাদের মা, স্ত্রী ও সন্তান ছিনিয়ে নেওয়া হ'ত। অবশেষে বিবস্ত্র মানুষের কাছ থেকে তার বাকীজিনিষ কেড়ে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হ'ত। মানুষ তার নামটুকুও এখানে হারিয়ে ফেলত। এক নীচু ছাদওলা করিডরের ভিতর তাদের ঠেলে দেওয়া হ'ত—আকাশ, বাতাস, সুর্য্য, তারকা-সকল থেকেই তাদের বঞ্চিত করা হ'ত।

মানুষের জীবননাট্যের শেষ দুঃখজনক ঘটনা এবার আরম্ভ হ'ল—মানুষ ট্রেবলিঙ্কার নরকের একেবারে ভিতরে উপস্থিত হয়েছে। কংক্রীটের তৈরী চেম্বারের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। নিখুঁত কম্বিনেশন তালা ও বিরাট বিরাট ছিটকিনি এই দরজাগুলোকে বন্ধ রাখে। এদের ভেঙে ফেলা একেবারেই অসম্ভব। আমাদের ভিতর এমন কি শক্তি আছে যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারবো ঐ হতভাগ্যরা চেম্বারের ভিতর কি অনুভব করছিল বা শেষের মুহূর্তগুলোয় কি অভিজ্ঞতা লাভ করছিল? এটুকু জানা যায় যে চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করত। তারা এত ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে থাকত যে তাদের হাড়গুলো ভেঙে যেত এবং এক ফোঁটাও নিঃশ্বাস নিতে পারত না, সমস্ত দেহে মৃত্যুঘাম ঝরত। তাদের মধ্যে হয়ত কোন বৃদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি বলতে চেষ্টা করত—"আনন্দ কর, এই আমাদের জীবনের শেষ।" কেউ হয়ত ভীষণ অভিশাপ দিয়ে উঠত। এই অভিশাপ কি কোন দিনও ফলবে না? একটি মা তার সন্তানকে একটু জায়গা দেবার জন্যে,

তার শেষ নিঃশ্বাসকে একটু আরাম দেবার জন্যে কত অসম্ভব চেষ্টাই না করেছে। একটি মেয়ের জিভ অসাড় হয়ে যাচ্ছে তখনও সে বলে চলেছে—"ওরা কেন আমায় দম বন্ধ করে মারছে—কেন। কেন।!" মাথা ঘুরতে থাকে কণ্ঠ রোধ হয়ে যায়। সেই মৃত্যু পথ যাত্রীদের ঘোলাটে চোখের সামনে কি তার শৈশবের আনন্দময় দিনগুলি বা তার শেষযাত্রার ছবি ফুটে ওঠে। কারোর চোখের সামনে গার্ডদের পৈশাচিক হাঁসি ভরা মুখখানা ভেসে উঠে, তখন মনে হয় "এই জন্যাই ওরা তখন হাসছিল।" আস্তে আস্তে সংজ্ঞা লোপ পায় এবং সেই সঙ্কটময় মুহূর্ত আসে। না—কেউ কোনদিন গ্যাস চেম্বারের ভিতর কি হ'ত কল্পনা করতে পারবেনা? মৃতদেহগুলি দাঁড়ান অবস্থাতেই আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যেত। অনেক সাক্ষী বলেছে যে ছোট ছোট ছেলেরাই সবচেয়ে বেশীক্ষণ বাঁচত। এইবারে চেম্বারের দরজা খোলার সময় হ'ল। কতকগুলি বন্দীই আবার চেম্বার খালি করতে লাগলো, এদের সঙ্গে গার্ডগুলোর চেঁচানি শোনা যেত। ঘরের মেঝে প্ল্যাটফর্মের দিকে ঢালু থাকায় অনেক দেহ আপনিই গড়িয়ে যেত। যে সব লোক চেম্বার খালি কর়ত তারা আমায় বলেছে মৃতদেহের নাক ও মুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ত। দেহতত্ত্ববিশারদরা এর কারণ বলতে পারবেন। গার্ডরা নিজেদের ভিতর কথা বলাবলি করতে করতে মৃতদেহগুলি ঘুরে ঘুরে দেখত এবং যদি কোন দেহে জীবনের চিহ্ন থাকত তাহ'লে বন্দুকের গুলী চালাত। তারপর মুখ থেকে প্ল্যাটিনাম ও সোনার দাঁতগুলি তুলে নিত। এই দাঁতগুলি মূল্য অনুসারে ভাগ করে বাক্সবন্দী করে জার্মানীতে পাঠান হ'ত। গার্ডরা যেমন ভাবে মেয়েদের মাথার থেকে চুল কেটে নিত, সুবিধা পেলে সেই ভাবেই জীবন্ত স্ত্রী-পুরুষের মুখ থেকে দাঁত তুলে নিতে পারত। কিন্তু মৃতদেহের মুখ থেকে দাঁত তুলে নেওয়া অনেক বেশী সহজ।

মৃতদেহগুলি মালগাড়ীতে ভর্তি করে বড় বড় কবরে নিয়ে যাওয়া হ'ত। এইখানে দেহগুলি সারি সারি শোয়ান হ'ত। গর্তগুলি খোলাই থাকত। গ্যাস চেম্বারের খালি হবার সঙ্গে সঙ্গে যে অফিসারটী

যানবাহন বিভাগে থাকত সে টেলিফোনের মারফৎ একটি আদেশ পেত। অফিসারটি তখন বাঁশী বাজালে কুড়ীটি রেলগাড়ী নিয়ে একটি ইঞ্জিন 'ওবারমৈদান' নামক একটি ষ্টেশানে গিয়ে দাঁড়াত আরও ৩।৪ হাজার লোক স্যুটকেশ, পুঁটলী, খাবারের বাক্স নিয়ে ষ্টেশানে নামত। মায়েরা ছোট শিশুদের কোলেকরে নিয়ে থাকত, একটু বড় ছেলেরা মা বাবার কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখত। সমস্ত চত্বরটায় লক্ষ লক্ষ পায়ের ছাপ, চারিদিকে কেমন একটা ছমছমে ভাব। ষ্টেশানের প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সঙ্গেই রেললাইন কেন শেষ হয়ে গেছে, ঘাসগুলো কেন এমন বিবর্ণ, কেনইবা চারিদিকে তিন মিটার উঁচু তারের বেড়া ?

আগের বারের মৃতদেহগুলি গ্যাস চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যাতে নতুন আর একদল এসে পৌঁছাতে পারে সেই জন্য প্রত্যেক বন্দীদলকে ঠিক নিখুঁত সময়ে এসে ষ্টেশানে পৌঁছাতে হ'ত। কবরগুলি খোলা থাকত এদেরই জন্য।

আবার কিছুক্ষণ বাদে অফিসার বাঁশী বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে আরও কুড়িটা মালগাড়ী আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াত। হাজার হাজার নতুন লোক স্যুটকেস, পুঁটলি ও খাবারের বাক্সনিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামত। তাদের কাছেও এই শত সহস্রের পদদলিত চত্বরটি বীভৎস লাগত।

ক্যাম্পের অধিনায়ক ষ্টেশান মাষ্টারের অপিসে বসে থাকত, তার চারদিকে দলিলপত্র এবং চার্ট থাকত। সে মাঝে মাঝে ট্রেব্‌লিঙ্কা ষ্টেশানে টেলিফোন করত।

সাইডিংএ লাইন থেকে আওয়াজ করতে করতে আরও ৬০টা মালগাড়ী অসংখ্য গার্ড ভর্তি করে নিয়ে পাইন সারির মধ্যে দিয়ে ছুটে চলতো। গার্ডরা বন্দুক এবং মেশিনগানে সজ্জিত থাকত।

বড় বড় খননকারী যন্ত্র সমস্ত দিনরাত ধরে ১০০ মিটার লম্বা এবং কত মিটার যে গভীর গর্ত খনন করত তা'র ঠিকানা নেই। এই খোলা গর্তগুলো অপেক্ষা করে থাকত। কিন্তু তাদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ত না।

"ত্রেবলিংকার নরক"
ভ্যাসিলি গ্রস্‌মান্

আর পাঁচজনের মত সাধারণ একটা নাম ছিল তার স্তেফ্‌কা এবং খাঁটি ওয়ারশর ভাষায় সে কথা বলতো। আমাদের দলের ভেতর ডোরাকাটা জামাপরা লোকগুলো থেকে তাকে আলাদা করার উপায় ছিল, তার রংয়ের শ্যামল আভা আর ঘনকৃষ্ণ আয়ত চক্ষু দুটি। একটু কাছথেকে দেখলে অবশ্য তার লালরংয়ের ত্রিকোন বাহুবন্ধনীর সংখ্যার পাশে "Z" অক্ষরটি নজরে পড়তো, স্তেফকাই ছিল একমাত্র জিপ্‌সী যে লাল বাহুবন্ধনী ধারণ করতো।

যখন অন্যান্য জিপসীদের শবচুল্লীরপথে রেললাইনের অন্য ধারের বিশেষ জিপ্‌সী শিবিরে নিয়ে যাওয়া হল, তখন স্তেফকা থেকে গেল আমাদের কাছে। সেই সময় সে তার জীবনের কাহিনী শোনাতো আমাদের আর তার এই গল্প বলার সাথে একটা গর্ব যে থাকতো না তা নয়।

একদিন প্রত্যুষে সে আর আমাদের সঙ্গে কাজে বেরোল না, কারণ তাকে "প্রবেশ পথে" নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এলে দেখলাম দুচোখে তার অশ্রুর বন্যা। কেঁদে কেঁদে মুখ ফুলে উঠেছে। সে জানতে পেরেছে, যে তার দুটি সন্তান আর বৃদ্ধা শাশুড়ীকে আউশভিৎচ এ নিয়ে এসে জিপসী শিবিরে রাখা হয়েছে।

অসম সাহসিকতার সঙ্গে স্তেফকা তার সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হবার প্রচেষ্টা চালাতে লাগলো। স্বেচ্ছায় সে শিবিরাধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করলো, বিনীতভাবে জার্মানদের কাছে ভিক্ষা চাইতে লাগলো যাযাবর শিবিরে তাকে বদলী করার জন্য। রোজ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যেত কাঁটাতারের বেড়ার দিকে শুধু একবার দুর থেকে সন্তানদের দেখবে বলে, শুধু একবার

তার মনের আকুতি তাদের কানে পৌঁছে দেবে বলে। অবশেষে সত্যিই একদিন জার্মানরা তাকে ডেকে জানালো যে পরেরদিন সে তার সন্তানদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবে। আনন্দে সে যেন উন্মাদ হয়ে গেল। সেই রাত্রে একটা চাদর জড়িয়ে তাকে নাচতে দেখলাম।

পরদিন শেষরাত্রে, নিদ্রাভঙ্গের সংকেতের অনেক আগেই স্তেফকা ছুটলো সেই কাঁটাতারের ঘেরা বেড়ার দিকে। সেই প্রাক্ প্রত্যুষের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে অপর প্রান্তস্থিত যাবার শিবিরগুলি প্রাণহীন ছায়ার মত প্রতিভাত। স্তেফকা উচ্ছ্বলিত কণ্ঠে অদ্ভুত ভাষায় চীৎকার করে উঠলো। গলা শুনে মনে হয় আনন্দ আর চেপে রাখতে পারছে না। বিজয়োল্লাসের প্রত্যুত্তরে কিন্তু সে পেল শুধু নীরবতা।

প্রচুর প্রতিবন্ধকের মধ্যে স্তেফকার চক্ষুদুটি অনুসন্ধান করতে লাগলো তার বৃদ্ধা শাশুড়ী আর তার প্রাণের টুকরো শিশু সন্তান দুটিকে। কিন্তু ব্যর্থ হল তার এই অনুসন্ধান।

অন্যান্য শিবিরগুলি ততক্ষণে গতানুগতিক কর্ম চাঞ্চল্যে মুখর হয়ে উঠেছে। মেয়েরা এগিয়ে চলেছে বালতি হাতে কল ঘরের দিকে। তাদের পরস্পরের গুঞ্জন ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে চড়ছে। কিন্তু স্তেফকার লক্ষ্যস্থল ওই থাকবার শিবিরগুলি। স্তেফ্‌কা নীরব নিস্পন্দ হয়েই রইল। কোনো সাড়া শব্দই আর পাওয়া গেল না।

সন্দেহ দোলায় দুলে উঠলো ওর মন, গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো ভীতি বিহ্বল ধ্বনি। ভোরের নীল আলো তখন রাত্রির কালো অন্ধকারের বুকে ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে। বাঁদিকে শবচুল্লির আগুন ঘনধূম্রজাল ভেদ্ করে লেলিহান শিখা মেলেছে।

গভীর নৈরাশ্যে আরেকবার স্তেফ্‌কা চীৎকার করল। শিবিরের মহিলা বিভাগে খবরটা তখন ছড়িয়ে পড়েছে যে, জীপসী শিবিরের সমস্ত অধিবাসীকে গতরাত্রেই গ্যাস প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে।

* * * *

টাইফয়েড যখন মহামারী আকারে দেখা দিত, বা বহিরাগত বন্দী

চালানের সঙ্গে যখন কোনো সংক্রামক রোগের বীজাণু আমদানি হত, তখন যেন শিবিরের বাতাসে জন্ম নিত উন্মত্ততার বীজ।

স্বগৃহ ও স্বদেশের চিন্তায় অনেকেই বিশেষ করে রুশ মহিলারা প্রায়ই মানসিক স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলতো। তারা যখন আউশভিৎচ-এর দিগন্ত প্রসারিত পর্বতশ্রেণী আর আকাশের চঞ্চল মেঘের দিকে তাকাতো তখন যেন আরো বেশি অস্থির হয়ে পড়তো। তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যেত এই অদ্ভুত অসহায় পরিস্থিতিতে।

এই সব মেয়েদের ঝটিকা বাহিনীর, "বাছাইকারি"দের শ্যেনচক্ষুর আড়ালে রাখা মোটেই সহজসাধ্য ছিলনা। ওয়ারশর মেয়ে ইনকা ছিল ঐ শিবিরের প্রধান। সে তাদের অনেককে লুকিয়ে রাখতো। আর তাদের উন্মত্ততার সাময়িক বিরাম কালে তারা রুগ্ন সহবন্দীনিদের সাহায্য করতো।

কয়েকদিন পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে জার্মান কর্তৃপক্ষের হুকুমে ছ'নম্বর ব্যারাকের একটি অংশ বিকৃতমস্তিষ্কদের জন্য আলাদা করে দেওয়া হল। এই ব্লকে ওরা প্রায় দশ বারো জন একত্র থাকতো—ঘরটার মধ্যে ওরা জড়াজড়ি করে কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে থাকতো খাঁচায় আটকানো জানোয়ারের মত। বন্য জানোয়ারের মতই বীভৎস হয়ে উঠেছিল তারা-সেই রকমই লোলুপ আর সেই রকমই অর্থহীন ভাষায় চীৎকার করতো। বিকেলের দিকে ওরা অনেকটা শান্ত হয়ে আসতো।

মহিলা ডাক্তারেরা আমাদের বলেছিল যে মাত্র একটি কঠিন রোগগ্রস্তা মেয়ে ছাড়া আর প্রত্যেকটি উন্মাদিনীকে ভালো করে তোলা যায়। কিন্তু ওষুধ কোথায়? অবশেষে জার্মানরা ওদের 'ওষুধ' খুঁজে পেল। একসপ্তাহ পরে, ছ নম্বর ব্যারাকের "পাগলা" বিভাগে আর একজনও রইলনা।

ততদিনে রুগীদের গ্যাস দিয়ে মারা হয়ে গেছে।

রোজনামচাগুলি থেকে উদ্ধৃত

অভিযুক্ত—[হাইনৎস্ স্তাল্প] আমি যখন পোলম্যান ষ্ট্রীটের দর্জিশালায় ছিলাম, তখন একদিন সকাল বেলায় দুটি লরি সেখানে আসে এবং যে সব বন্দী "মাইদানেকে" কাজ করতো তাদের বাচ্ছা-গুলোকে তাতে চাপান হয়। বাচ্ছাদের বাপমাকে বলা হল যে, তাদের ছেলেমেয়েদের ভালভাবে প্রতিপালনের জন্য অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাচ্ছাদের জামা কাপড় খুলে নেওয়া হয়েছিল।

উকিল—কতগুলি বাচ্ছা ছিল, আর তাদের বয়স কত ছিল ?

অভিযুক্ত—একবছরেরও কম কিছু বাচ্চা ছিল, আবার তের চৌদ্দ বছরেরও কয়েকজন ছিল।

উকিল—বাচ্ছাদের কি ভাবে গ্যাস-কুঠুরিতে ফেলা হল ?

অভিযুক্ত—লরি সোজা গ্যাসকুঠুরিতে উপস্থিত হল। সেখানে "এস, ডি,"র লোকেরা উপস্থিত ছিল। তারা বাচ্ছাদের এক নম্বর কম্পাউণ্ডের দিকে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিল। ওই কম্পাউণ্ডে মেয়েরা থাকতো, তাদের দশজনকে কম্পাউণ্ড থেকে নিয়ে আসা হ'ল এবং তাদের দিয়ে ওই বাচ্ছাদের জামাকাপড় খোলাতে বাধ্য করা হল। তারপর বাচ্ছাদের গ্যাস কুঠুরিতে নিয়ে যেতে হুকুম দেওয়া হল। তাদের নানান রকম গল্প বলা হল, যে তারা ওখানে কত আরামে থাকবে, কত আনন্দে খেলা করবে। দু' একটা বাচ্ছা কান্নাকাটি করেছিল, কিন্তু তারা জানতোনা, যে তখুনি তাদের মরতে হবে, মৃত্যুর দুয়ারে তারা উপস্থিত। তারা গ্যাস কুঠুরিতে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একজন "এস, ডি,"

ভেতরে যাওয়া আসার একমাত্র দরজাটি বন্ধ করে দিল। তারপর বাইরে থেকে একটা চৌকো গর্তের ভেতর দিয়ে গ্যাস ছাড়া সুরু হ'ল। আমি প্রায়ই গ্যাসে মৃত বন্দীদের শবদেহ দেখেছি, তাদের ফুস্‌ফুস্‌ দুটো স্বভাবতই নষ্ট হয়ে যেত এবং রক্ত বেরোত, দিন দুই পর শবদেহে একটা সবুজ আভা দেখা যেত। গ্যাস কুঠুরিতে মৃত আগেকার শবদেহ গুলিকে না সরিয়ে সেই শবদেহাচ্ছাদিত কুঠুরিতেই নতুন বন্দীদলকে ঢুকতে বাধ্য করা হত। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় দল হিসাবে পরপর কুঠুরিতে ঢুকতে বাধ্য করা হত। প্রত্যেক দলে থাকতো পঞ্চাশ জন করে। যতক্ষণ না মৃতের সংখ্যা তিন শ পুর্ণ হ'ত, ততক্ষণ কিছুই গ্যাস কুঠুরি থেকে সরিয়ে ফেলা হত না।

উকিল—আচ্ছা এ কথা কি সত্যি, "সাইক্লোন" গ্যাসের ক্রিয়ায় মৃতদেহ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হত, এবং মলমূত্রাদি, শারিরীক ক্লেদ নির্গত হত?

অভিযুক্ত—হ্যাঁ।

উকিল—তাহলে প্রথম দলের পর যারা গ্যাসকুঠুরিতে যেতে বাধ্য হত, তারা ওই ক্লেদাক্ত শবদেহের উপরই যেত?

অভিযুক্ত—হ্যাঁ।

উকিল—এ কথা কি সত্যি, যে, পরবর্তী দলকে নিজেদের জায়গা করে নেবার জন্য, নিজেদের হাতেই পুর্ববর্তী শবদেহগুলিকে সরিয়ে নিতে হত?

অভিযুক্ত—কুঠুরিতে প্রচুর জায়গা ছিল।

উকিল—কিন্তু, যদি গ্যাসকুঠুরির স্থানাতিরিক্ত শবদেহে কুঠুরির ছাদ পর্য্যন্ত বোঝাই হয়ে যেত, তখন এমনও তো প্রায়ই হয়েছে যে পরবর্তী হতভাগ্যদের নিজ হাতে শবদেহ সরিয়ে কুঠুরিতে স্থান করে নিতে হয়েছে?

অভিযুক্ত—হ্যাঁ, সে রকম হয়েছে।

উকিল—এবং এও হয়েছে, যে বাপ আর ছেলে, মা আর মেয়েকে আলাদা করা হয়েছে, এবং কাকেও প্রথম দলে, কাকেও দ্বিতীয় দলে পাঠানো

হয়েছে। আর যার ফলে মাকে নিজের মৃত্যুর ঠাঁই করে নেবার জন্য, নিজের হাতে নিজের মেয়ে বা ছেলের শবদেহ সরিয়ে নিতে হয়েছে?

অভিযুক্ত—হ্যাঁ। এও ঘটেছে। তবে তারা একসঙ্গেও ভেতরে যেতে পারতো। এতে বাধা ছিল না।

'মাইদানেক' বই থেকে

বারবারা'র অবৈধ সন্তান, ম্যাক্সমিলিয়ান গ্রাব্‌নারের জন্ম ভিয়েনা সহরে ১৯০৫ সালের ২রা অক্টোবর। ধর্মে রোমান ক্যাথলিক। জাতিতে এবং নাগরিক হিসাবে অষ্ট্রিয়ান্। ফৌজদারী পুলিশের অফিসার ছিল। বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, বিবাহিত, তিনটি সন্তানের জনক। ৮ই আগষ্ট ১৯৩২ সাল থেকে, নাৎসী পার্টির সভ্য। সদস্য কার্ড নম্বর ১২১৪৩৭, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ সাল থেকে ঝটিকা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। শেষের দিকে নন্ কমিসন্ড অফিসারের পদে উন্নীত। ১৯৪৪ সালের ১২ই জুলাই পোল্যাণ্ড প্রজাতন্ত্রের ভূমিতে গ্রেফ্‌তার হয়।

ঝটিকা বাহিনীর ননকমিসন্‌ড অফিসার ম্যাক্সমিলিয়ান গ্রাব্‌নার ছিল আউশ্‌ভিৎস্‌ শিবিরের পরিচালক পরিষদের অন্যতম কর্মকর্তা। শিবিরের গোড়া পত্তনের সময় থেকে শুরু করে ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত গ্রাব্‌নার রাজনৈতিক বিভাগায় কর্তা হিসাবে কাজ করেছিল। তা'র দফ্‌তরের মহিমাতেই বন্দীদের ভাগ্য এবং জীবন নিয়ন্ত্রিত হ'ত। পুলিশ বিভাগে থাকা কালেই সে পেশাগত শিক্ষা শেষ করে এসেছিল। পার্টির সদস্য হওয়ার দরুণ এবং ঝটিকা বাহিনীতে তার নানা কার্যকলাপের দ্বারা সে তার উপরওয়ালাদের বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছিল।

তার নিজের জবানবন্দী অনুসারে সে ১৯০৫ সালে ভিয়েনায় অবিবাহিতা গৃহ পরিচারিকা বারবারা গ্রাব্‌নারের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। একজন বন-রক্ষকের পরিবারে লালিত পালিত হয়ে পরে মেষ চরাবার কাজ পায়। অবশ্য তাকে অন্যান্য কাজও করতে হত, কাঠও কাটতে হত। ১৯২৭ সালে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে অষ্ট্রিয়ান সৈন্য বিভাগে যোগদান করে। সেখানে

তিন বছর কাজ করা কালে বিভাগীয় বিদ্যালয়ে তার শিক্ষা সমাপ্ত করে। তারপর সে সশস্ত্র পুলিশবাহিনীতে যোগদান করে। সেখান থেকে ১৯৩৫ সালে ভিয়েনাতে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে বদলী হয়। এবং অষ্ট্রিয়ার "রাইখ্ ভুক্তির" পর জার্মান পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করে। এখানে সে কয়েকজনকে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে গ্রেফ্তারের আয়োজন করেছিল। ১৯৩৯ সালে জার্মান সৈন্যদলে বদলী হয়। সেখান থেকে পোল্যাণ্ডের যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রেরিত হয়। সেই বছরই নভেম্বর মাসে অধিকৃত এলাকার প্রাদেশিক পুলিশের কেন্দ্রীয় বিভাগ কর্ত্তৃক কাতোভিচ্' এ পুলিশের ফৌজদারী বিভাগের সেক্রেটারি হিসাবে নিযুক্ত হয়। পরে ক্রোলেভ্স্কাহুতা এবং রিব্নিক্ সহরেও কাজ করে। সেখান থেকে ১৯৪০ সালের জুন মাসে নিম্নবিভাগীয় নন্-কমিসন্ড অফিসারের পদে উন্নীত হয় এবং রাজনৈতিক বিভাগের প্রধানরূপে আউশ্ভিৎচ্ শিবিরে বদলী হয়ে আসে।

পোলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে জবানবন্দী দেবার সময়ে সে স্বীকার করে যে ১৯৩৯ সালে চাকরী খোয়াবার ভয়েই সে নাৎসীপার্টিতে (জাতীয় সমাজতন্ত্রী জার্মান শ্রমিক পার্টি) যোগদান করে। কিন্তু ঝটিকা বাহিনীতে যোগদানের কথা সে অস্বীকার করে। ঝটিকা বাহিনীর নন-কমিশন্ড্ অফিসারের পোষাক সে কেন পরতো জিগ্যেস করায়, সে বলে যে বিশেষ অনুমতি পেয়েই সে ওই পোষাক পরতো। কিন্তু সরকারী নথি বলে ১৯৩৯ সালের ২০শে মার্চ ভিয়েনায় যা লিপিবদ্ধ হয়েছিল তাতে একথা পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ হয় যে, গ্রাবনার ১৯৩২ সালের আগষ্ট মাস থেকে নাৎসীদলের সভ্য ছিল। তার সভ্যপদ সংখ্যা ছিল ১২১৪১৩৭ এবং ১৯৩৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ঝটিকাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আউশভিৎচ শিবিরে প্রচলিত সাংগঠনিক আইন অনুযায়ী শিবির পরিচালক-পরিষদের ঠিক পরেই স্থান ছিল রাজনৈতিক বিভাগের, তথাকথিত পুলিশ বন্দীদের সম্পর্কে শুধু অন্য ব্যবস্থা ছিল। তারা কাতোভিচ-এর প্রাদেশিক পুলিশের কেন্দ্রীয় বিভাগ কর্তৃক বন্দী হয়েছিল, এবং তাদের খাস শিবিরের ১১ নম্বর ব্যারাকে রাখা হয়েছিল। ১১ নম্বর ব্যারাকটিকে মিসলোভিচ শিবিরের শাখাহিসাবে গণ্য করা হত। এই বন্দীদের রাজনৈতিক বিভাগটি কাতোভিচ'এর গেস্টাপো বিভাগের অধীন। এদের সঙ্গে শিবিরাধ্যক্ষের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

যাইহোক গ্রাবনার নিজের ব্যক্তিত্ব ও গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কের সুযোগ যথেষ্ট নিয়েছিল। শিবিরাধ্যক্ষ হেস্ রাজনৈতিক বিভাগ সম্পর্কে মোটেই মাথা ঘামাতো না। আর সেই সুযোগে গ্রাবনার সম্পূর্ণ স্বাধীন

ভাবে নিজের ইচ্ছামত বন্দীদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রন করতো। শিবিরাধ্যক্ষের অনুমোদনের ব্যাপারটা নিতান্তই একটা বাহ্য অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। তাছাড়া বহু ব্যাপারে এই সামান্য আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের বালাইও গ্রাবনার উড়িয়ে দিয়েছিল। বহু ক্ষেত্রে সরাসরি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতো এবং চিঠিপত্রাদিতে সহকারী "শিবিরাধ্যক্ষ" বা "শিবিরাধ্যক্ষের পক্ষথেকে" স্বাক্ষর করে এই ধরণের কাজ হাসিল করতো।

পূর্বতন শিবিরবাসী বন্দী এবং ঝটিকা বাহিনীর লোকেদের জবানবন্দীতে এ কথা পরিস্ফুট যে, গ্রাব্নার যে শুধু কর্তৃপক্ষের আদেশেই বন্দী বিনাশ করার ব্যাপারে যত্নশীল ছিল তা নয়। ভারপ্রাপ্ত কর্তাদের অজ্ঞাতসারে নিজের খেয়ালখুসীমত শিবিরের ভেতর যথেষ্ট সংহার-লীলা চালিয়েছে।

সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় শিবির পরিচালনা-পরিষদ যে সব বন্দীদের সংহারার্থে আউশ্‌ভিৎচ্‌ শিবিরে পাঠাতো, তাদের বাছাই করার জন্য গ্রাব্নার নিজে যেত বা ঝটিকা বাহিনীর কোনো তাঁবেদারকে পাঠাতো। এ সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে যে, ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে আগত ওই বন্দীদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক কয়েকজন অত্যন্ত স্বাস্থ্যবানকে শুধু শিবিরে কাজকর্ম্ম করার জন্য শিবিরে পাঠানো হত। আর বাকি সব সোজা পাঠানো হত গ্যাস কুঠুরিতে। সেখানে শ্বাসরুদ্ধকর সেই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের পর, তাদের চুল কামানো, এবং সোনার দাঁত থাকলে অপসারণের পর সেই সব গাদাবন্দী মৃতদেহ শবচুল্লিতে পাঠানো হত দাহের জন্য।

গ্যাস কুঠুরির জন্য বন্দী সরবরাহের, শবচুল্লিতে ঠিকমত দাহের, এবং মৃত বা জীবিত দেহ থেকে স্বর্ণ সংগ্রহের ভার ছিল রাজনৈতিক বিভাগের উপর। কিন্তু শুধু এই কারণেই যে গ্রাব্নার সেখানে উপস্থিত হয়ে বাছাইয়ের কাজে অংশ গ্রহন করতো তা নয়। সে নিজে হত্যাকাণ্ডের সময় গ্যাস প্রয়োগ কালে নির্দেশ দিতো এবং কড়া নজর রাখতো যাতে প্রেরিত সমস্ত বন্দী গ্যাস প্রয়োগে নিহত

হয়, যাতে তাড়াতাড়ি শৃঙ্খলার সঙ্গে শবদেহগুলি চুল্লিতে পোড়ানো হয়।

প্রত্যেকবার এই ভাবে এক এক গাড়ী বন্দী নিহত করার পর সে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে যে রিপোর্ট পাঠাতো তাতে সে ক'জন বন্দী কর্মক্ষম তার সংখ্যা জানাতো আর অন্যান্যদের বেলায় লিখতো "বিশেষ ব্যবস্থা,"—যার প্রকৃত অর্থ হল বন্দীদের গ্যাস প্রয়োগে নৃশংস ভাবে হত্যা করা।

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হুকুমে ওই হত্যাকাণ্ডে যোগদান করা ছাড়াও নিজের উদ্যোগে ব্যাপক নারকীয় হত্যালীলার দ্বারা সমগ্র শিবিরটি যাতে যথার্থ মৃত্যুশিবিরে পর্য্যবসিত হয়, সে চেষ্টার কোন ত্রুটিই গ্রাব্‌নার করেনি।

শিবিরাধ্যক্ষ হেস্‌ ঝটিকা বাহিনীর অধ্যক্ষ আউমাইর ও প্রধান নারী পর্য্যবেক্ষিকা মান্দেলের রক্ষিত কাগজ পত্রে জানা যায়, যে যত কম সময়ের ব্যবধানে শিবিরে বন্দী "বাছাই" এবং অক্ষম ও রুগ্নদের গ্যাস কুঠুরিতে পাঠানো যায় তারজন্য গ্রাব্‌নার রীতিমত চাপ দিত। সে শিবিরের চিকিৎসকদেরও প্রভাবান্বিত করেছিল যাতে চিকিৎসকরা বেশি সংখ্যক বন্দী হাসপাতালে চেয়ে পাঠায়, এবং তারা যাতে গ্যাস 'ফেনল' বা অন্য কোন বিষাক্ত ইঞ্জেকসান দ্বারা ওদের নিকেশ করে দেয়। তার আচরণে বোঝা যেত যে, তার মতের বিরোধী বা অনিচ্ছুক সহকর্মিদেরও সে ছেড়ে কথা বলতো না।

কাজেই এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যে, এই সব খুনী চিকিৎসক ও কর্মচারীরা ওই পারিপার্শ্বিকতায়, পরস্পরে প্রতিযোগিতা করে, হাজারে হাজারে বন্দীকে গ্যাস প্রয়োগে বা খাস্‌ হাসপাতালেই পৈশাচিক উল্লাসে হত্যা করেছে।

সমগ্র বন্দীরা নিয়ত "বাছায়ে"র বিভীষিকার মধ্যে বাস করতো, এবং কঠিন অসুখ হলেও "মৃত্যুর পাঁচ মিনিট আগে পর্যন্ত" অর্থাৎ রোগাক্রমণে যতক্ষণ নিজস্ব কোনো ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকতো ততক্ষণ হাসপাতালকে এড়িয়ে চলার চেষ্টাই করতো।

গ্রাব্‌নারের নিজস্ব উদ্ভাবিত বন্দীবিনাশ পদ্ধতির আর একটি ছিল ব্যাপকভাবে গুলি করে হত্যা করা। যখন বার্কেনাউতে গ্যাসকুঠুরি তৈরী হয়নি তখন এ ব্যাপারটা ঘন ঘন চলতো, কিন্তু কুঠুরি তৈরী হবার পরও ব্যাপকভাবে গুলি করে হত্যা করা একেবারে বন্ধ হয়নি। আগে ঘন ঘন চলতো, তার কারণ শিবিরে প্রত্যহই ক্রমবর্দ্ধিত সংখ্যায় বন্দী চালান আসছিল আর স্বভাবতই শিবিরে স্থানাভাব হচ্ছিল। পুরানো বন্দীদের ব্যাপকভাবে গুলি করে হত্যা করে নতুনদের স্থান করে দেওয়াই উচিত। গ্রাব্‌নার যুক্তিযুক্ত পন্থা হিসাবে এটাই গ্রহণ করেছিল।

১৯৪৪ সালে শিবির কর্ত্তৃপক্ষ এ সম্পর্কিত কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলায় এবং কিছু সরিয়ে ফেলার দরুণ, গ্রাব্‌নারের আদেশে ঠিক কতজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, তার সঠিক হিসাব পাওয়া সম্ভব নয়।

রাজনৈতিক বিভাগ সেই সব বন্দীদের ১১নং ব্যারাকে রাখতো যাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। সেই কারণে ওই ব্যারাকটি সর্বদাই স্থানাতিরিক্ত বন্দীদের দ্বারা ঠাসা থাকতো। তাই ব্যারাকটিকে আংশিক ভাবে খালি করার তাগিদে দশ পনেরো দিন অন্তর অন্তর একটা করে কমিশন বসতো। এই কমিশন গঠিত হ'তো রাজনৈতিক বিভাগীয় প্রধান, তাঁ'র কয়েকজন সহকারী এবং শিবিরস্থ ঝটিকা বাহিনীর অধ্যক্ষকে নিয়ে। কে কোন অপরাধে অপরাধী এই বিষয় যৎসামান্য জিজ্ঞাসাবাদের পর, কমিশন স্থির করতো কাদের ওই বিশেষ ব্যারাক থেকে খালাস করা হবে, কাদের ওইখানেই রাখা হবে এবং কাদের অবিলম্বে দণ্ড দেওয়া হবে। শেষোক্ত-দের সরাসরি ব্যারাকের উন্মুক্ত প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে একের পর এক গুলি করে হত্যা করা হত।

এইভাবে অন্যায় অপকর্মের প্রমাণ নির্ম্মূল করার খাতিরে "বিশেষ কামদল" অর্থাৎ যারা বার্কেনাউতে গ্যাসকুঠুরিতে হত্যাকরা, শবচুল্লীতে দাহ করা ইত্যাদি কার্যে নিযুক্ত ছিল তাদেরও মাঝে মাঝে দলকে দল গ্যাস প্রয়োগে হত্যা করার জন্যে গ্রাব্‌নারই দায়ী।

গ্রাব্‌নারের আরেক ধরণের পৈশাচিক কাজ ছিল, জরুরী পুলিশ ট্রাইবুনালে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা। মাসে অন্তত একবার এই ট্রাইবুনালের

অধিবেশন বসতো, আর এতে পুলিশ বিভাগীয় অপরাধীদের বিচার হ'ত। হেসের জবানবন্দী অনুযায়ী ওই ট্রাইবুনাল ছিল বিচারের নিছক প্রহসন। ওই ট্রাইবুনালের সদস্যরা সেইসব পুলিশের লোক যারা বিচার্য মামলার তদন্ত করছে এবং আসামী ও সাক্ষীদের উৎপীড়নের সাহায্যে স্বীকারোক্তি আদায় করছে। এ ছাড়াও সমগ্রভাবে বিচারটাই ছিল একটা তামাসা। তারা পরের পর অভিযোগের রিপোর্ট শুনে অপরাধিদের ডেকে জিগ্যেস করতো দোষ স্বীকার করে কিনা? তারপর দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হ'ত, ওদের নিয়মানুযায়ী দণ্ডটা প্রাণদণ্ডই হত। আর এর জন্য কোনো সাক্ষিসাবুদের প্রয়োজন হত না। হেস্ স্পষ্টই স্বীকার করেছে যে, আগে থেকেই দণ্ডাজ্ঞা ঠিক করে রাখা হ'ত, ট্রাইবুনালের রায়দানটা ছিল একটা আনুষ্ঠানিক পর্ব মাত্র। কারণ ট্রাইবুনাল আগে থেকেই ঠিক করে আস্তো কি ধরণের দণ্ড দেওয়া হবে।

শিবির কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পদ্ধতির মূল লক্ষ্য ছিল,মানুষকে নীতিভ্রষ্ট করা, তাদের মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা থেকে বঞ্চিত করা, তাদের পাশবিক প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলে একদল পশুতে পরিণত করা, যাতে তারা শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে পরস্পরে কামড়াকামড়ি করে, যাতে তারা পুরোপুরি "মাৎস্যন্যায়ে" ডুবে থাকে। যাতে মানুষ তার যথাসর্বস্ব ঐ পরিচালনা পদ্ধতির কাছে বিকিয়ে দেয়, তাই ছিল গ্রাবনার আর তার রাজনৈতিক বিভাগের উদ্দেশ্য। গ্রাবনার বন্দীদের ভিতর নিপুণ ভাবে তার গুপ্তচরের জাল বিছিয়ে রেখেছিল। সেই সব গুপ্তচরেরা মৃত্যুভয়ে বা কম শাস্তি ভোগের আশায় সহ বন্দীদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি চালাতো। আর প্রত্যেকটি ব্যাপার রাজনৈতিক বিভাগের গোচরে আনতো। রাজনৈতিক বিভাগও অবিলম্বে হিংসার বশবর্তী হয়ে কঠিন যন্ত্রনা দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করে উত্তরদাতা বন্দীকে গুলি করে হত্যা করতো।

গ্রাব্নারকে বন্দীরা বলতো সবচেয়ে রক্তপিপাসু জহ্লাদ। এতেই তার চারিত্রিক বিশেষত্ব পরিস্ফুট। এর চরিত্রের আরো একটা দিক বলা উচিত, নইলে একে পুরোপুরি বোঝা যাবেনা। গ্রাব্নার নিজেও বন্দীদের জিনিসপত্র আত্মসাৎ করার ব্যাপারে অগ্রণী ছিল। এধরণের আত্মসাৎ করার

দণ্ড ছিল মৃত্যু। তবুও গ্রাবনার পরম নিশ্চিন্তে তার ঘরে জড়ো করত বন্দীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া বাক্স বাক্স কোট আর অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী। পরে সেই সব বাক্স গ্রাব্‌নারের আদেশে বন্দী ফেলিক্‌স্‌-মুলুক ভিয়েনায় পাঠিয়ে দিত।

গ্রাব্‌নার এই প্রশ্নোত্তর কালে মোটেও দোষ স্বীকার করেনি। সে বলে যে, "বন্দীশিবিরে আমার কার্যকলাপের দরুণ আমি মোটেই নিজেকে অপরাধী মনে করি না। আমার বিবেচনায় আমি সেখানে কোনো বে-আইনী কাজ করিনি বলেই আমার বিশ্বাস। যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ ক'রে সে বলে যে "শিবিরের সমস্তই তখন বে-আইনি ছিল" যদিও সে এর বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়াই করেছে, তবুও কিছু করতে পারেনি কারণ "সমগ্র শিবিরটি হেশ আর তার দলবলের জুলুমবাজির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল।"

—"বিচার থেকে উদ্ধৃতি"

॥ নানারকমের (রোলকল) নামডাকা ॥

ক্যাম্প-অধিকর্তারা যখন তখন বুঝতে চাইত জীবিতের সংখ্যা হাতে কত রইল। ১৯৪২ সালের শরৎকালে বার্কেনাউতে মেয়েদের বিভাগে একদিন 'সকলকে জড়ো করে' নামডাকা হ'ল। ক্যাম্পের বাইরে একটা মাঠে সারাটা রবিবার এই চল্‌ল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা, এ কাজ শেষ হ'বার পর, শতশত দুর্বল বন্দীদের মধ্যে যারা অনশন এবং রোগের ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল তা'দের ক্যাম্পে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হল। ঐসঙ্গে দশটারও বেশী মৃতদেহও চলে এসেছিল। ক্যাম্পের জীবনে জঘণ্যতম ঐরকম দিনটির কয়েকমাস পরেও "সাধারণ রোলকল" কথাটা সকলের মনে ত্রাসের সঞ্চার করত।

সেভেরিনা শামাগালেভকা

* * * *

কেউ বলেনা অসুখ করেছে; বল্লেই মৃত্যু অনিবার্য। তাই প্রাত্যহিক নাম ডাকার সময় প্রত্যেকের জিভ্ দেখার জন্য "ইউ" একটা পুলিশ পাঠাত। সাদা জিভ্ থাকলেই হাসপাতাল। সত্যি সত্যি অসুস্থ হোক্ বা জিভ্ অপরিষ্কার থাকুক না কেন আধকুড়ি লোককে আগে ত চালান্ করা হোক্। কিন্তু এড়াবার ফন্দীও সুরু হ'ল। নামডাকার আগে বন্দীরা শক্ত রুটির মাথা চিবিয়ে চিবিয়ে জিভ্ লালকরে ফেলত। ফলে জিভ্ পরীক্ষার পর দেখা যেত সকলেই ভাল আছে।

"মৃত্যু বিগ্রেড"—ভিয়েলশকিয়ের

সন্ধ্যা ৬টা। সন্ধ্যাবেলাকার নামডাকার সময়। আবার অ্যাটেনশান্ হয়ে দাঁড়ানো—গুণতি করা—রিপোর্ট। সাধারণতঃ এই রকমের নাম ডাকার সময় আমাদের একঘণ্টা বা দু'ঘণ্টা ঠায় অ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়াতে হ'ত। সেই সময় কিছু কিছু বন্দীকে শাস্তি পাবার জন্য ডাকা হ'ত। এরা হয়ত সারাদিনে কিছু গাফিলতি করেছে অথবা পুরো সামাল্ ছিল না। এদের উলঙ্গ করে সকলের সামনে ২৫ থেকে ৫০ ঘা বেত মারা হ'ত। ওখানে বেশীদিন যা'রা ছিল তা'রা আমাদের বলেছে যে শীতকালে তিন্-চার ঘণ্টা বন্দীদের একনাগাড়ে "হুঁসিয়ার" করে দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ত। অনেকেই জমে মরে যেত। তখন আবার মড়া বইবার হ্যাঙ্গাম।

"মাইদানেক থেকে পালালাম"—ইয়ার্সিপফেকের।

*   *   *   *

রাত ২টায় বিছানা থেকে উঠতে হ'ত, কাজে যেতে হ'ত ভোর ৬টা। না যাওয়া অবধি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত সকলকে।

২০৩ নং সাক্ষ্যদান—ই. মুনৎজার (স্তালোভা ভোলা)

*   *   *   *

উঠোন-পানে ছুটে সারবন্দী সকলে দাঁড়ায়; নামডাকা সুরু হ'ল। লাইন সোজাকরবার জন্য এস, এস, রক্ষীরা লোকজনের দিকে আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করল, এদিক সেদিক যে করেছে সে-ই সঙ্গে সঙ্গে খুন। কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলা আবার নামডাকা। আবার ঐ এক ঘটনা। রোজ খুন আর জখম্।

"মৃত্যুশিবির"—বিয়েলেকী

প্রত্যেককে নামডাকার সময় থাকতে হ'বে···মৃতদেরও। বন্দীদের একদম্ সামনে মড়াগুলোকে সাজিয়ে রাখা হ'ত। ঘণ্টাখানেক আগেও

যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি তাদের শবদেহ জমাট রক্তের পাহাড়ের মধ্যে পড়ে আছে।

"বন্দীরা টুপিখুলেফেল"—তাদিয়ুশ অস্রোভস্কি

রোজ তিনবার নামডাকা; সকালে, দুপুরে আর সন্ধ্যায়। শেষরাত্রি সাড়ে তিনটায় ব্যারাকের সামনে পাঁচজন করে সারবেঁধে দাঁড়াতাম, গোনা হ'ত। ব্লকের কর্তা, ক্যাম্পের-মুরুব্বিকে জানাত ক'জন হ'ল। ক্যাম্পের মুরুব্বি আবার গুণত। ঘণ্টাকয়েক ঠায় দাঁড়াতে হ'ত, সব সময় ভয় প্রহারের। একদম সোজা লাইন হওয়া চাই। আমাদের লাইন সোজা করবার সময় হাতদিয়ে, লাঠি দিয়ে, মুগুর দিয়ে আমাদের পেটাত।

গ্রস্রসেন ক্যাম্পের রোজেন্‌বাউম্‌'এর সাক্ষ্য

ডোরা কাটা কয়েদীর পোষাকে আমরা হচ্ছি গোণাগুনতি একপাল মানুষ যাঁদের নম্বর রাতেই হোক্ আর দিনেই হোক্ সমস্ত নামডাকার সময় মিলতেই হ'বে। শেষরাত্রি তিনটের বাঁশী আমাদের মনোরম ঘুমের রাজ্য থেকে টেনে তুলে ভোর ৬টার নামডাকার সময় হাজির করত। হাঁটু আর কোমর ব্যথা করত। পোষাক বা ভঙ্গীতে একটু এদিক্ ওদিক্ হলেই নির্দয় বেতের সপাং সপাং ঘা; তা'তে খুনও হয়। বেতগুলো ইয়া মোটা পেতল্‌বাঁধানো চামড়া।

* *

মাইদানেকে একবার ৩২ঘণ্টা ধরে নামডাকা চলল। ৪৮০জন লোক দাঁড়িয়েছিল; নামডাকা শেষ হ'তে মাত্র ৩৪০জন জীবিত অবস্থায় ১০নং ব্যারাকে ফিরল।

* * *

প্রত্যেকটি বন্দীকে নামডাকার সময় থাকতে হবে। বিশ্রাম-ব্যারাক বা হাসপাতালে যা'রা আছে তা'দেরই কেবল রেহাই। ওখানে যা'রা থাকে একেবারে মরণাপন্ন হ'তেই হ'বে। তাই অনেক সাংঘাতিক অসুস্থ বন্দীও

যে কোনো প্রকারে চত্বরে নামডাকায় হাজির হ'ত। তা'দের কয়েকজনকে ধরাধরি করে নিয়ে যেতে হ'ত। চত্বরে দেখা যেত অদ্ভুত, বা, বীভৎস দৃশ্য। সহ-বন্দীরা অত্যন্ত অসুস্থদের বহন করে আনত; চারজন করে একজন অসুস্থ বন্দীকে চ্যাংদোলা করে আনত। রুগীর পক্ষে কি আরামের সেই যাত্রা! কখনও বা কম্বলে করে আনা হ'ত। তখন যদি কোনো প্রকারে সে দাঁড়াতে পারত তা'কে লাইনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ত। আর দু' পাশে দু'জন ত'ার হাত ধরে থাক্‌ত। ধরে দাঁড় করিয়ে রাখলেও যদি দাঁড়াতে না পারত তবে ত মাটিতে শুইয়ে রাখা হ'ত। প্রতি ২৪ ঘণ্টায় তিনবার করে এই চিকিৎসাতেও রুগীর শরীর সারাতে পারত না; আর চত্বরে বরফ বা কাদার পাহাড় থাক্‌লে ত কথাই নেই।

* * *

সকালের নামডাকার ঘন্টি পড়তেই প্রত্যেক ব্যারাকের দশটা করে সারি হিসাবে আমরা দাঁড়িয়ে পড়তাম; তখন চেক্ করা হত সকলে হাজির কিনা। চেক্‌আপ আর সাজানো'র পর আমরা ক্যাম্পকর্তা বা তার ডেপুটির জন্য অপেক্ষা করতাম। সে ব্যাটা রিপোর্ট নেবে। এইভাবে চল্‌তো। অ্যাটেন্‌শান ভঙ্গীতে টুপী খুলে দাঁড়িয়ে ব্যারাক-সিনিয়ার (সে ব্যাটা এক জার্মান কয়েদী) ব্লক কর্তাকে (সে এক এস. এস. ওয়ালা) ব্যারাকের রিপোর্ট দিত। সে আবার ব্যারাক আর বন্দীদের সম্পর্কে রিপ্রোর্ট দিত এক উচ্চপদস্থ এস. এস. ওয়ালাকে যাকে বলা হ'ত "র‍্যাপোর্টফ্যুরার"। সে আবার ক্যাম্প-কমাণ্ডাণ্টেকে সারা কাম্পের রিপোর্ট দিত। ব্যারাকসিনিয়র'এর হুকুম ছিল এইরকম—"১৭নম্বর ব্লক, 'অ্যাটেনশান,' টুপীখোলা, 'স্ট্যাণ্ড অ্যাট ইজ' ...."। রাপোর্টফুয়ার ঐ ধরণের হুকুমই দিত। শুধু ১৭ নম্বরের জায়গায় বল্‌ত "প্রত্যেকে"। ক্যাম্প-কমাণ্ডাণ্ট রিপোর্ট নিলে কাজে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হ'ত। দুপুরে আর রাতে ঐ ব্যাপারই চল্‌ত।

সকালের নামডাকার সময় একজনও গর হাজির হ'লে চত্বরে আমাদের "অ্যাটেন্‌শান" ভঙ্গীতে দাঁড় করিয়ে রেখে পলাতক খোঁজার হুকুম হতো। সন্ধ্যাঅবধি হৈ চৈ চল্‌ত; কোনো ফল ফল্‌তনা; আর আমরা জলাহার না পেয়ে চত্বরে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতাম।

আমি আগেই বলেছি যে ক্যাম্পের লোকেদের ওপর,-যে সব পুরোনো বন্দী ছিল বা যারা কাজ করতো-তাদের প্রভাব কি রকম ছিল। এটা কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে খুব ভাল ভাবেই পরিলক্ষিত হতো। আউশভিৎচ,—বার্কেনাউ ক্যাম্পে যেখানে বিরাট বন্দী সমাবেশ ছিলো সেখানে এই বিষয়টা খুবই প্রয়োজনীয় ছিলো। একই যন্ত্রণা ভোগ করে, একই ভাগ্যসুত্রে গ্রথিত হয়ে এরা এক অবিচ্ছেদ্য অবিনশ্বর সংঘ তৈরী করেছিল এটা মনে করলে মস্ত ভুল করা হবে। বন্দীত্বের ভেতর মানুষের যে নির্লজ্জ অহমিকা ফুটে ওঠে এমন আর কোথাও হয়না। জীবনযাত্রা যত কঠিন হয়, মানুষ আত্মরক্ষার্থে ততই স্বার্থপর হয়ে ওঠে। যে মানুষ সাধারণ জীবনে দয়ালু এবং পরের উপকারে তৎপর সেও বন্দীজীবনে তার সেই বন্দীদের ওপর অত্যাচার করে, যদি তার ফলে তার বন্দীত্বের লাঞ্ছনা এক বিন্দুও কমে। যারা স্বভাবতই নিষ্ঠুর, স্বার্থপর বা অপরাধপ্রবণ তারা সহজেই তাদের সহবন্দীদের দুঃখ দুর্দশা সম্বন্ধে উদাসীন থাকে—কেবলমাত্র, নিজেদের অসার সুযোগ সুবিধার জন্য। যে সব বন্দীদের মন কনসেন্‌ট্রেশান ক্যাম্পের নিষ্ঠুরতা দেখে তখনও শক্ত হয়নি তারা এই অসহ্য এবং নীচ ব্যবহার দেখে অসীম মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে, দৈহিক যন্ত্রণা তো বলা বাহুল্য। গার্ডের কোনো বিকৃত মনোভাব বা নিষ্ঠুরতা তাদের তত কঠিন আঘাত করেনা, যত করে সহবন্দীদের অশোভন আচরণ। তাদের মানসিক আঘাত চরম হয় যখন তারা দেখে বন্দী কর্মচারীরাই বন্দীদের ওপর নির্দয় ব্যবহার করছে।

যে বন্দী নিজের বা অপরের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করে, তার ভাগ্যে অশেষ দুঃখ। যারা ক্যাম্প চালায় তারা যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে তারপর কারো পক্ষে এরূপ করা অসম্ভব।

কেন এই সব পুরোনো বন্দী এবং বন্দী কর্মচারীরা তাদের সহ বন্দীদের সহিত অসৎ ব্যবহার করে? এদের এরকম করার কারণ, তারা চায় গার্ড বা ওভারসিয়ারদের কাছে নিজেদের প্রিয় করে তুলতে, তারা চায় নিজেদের কর্মদক্ষতা দেখিয়ে জীবনের দিন কটা আরও কিছুদিন স্থায়ী করতে, হোকনা তাতে সহবন্দীদের ক্ষতি। এরা এরকম ব্যবহার করতে সাহস করে কেননা গার্ড এবং ওভারসিয়াররা এসব বিষয়ে একেবারে উদাসীন, বা কখনও কখনও বদমাইসি করে এক বন্দীকে আর একজনের পেছনে লেলিয়ে দিয়ে আনন্দ পায়।

বন্দীদের ভেতর যারা কর্মচারীর কাজ করে তাদের মধ্যে অনেকে অপরাধপ্রবণ মন নিয়ে বন্দীদের ওপর মানসিক ও দৈহিক অত্যাচার করে এমন কি অনেক সময়ে তাদের মৃত্যুর কারণও হয়।

মানুষের মধ্যে যে সত্যকারের মানুষ আছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় বন্দীত্বের ভেতর। ছোটবেলা থেকে যেভাবে মানুষ হয়েছে, এতদিন ধরে যে শিক্ষা পেয়েছে—যা তার সত্যিকার পরিচয় নয় সবই খুলে পড়ে যায়। যত সময় যায় সে সব ভাণ, সব লুকোচুরী ফেলে দিয়ে নিজের সত্যকার যে নগ্ন স্বরূপ তাই প্রকাশ করে, হয়ত তা ভাল নয়ত মন্দ।

কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের যারা অধিনায়ক তারা এই রেষারেষির সমর্থন করতো। অনেক সময় বন্দীদের উত্তেজিতও করতো যাতে তারা সকলে হাতে হাত মিলোতে না পারে। শুধু রাজনৈতিক নয় দেহ বর্ণের অসমতাও এখানে খুব বেশী কাজ করতো।

এই রেষারেষি বন্দীদের ভেতর না থাকলে কোনো ক্যাম্প অধিনায়কই তার ক্যাম্পের সহস্র সহস্র বন্দীদের শাসনে রাখতে পারতোনা। বন্দীদের ভেতর যত বেশী মতভেদ ততই শক্তি লাভের আগ্রহ বেড়ে যেতো, এবং ততই ক্যাম্প চালানো সুবিধে হতো। "ভেদ এনে দাও

তবে শাসন করো" এ নীতি শুধু রাজনীতিতে নয় ক্যাম্প চালাতেও প্রয়োজন। এই দিকটা ছোট করে দেখলে চলবে না।

সোভিয়েৎ যুদ্ধ বন্দীরাই দ্বিতীয় বিরাট দল ছিল। এদের দিয়ে বারকেনাউতে যুদ্ধবন্দীদের জন্যে ক্যাম্প তৈরী করা হচ্ছিল। এদের আপার সাইলেসিয়ার লামসডের্ফ যুদ্ধবন্দীক্যাম্প থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং এরা একেবারে ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল। অনেকদিন ধরে পায়ে হেঁটে তবে এরা ল্যামস্‌ডোর্ফে পৌঁছেছিল। তাদের এই যাত্রাকালে প্রায় কোনো খাবারই তাদের দেওয়া হয়নি। বিশ্রামের সময় তাদের কাছাকাছি ক্ষেতে নিয়ে যাওয়া হতো সেখানে যা কিছু খাদ্যের উপযোগ্য ছিল তাই তারা খেতো। ল্যামসফোর্ড ক্যাম্পে ২০০,০০০ লক্ষ সোভিয়েৎ বন্দী ছিলো। নিজেদের খোঁড়া গর্তে তাদের বাস করতে হতো। তাদের খাবার ছিল অত্যন্ত কম এবং দেওয়াও হতো ইচ্ছামতো। মাটীতে গর্ত খুঁড়ে তার ওপর রান্নাবান্না সারতো।

১৯৪১ সালে জার্মানরা মনে করতে পারেনি যে এত বেশী যুদ্ধ বন্দী হবে। যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে যারা ব্যবস্থা করতো তাদের ব্যবস্থা এত খারাপ ছিল যে কোনো কিছু তাড়াতাড়ি করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

এই রকম যুদ্ধবন্দী, যাদের দাঁড়িয়ে থাকবার সামর্থ ছিলনা, তাদের দিয়ে আবার বারকেনাউতে এক ক্যাম্প করানো হচ্ছিল।

সর্বাধিনায়কের হুকুম অনুযায়ী যে সব সোভিয়েৎ পুরুষ খুব শক্ত সমর্থ তাদেরই আউশভিৎসে নিয়ে যাওয়া হতো। যে সব অফিসার এই বন্দীদের সঙ্গে যেতো তারা পরে বলেছে যে তাদের কাছে যে সকল বন্দী ছিল তাদের মধ্যে থেকে সকলের চেয়ে শক্তিশালীদের নেওয়া হতো।

সোভিয়েৎ যুদ্ধবন্দীরা কাজ করতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু তারা এত দুর্বল ছিল যে কোনো কাজ করতে পারতোনা। আমি জানি তারা যখন ক্যাম্পে ছিল তখন তাদের উপরি রেশন দেওয়া হতো কিন্তু

কোনো ফল হতোনা। না খেতে পেয়ে পেয়ে এরা হজমের শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলো। এই যুদ্ধবন্দীরা ঝাঁক ঝাঁক মাছির মতন মারা যায়। সাধারণ দুর্বলতা বা সামান্য অসুখ হলে তাদের দেহ আর প্রতিরোধ করতে পারতোনা। আমি অনেককে দেখেছি আলু বা বীট খেতে খেতে মারা গেছে।

আমি একবার ৫,০০০ রাশিয়ানকে গাড়ী ভর্তি শালগম খালাস করবার কাজে লাগিয়েছিলুম। সমস্ত রেলের লাইন শালগমে ভরে গিছলো, অবস্থা ক্রমে বিপদজনক হয়ে দাঁড়াচ্ছিলো। রাশিয়ানরা কিছুই করতে পারছিলোনা। তারা হয় উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরছিলো, কেউ কেউ লুকিয়ে যা পেতো তাই খেয়ে নিচ্ছিলো বা কেউ কেউ নির্জন জায়গায় নিজেদের মৃত্যুশয্যা বিছিয়েছিলো।

১৯৪১-৪২ সালের শীতে সব চেয়ে খারাপ সময় গেছে। রাশিয়ানরা ভিজা বাতাসের চেয়ে শীত সহ্য করতে পারতো। বারকেনাউর অর্দ্ধেক তৈরী ব্যারাকে প্রথম প্রথম মৃত্যু সংখ্যা প্রবল হয়ে উঠলো। এতদিন ধরে যে বন্দীরা কিছুটা শক্তি দেখিয়েছে তারাও ক্রমে শক্তিহীন হয়ে পড়লো। উপরি খাবার দিয়েও কিছু হলোনা। ওই সব লোকগুলি যা পেতো তাই খেতো তবুও তাদের ক্ষিধে মিটতোনা।

একবার আমি দেখেছিলুম একদল যুদ্ধবন্দী আউশভিৎচ থেকে বারকেনাউ আসছিলো, হঠাৎ পথের মাঝে আলুর স্তূপ দেখে তারা রাস্তা ছেড়ে সেই দিকে ছুটলো। গার্ডরা থতমত খেয়ে কি করবে ঠিক করতে পারছিলনা। সৌভাগ্যবশতঃ আমি সেই সময় উপস্থিত হয়ে একটা ব্যবস্থা করেছিলাম। বন্দীরা স্তূপ খুঁড়ে আলু খাচ্ছিল এবং তাদের সরিয়ে আনা দুষ্কর ছিলো। অনেক বন্দী আলু খেতে খেতে মারা গিছলো, শেষ অবধি তাদের হাতে আলু ধরা ছিলো।

যে ১০,০০০ সোভিয়েট বন্দী ক্যাম্প তৈরী করছিলো তাদের থেকে ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মে মাত্র কয়েক শো বেঁচে ছিলো। যারা বেঁচে ছিলো তারা চমৎকার ভাবে কাজ করেছিলো এবং পরে যখনই কোনো কাজ তাড়াতাড়ি করার দরকার হতো এদের তৎক্ষণাৎ ডাক পড়তো।

আমার কিন্তু সব সময়েই মনে হতো যে এরা শক্ত থাকায়-সহবন্দীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বেঁচে গিছলো।

আমার যতদূর মনে হচ্ছে ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মে বন্দীরা সকলে একসঙ্গে পালায়। বেশীর ভাগ লোককেই গুলী করে মারা হয়েছিল, কিন্তু অনেকেই পালাতে সমর্থ হয়েছিল। যাদের ধরা হয়েছিল তারা বলেছিল যে নতুন ক্যাম্পে তাদের নিয়ে যাবার কথা হওয়াতে তারা ভেবেছিলো যে তাদের গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হবে সেই জন্যেই তারা পালিয়েছিলো। তারা যে অন্য ক্যাম্পে যাবে এটা বিশ্বাস করতে পারছিলোনা, তারা ভেবেছিলো যে তাদের সঙ্গে ছলনা করা হচ্ছে, যদিও এই বন্দীদের কোনো দিনই হত্যা করার কথা ছিলনা। বড় বড় রাশিয়ান রাজনীতিজ্ঞদের দেখে তারা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলো। বহুলোকের মানসিক ভীতি এরকম ভাবেই জাগে এবং তার ফলও এই হয়।

আমার বন্দীত্বের প্রথম দিন থেকেই আমি অনেকবার শুনেছি যে আমি আমার বন্দীত্বের হুকুম নাকচ করতে পারতুম, এমন কি ইচ্ছে করলে হিমলারকে গুলী করতেও পারতুম। অফিসারদের মধ্যে এমন একজনও আছে যে, এই কাজ করার মত চিন্তাও করতে পারে। সত্যি কথা যে অনেক অফিসার অনেক সময় এই নিষ্ঠুর আদেশের বিরুদ্ধে ক্ষীণ প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আদেশ পালন না করে উপায় ছিলনা। সর্বাধিনায়কের নিষ্ঠুর আদেশ শুনে অনেক অফিসার অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবুও স্বপ্নেও তারা সর্বাধিনায়কের মৃত্যুচিন্তা করতে সাহস করেনি। এ কথা আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি। সর্বাধিনায়ক একজন ছিল। তার সকল আদেশ হিটলারের নামেই জারী করা হতো এবং এ সকল আদেশ সকলে পবিত্র মনে করতো। এই আদেশকে বিশ্লেষণ করা বা এই আদেশের অর্থ বার করা কখনও কারো চিন্তাতে আসেনি। এই আদেশের শেষ অর্থ জীবন নাশ করা এ কথা জেনেও প্রত্যেক অফিসারই যুদ্ধের সময় এ আদেশের প্রতি অক্ষরই পালন করেছে।

এই সকল অফিসারদের সযত্নে শিক্ষা দেওয়া হতো। তাদের সামনে, জাপানীদের দেশের সম্রাট, যাঁকে তারা দেবতা বলে মানতো তার জন্ম আত্মত্যাগএর দৃষ্টান্ত সব সময় তুলে ধরা হতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা একদিন লোকে ভুলে যায়, এ শিক্ষা ভোলার উপায় ছিলনা। প্রত্যেক সৈনিকের মনে এ শিক্ষা গভীর ভাবে রেখাপাত করতো এবং সর্বাধিনায়ক জানতো যে এদের কাছ থেকে অনেক কিছু আদায় করা যাবে। সর্বাধিনায়কের আদেশ অমান্য করার বা নিষ্ঠুর আদেশ দিয়েছে বলে তাকে হত্যা করবার ইচ্ছা কোন অফিসারের মনে কখনও জাগেনি, কেন তা, বাইরের কোন লোক সে তত্ত্ব কোন দিনই উপলব্ধি করতে পারবেনা। ফুয়েরারের বা সর্বাধিনায়কের সব আদেশই এদের কাছে উচিত মনে হতো। দেশের ব্যাপারে ইংরাজদেরও একটা নীতি আছে তা হলো : "আমার স্বদেশ, তার জন্যে ঠিক বা ভুল সব কিছুই করতে হবে।"

১৯৪১-৪২ সালে যখন সমস্ত ইহুদী জাতিকে ধ্বংস করা হচ্ছিল, তার আগে সব সোভিয়েট রাজনীতিজ্ঞ ও কমিশারদের কনশেনট্রেশান ক্যাম্প থেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

ফুয়েরারের গোপন আদেশ অনুসারে জার্মান গুপ্তচর বাহিনী সমস্ত যুদ্ধবন্দী শিবির খুঁজেছিল রাশিয়ান রাজনীতিক অফিসার ও কমিশারদের জন্যে। যাদের খুঁজে পাওয়া গিছলো তাদের নিকটবর্তী কনশেনট্রেশান ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এই আদেশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জার্মান জনসাধারণ বলেছে যে রাশিয়ানরা প্রত্যেক জার্মান নাৎসী পার্টি মেম্বারকে বা যে সকল জার্মান নাৎসী পার্টির সহিত কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট তাদের বা ক্যাম্পের গার্ডদের ধরামাত্র হত্যা করেছিল। লাল ফৌজের যে সকল রাজনীতিক কর্ম্মচারী ছিল তাদের ওপর নির্দেশ ছিল যে যদি কোনো কর্ম্মচারী কোনোদিন ধরা পড়ে তবে যুদ্ধবন্দী শিবিরে আতঙ্কের সৃষ্টি করবে ও সবরকম কাজ নষ্ট করার চেষ্টা করবে। সোভিয়েট সৈন্যদলের যে সকল রাজনীতিক কর্মচারী এরকম ভাবে ধরা পড়েছিল তাদের সকলকে আউশভিৎসে পাঠান হয়েছিল।

প্রথম যে ছোট দলটি গিছলো তাদের ক্যাম্পের হত্যাকারীদল গুলি করে মারে। একবার আমি যখন অফিসের কোনো কাজে বাইরে যাই সে সময় আমার সহকারী ফ্রিটস্, যে কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের অধিনায়ক ছিল, সে প্রুসিক এসিড আর সাইক্লোন বি মেশান একরকম গ্যাস ব্যবহার করেছিল বন্দীদের হত্যা করবার জন্যে। এই সাইক্লোন বি ক্যাম্পের পোকামাকড় নষ্ট করবার জন্যে হাতের কাছে থাকত। আমি ফিরে আসার পর ফ্রিটস্ এই হত্যার কথা বলে এবং পরের দল বন্দীর ওপর ফের গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এগারো নম্বর ব্লকে এই হত্যালীলা সংঘটিত হয়। আমি গ্যাস মুখোশ পরে এই ব্যাপার দেখি। ওই ঠাণ্ডা ঘরে সাইক্লোন ছুঁড়ে দেবার পর মৃত্যু আসতে এতটুকুনও দেরি হয়নি। একটি মৃদু আর্তনাদ, তার পরেই সব চুপ।

প্রথম যখন বন্দীদের গ্যাস দিয়ে হত্যা করা হয় তখন সেই ঘটনা আমার বিবেকে আঘাত করেনি কেননা সমস্ত ঘটনাই আমার মনে গভীর ভাবে বদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই ব্যাপারের কিছুদিন পরে পুরোনো দাহস্থানে প্রায় ৯০০ জন রাশিয়ানকে ওই একই উপায়ে হত্যা করা হয়। এই ঘটনাটা আমার অল্প অল্প মনে পড়ে।

বন্দীদের যখন ট্রেন থেকে নামানো হচ্ছিল সেই সময় নাগাদ মৃত্যুপুরীর ছাদে কতকগুলি গর্ত করা হয়েছিল। রাশিয়ানরা পাশের ঘরে কাপড় চোপড় ছেড়ে নিঃশব্দে মৃত্যুপুরীতে ঢুকত কেননা তাদের বলা হয়েছিল তাদের পরিষ্কার করা হবে। সমস্ত কবরখানাটা মৃতদেহে ভরে গেছ্ল। দরজা বন্ধ করে দেবার পর ঘরের ভেতরে গ্যাস ছুঁড়ে দেওয়া হ'ত। আমি জানিনা মৃত্যু আসতে কতক্ষণ সময় লাগ্‌ত। কিছুক্ষণ ধরে মৃদু আওয়াজ পাওয়া যেত। গ্যাস যখন ছাড়া হত তখন কয়েকজন বন্দী "গ্যাস বলেই চেঁচিয়ে উঠত এবং সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে অন্য বন্দীরা দরজার উপর এসে পড়ত। কিন্তু সে কঠিন দরজা কোনদিনই খুলতনা। কয়েক ঘণ্টা পরে ঘরের দরজা খুলে ঘর পরিষ্কার করা হত। তখন আমি দেখতুম কত শত শত লোককে মারা হয়েছে। যদিও

আমার কল্পনায় ছিল যে গ্যাস দিয়ে হত্যা অত্যন্ত বীভৎস তবুও সেদিন চোখে দেখে আমার ভেতর এক আতঙ্ক এসে ভর করল। আমার মনে হত দম বন্ধ হয়ে মরা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু মৃতদেহগুলির মুখে কোন মৃত্যুযন্ত্রণার চিহ্ন ছিলনা। ডাক্তাররা আমায় বলেছিলেন যে প্রুসিক এসিড এত শীঘ্র ফুসফুসকে অসাড় করে দেয় যে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু হবার কোনো চিহ্নই থাকেনা। অক্সিজেনের অভাবে বা বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে মৃত্যু ঘটলে এই চিহ্নই খুব বেশীই থাকে। সে সময় সোভিয়েট যুদ্ধবন্দীদের মৃত্যু আমায় বিচলিত করেনি কেননা আমার প্রতি যে আদেশ ছিল আমি তা সম্পূর্ণ করেছি। সত্যি করে বলতে গেলে এদের মৃত্যু আমার মনে একটা স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছিল। এর কিছুকাল পরেই সমস্ত ইহুদী জাতিকে নষ্ট করবার কথা উঠ্‌ল, আমি এবং আইকম্যান দুজনের কেউই জানতুমনা কি করে এ কাজ করা হবে। গ্যাস ব্যবহার করা হবে জানতুম, কিন্তু কি গ্যাস বা কোন উপায়ে দেওয়া হবে তা জানতুম না। পরে অবশ্য কি গ্যাস এবং তার প্রয়োগ প্রণালী জেনেছিলুম।

একসঙ্গে বহু লোককে হত্যা করতে আমার চিরকালই ভয় ছিল, বিশেষ করে তারা যদি নারী বা শিশু হয়! সর্বাধিনায়ক এবং রাইখের জেনারেল সিকিউরিটি অফিসের আদেশ অনুসারে সন্ধিরক্ষার্থ-প্রদত্ত বহু ব্যক্তি ও বহু বন্দীকে আমি হত্যা করেছি। যখন জানতে পারলুম আমাকে আর হত্যা করতে হবেনা এবং বন্দীরা আর মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করবেনা তখন আমি খুবই খুসী হয়েছিলুম। কেননা এই বিষয়েই আমার সব চেয়ে বেশী ভাবনা ছিল। আইখম্যান যখন আমায় বল্‌ত যে আহতরা ছুটে পালাতে চেষ্টা করায় হত্যাকারীদল কি রকম ভাবে ফের তাদের গুলী করত কি ভাবে নারী ও শিশু হত্যা হ'ত তখন আমার অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হয়েছিল।

দিবারাত্র রক্তের সমুদ্রে স্নান করে এই হত্যাকারীদলের ভেতরও মৃত্যুর হার বেড়ে চললো। এই দলের অনেকেই পাগল হয়ে গিছলো এবং বেশীর ভাগ লোক এই নিষ্ঠুর কার্য করার আগে অত্যন্ত বেশী

মগুপান করতো। হোয়েফেলের এজাহারে প্রকাশ যে গ্লোবোনিক হত্যাকারীদলের প্রায় সকলেই অত্যাধিক মগু পান করতো।

এর পরে যে সব দল আসে তাদের ভেতর থেকে যারা গোলমাল করতে পারে এমন লোকদের আলাদা করে নজরবন্দী করে রাখা হতো। যদি কোনরূপ আতঙ্কের চিহ্ন দেখা যেতো, তবে যারা আতঙ্কের সৃষ্টি করতো তাদের বাড়ীর পেছনে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি গুলী করে মারা হতো যাতে অন্য কেউ না জানতে পারে। যাদের মনে কোনো কিছু অঘটন ঘটার সম্ভাবনা জাগতো গার্ডদের সুমিষ্ট ব্যবহারে সে শঙ্কা কোথায় উড়ে যেতো। এই গার্ডগুলো হতভাগ্যদের শেষমুহূর্ত আসবার পূর্ব পর্য্যন্ত ঘরের ভিতর থাকতো এবং এর ফলে বন্দীদের মনে ভয় অনেক কমে যেতো। একদল গার্ড দরজার বাইরে শেষ অবধি অপেক্ষা করতো।

বন্দীদের নিয়ে আসা থেকে, কাপড়চোপর ছাড়ানো সমস্ত প্রক্রিয়াটা যাতে শান্তভাবে হতে পারে এইটাই সব চেয়ে প্রয়োজনীয় ছিল। যাতে কোনো গণ্ডগোল বা চেঁচামিচি না হয় তাই দেখতে হতো। যদি কোনো বন্দী কাপড় ছাড়তে অস্বীকার করতো তবে যারা ইতোমধ্যে কাপড় ছেড়েছে তাদের বা গার্ডদের সাহায্য নেওয়া হতো। যারা অত্যন্ত একগুঁয়ে তাদেরও মিষ্টিকথায় ঠাণ্ডা করে কাপড় ছাড়ানো হতো। যে সব বন্দী 'সনডারকমাণ্ডোর' কাজ করতো তারা চাইতো যাতে বন্দীরা খুব শীঘ্র কাপড় চোপড় ছেড়ে ফেলে, কেননা এই হতভাগ্যদের ভাববার সময় দিতে গার্ডরা রাজী ছিলনা।

সনডারকমাণ্ডোর কর্মচারীরা যেরূপ উৎসাহের সঙ্গে বন্দীদের কাপড় চোপড় ছাড়তে এবং গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যেতো তা অদ্বিতীয় উদাহরণস্বরূপ। আমি কখনও দেখিনি যে কোনো কর্মচারী কোনোদিন সামান্যতম উপায়েও বন্দীদের কাছে তাদের ভাগ্য সম্বন্ধে একটী কথাও উদ্ঘাটন করেছে। বরঞ্চ তারা সর্বপ্রকারে বন্দীদের ছলনা করতে চেষ্টা করতো, এবং বিশেষ করে যাদের মনে কোনো আশঙ্কার সম্ভাবনা ঘটতো, তাদের শান্ত করতে চেষ্টা করতো। ইহুদিরা গার্ডদের বিশ্বাস করতো না, বিশ্বাস করতো তাদের জাতের বন্দীদের। "স্পেশাল ট্রিটমেণ্ট ব্রিগেডে"

যে সকল ইহুদি কাজ করতো তারা যে যে দেশ থেকে আসতো, যাদের গ্যাস দিয়ে হত্যা করা হ'বে তারাও সেই একই দেশ থেকে আস'ত। নতুন যারা আস'ত তারা ক্যাম্পের জীবন সম্বন্ধে বা তাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন যারা পূর্বে এসেছে তাদের সম্বন্ধে জানতে চাই'ত। কি ভাবে 'সনডার কমাণ্ডোর' কর্মচারীরা হাত পা নেড়ে তাদের মিথ্যা স্তোক বাক্য দি'ত, দেখলে আমার মজাই লাগত।

অনেক স্ত্রীলোকেরা শিশুদের কাপড়-চোপড়ের গাদার তলায় লুকিয়ে রাখত। কর্মচারীরা এ বিষয়ে খুব তৎপর ছিল, এবং যতক্ষণ না স্ত্রীলোকেরা শিশুদের সঙ্গে নিত' ততক্ষণ তাদের মিষ্টি কথায় বোঝাত। পরিশোধন প্রণালী শিশুদের ক্ষতিকারক হবে এই ভেবেই মায়েরা তাদের লুকিয়ে রাখত। ছোট ছোট বালক বালিকারা জামা কাপড় ছাড়বার সময় প্রায়ই কাঁদত। কিন্তু যখন তাদের মায়েরা বা কর্ম্মচারীরা মিষ্টি কথায় বোঝাত, তখন তারা শান্ত হয়ে গ্যাস চেম্বারে প্রবেশ করত, অনেকের হাতে খেলনাও থাকত। আমি অনেক সময় দেখেছি অনেক আতঙ্কগ্রস্তা স্ত্রীলোকেরা যারা নিজেদের ভাগ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিল তারাও সন্তানদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করে তাদের গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যেত।

একটি তরুণী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। শিশুদের এবং বৃদ্ধাদের কাপড় ছাড়াতে সে যথেষ্ট সাহায্য করত। সে প্রায়ই এদিক ওদিক ছোটাছুটি করত। তার কর্মব্যস্ততা অনবরতই আমার চোখে পড়ত। তার তার সঙ্গে তার দুটি ছোট ছেলে ছিল। তাকে দেখতে ইহুদিদের মত ছিলনা। শেষ অবধি সে মেয়েদের এবং শিশুদের কাপড় চোপড় ছাড়াতে সাহায্য করেছিল এবং যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিয়েছিলো। এই মেয়েটি শেষ দলের সঙ্গে গ্যাস চেম্বারে গিয়েছিল। চেম্বারে ঢোকার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল "আমি প্রথম থেকেই জানতুম যে আমাদের আউশভিৎস'এ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গ্যাস দিয়ে হত্যার জন্য। ছেলেমেয়েদের যত্ন করে আমি খালি একটু বেশী সময় বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছিলুম। আমি সব দেখেশুনেই যাব ঠিক করে রেখেছিলুম। মরতে আমার নিশ্চয়ই বেশী দেরী লাগবে না। বিদায়"।

অনেকবার কাপড়-চোপড় ছাড়ার সময় মেয়েরা অসম্ভব চীৎকার করত। এই চীৎকার মানুষের মজ্জা ভেদ করে যে'ত। তারা পাগলের মত চুল ছিঁড়ত। এদের বাড়ীর পিছনে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মারা হ'ত।

এমনও হয়েছে মেয়েরা কর্ম্মচারীদের গ্যাসচেম্বার ছেড়ে চলে যেতে দেখে নিজেদের ভাগ্যের কথা বুঝতে পারত। তখন আমাদের কত অভিশাপ দিয়েছে।

আমি একবার দেখেছিলুম একটি স্ত্রীলোক গ্যাস চেম্বারের দরজা বন্ধ হবার সময় তার ছেলেমেয়েদের ঠেলে বার করে দিতে চেষ্টা করেছিল। সে চেঁচিয়ে কাঁদছিল এবং আমাদের কাছে অনুরোধ করে বলেছিলো—"অন্তত: আমার ছেলেমেয়েদের বাঁচতে দাও"।

"আউশভিৎজ মৃত্যু-শিবিরাধ্যক্ষ রুডল্ফ হেসের স্বলিখিত বিবরণী থেকে উদ্ধৃতি"।

জন্ম ২৬শে মার্চ্চ, ১৮৮৩ সালে কোলনের নিকট ষ্টেলবার্গে। পিতা ও মাতা উইলহেলম ও এলিসাবেথ ওরফে উর্থ ১৯৩৭ সাল থেকে যারা কোনো ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। ক্রেমার এম. ডি, পি. এইচ. ডি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রফেসর ছিল। স্ত্রীর সহি ত বিবাহবিচ্ছেদ হয়, সন্তানসন্ততি ছিলনা। ১৯৩২ সাল থেকে নাৎসী পার্টি, ১৯৩৯ সাল থেকে এ্যালগেমিন এস এস প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিল।

এই বিচারের সময় ক্রেমার নিজেকে আউশভিৎস ক্যাম্পের চিকিৎসা বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট বলে পরিচয় দেয়। চিকিৎসা শাস্ত্র মানে মানব-দেহের স্বাস্থ্যের জন্য যুদ্ধ করা, আউশভিৎসে চিকিৎসা শাস্ত্রের সে মানে ছিলনা। ১৯৪২ সালে আগস্ট মাসের শেষভাগ থেকে ক্রেমারকে ওয়াফেনের চিকিৎসক হিসাবে কাজ করতে হুকুম দেওয়া হয়। সে মাত্র ~৩ মাসের জন্যে কাজ করে। ক্রেমারের একটি ডায়েরী ছিলো, এ ডায়েরীটি মিত্রশক্তির নায়কদের হাতে পড়ে। এ থেকে আমরা বেশ ভাল ভাবে জানতে পারি এই চিকিৎসকদের কি উদ্দেশে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো এবং সত্যি করে তারা সেখানে কি কাজ করেছিলো।

আসামীর ডায়েরী ও এজাহার থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায় :—

অসভিয়েচিমে থাকাকালীন ক্রেমার প্রায় ১৪ বার এই হত্যাকাণ্ডের চাক্ষুষ দর্শক ছিলো। ২রা সেপ্টেম্বার থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বার অবধি প্রায় ৯ বার সে এই বিশেষ হত্যালীলার দর্শক ছিল।

কোনো কোনো দিন (৫ই ও ২৩শে সেপ্টেম্বর) ২৪ ঘণ্টায় ২ বার করে তাকে এই হত্যাকাণ্ডের সময় উপস্থিত থাকতে হয়েছে। ডাক্তার ক্রেমার বলেছে যে আউশভিৎসে থাকাকালীন ৭ জন ডাক্তারকে উপরি উক্ত ব্যাপারে পালা করে উপস্থিত থাকতে হতো। ১২ই অক্টোবরের পাতায় ক্রেমার মৃতের সংখ্যা প্রায় ১৬০০ বলে উল্লেখ করেছে। ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি সময় অবধি কত সংখ্যক লোককে হত্যা করা হয়েছে, এ থেকে তার একটা কল্পনা আমরা করতে পারি।

এই সব হত্যাকাণ্ডে তার নিজের কি অংশ ছিল তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আসামী বলেছে সে কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়োজনের জন্য নিযুক্ত থাকতো। ড্রাইভারের পাশে বসে থাকাই তার কাজ ছিল, গার্ডদের কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরে যেতো। আর হেসের বিচারের সময় অনেক সাক্ষীর সাক্ষ্যে প্রকাশ যে ডাক্তাররা গ্যাস প্রয়োগ করা দেখাশুনা করতো ও কখন গ্যাস চেম্বার খোলা যেতে পারে তার পরামর্শ দিতো। অন্য ডাক্তারদের কাজ থেকে যে আসামীর কাজের কোনো পার্থক্য ছিল তা মনে করার কোনো কারণ নেই।

ডাক্তার হিসাবে ক্রেমার যে সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় লিপ্ত ছিলো সে বিষয়ে আমাদের মনোযোগী হওয়া দরকার। ১৯৪২ সালের ডায়েরীতে ৩রা অক্টোবর, ১০ই অক্টোবর, ১৭ই অক্টোবর, ১৩ই নভেম্বর তারিখগুলিতে আমরা দেখতে পাই যে আসামী, সন্থ মৃতদের দেহের আভ্যন্তরীন যন্ত্রগুলি নিয়ে নানারূপ পরীক্ষা করেছিলো। ক্রেমার এই অভিযোগের উত্তরে বলেছিলো যে খাদ্যের অভাবে মানব দেহে যে নানারূপ পবির্তন ঘটে তা লক্ষ্য করাই তার উদ্দেশ্য ছিলো। এই কাজে Doctor Wirthe তাকে সাহায্য করেছিলো বন্দীদের "ফেনোল" ইঞ্জেকশান দিয়ে মেরে ফেলতে। যে সকল বন্দীদের মৃত্যু হবে তাদের সব কটা ক্রেমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। সেইজন্য রোগীদের যারা দেখাশুনা করতো তাদের ওপর আদেশ দেওয়া থাকতো যে এ সকল বন্দীদের মৃতদেহ ক্রেমারের কাজের জন্যে রক্ষিত হবে। নির্দিষ্ট দিনে ক্রেমার এলে বন্দীকে অপারেশান টেবিলে শুইয়ে 'ফেনোল' ইঞ্জেকশান

দেওয়া হতো। বন্দীর মৃত্যু হলে অপর এক ডাক্তার তার পেট কেটে লিভার বার করে নিতো। ক্রেমার এইগুলি নিয়ে নানান্ উপায়ে পরীক্ষা করে সেগুলিকে মিউয়েনষ্টারে পাঠিয়ে দিতো। আসামী ক্রেমার আরও স্বীকার করেছে যে ক্যাম্পের সব ডাক্তাররা মিলিত হয়ে নানারূপ পরীক্ষার জন্য দুর্বল বন্দীদের হত্যা করেছে।

নিজের কাজের জন্য মনোনীত করার সময় ক্রেমার শুধু মাত্র রোগীদের চেহারা দেখেই মনোনীত করতো, কোনদিনই রোগীদের পরীক্ষা করতোনা। মনোনয়নের সময় যে নিম্নতম অফিসাররা স্বাস্থ্য বিভাগে কাজ করতো তাদেরই ব্যবহার করা হতো।

আরেকজন সাক্ষী লুডভিক নাগ্রাবা যে "স্পেশাল বিগ্রেডে" কাজ করতো সে বলেছে যে ক্রেমার ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে বন্দী মনোনয়ন করতো এবং অনেক সময় দাহস্থানেও তার ডিউটি থাকতো।

ঠিক কতজন লোকের মৃত্যুর জন্য যে আসামী দায়ী তা বলা অসম্ভব। যদি ধরা যায় এক একবার গ্যাস দেওয়ায় কয়েক শো লোক মারা গেছে তাহলে ক্রেমারের ডায়েরীর উপর নির্ভর করলে দেখা যাবে যে ক্রেমার অন্য সকলের সঙ্গে প্রায় কয়েক হাজার লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

ক্রেমারের ডায়েরী থেকে এও জানা যায় ৯ই সেপটেম্বর, ১৯শে অক্টোবর ও ১৫ই নভেম্বর যে নির্দয়ভাবে বেতমারা হয়েছিল তাতেও ক্রেমার অংশ গ্রহণ করেছিল।

১৯৪৭ সালের ৭ই অক্টোবরের এজাহারে প্রকাশ যে বন্দীদের যে বর্বর শাস্তি দেওয়া হতো, সে শাস্তি গ্রহণ করবার মতো তাদের শরীরের অবস্থা থাকতো কিনা, কোনো ডাক্তারই সে বিষয়ে কোনো দিনই পরীক্ষা করে দেখেনি।

এই সকল ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করার আইন অনুসারে তাকে অভিযুক্ত করা হয়।

আসামীর সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে তার ডায়েরীর আর দুটী পাতা পড়া দরকার।

১৯৪২ সালের ৫ই সেপ্টেম্বার তারিখে ক্রেমার লিখেছে যে গার্ডেরা সকলে গ্যাস দিয়ে হত্যা করার কাজে অংশ নেবার জন্ত চেঁচামিচি করছে, কেননা যারা এই কাজে অংশ নিতো তারা উপরি খাদ্য পেতো। ডায়েরীর কোনো অংশেই আমরা পাইনা যে আসামী নিজের কর্ত্তব্য কাজ থেকে ছাড়া পেতে চাইছে। জেরার সময় সে বলেছে যে সেও অন্তদের মতো উপরি খাদ্য পেতো। ডায়েরীতে আসামী বলেছে যে সে আউশভিৎস্ থেকে অনেক সময় পার্শেল পাঠিয়েছে। জেরার চোটে সে বলে যে এই পার্শেলে বন্দীদের ব্যাগ থেকে নেওয়া অনেক জিনিষ থাকতো। এইসব জিনিষ প্যাক করে ক্রেমার, রাইখে নিজের আত্মীয় স্বজনের কাছে পাঠাতো।

"বিচার থেকে"

আউশভিৎসের ক্যাম্পে মেয়েদের নিয়েও অনেক রকম পরীক্ষা হতো। চারশো মেয়েকে ১০ নং ব্যারাকে রাখা হতো, এক্স-রে আলোকের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে তাদের বন্ধ্যাত্ব এনে দেওয়া হতো, তারপরে তাদের ওভারি কেটে নেওয়া হতো। কৃত্রিম উপায়ে তাদের জরায়ুতে ক্যান্সার রোগ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হতো, পরীক্ষার জন্যে সময়ের পুর্বে সন্তান ভূমিষ্ঠ করানো হতো, এক্স-রে ছবি তোলার জন্য জরায়ুতে একপ্রকার অস্বচ্ছ পদার্থ ইন্‌জেক্‌শান্‌ করা হতো।

২৮নং ব্যারাকে নানাপ্রকার অসংস্কৃত তেল নানাপ্রকার লবণ, মলম ও পাউডার দ্বারা পরীক্ষার ফলে অনেকের চামড়া নষ্ট হয়ে গিছলো। এই ব্যারাকেই কৃত্রিম উপায়ে পাণ্ডুরোগ আনার জন্যে এ্যাক্রিডিন ব্যবহার করা হয়েছে। ২০ নং ব্যারাকে একধার থেকে সব পুরুষের মুস্কচ্ছেদন করা-হতো; পুর্ব্বে এক্স-রের সাহায্যে যে অনুর্বরতার সৃষ্টি করা হয়েছিল তার ফল পুরুষাঙ্গে কি হয় সকলেই জানে।

১৯৪১ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৪ সাল অবধি ক্যাম্পের প্রধান ডাক্তার এনট্রেসেবের আদেশ অনুসারে আউশভিৎসের বন্দীদের হৃৎপিণ্ডে ফেনোল ইঞ্জেক্‌শান্‌ করে মারা হয়েছিল। মৃতের সংখ্যা বহু সহস্র ছিলো।

যে সকল বন্দী রুগ্ন বা ক্যাঁকাসে ছিলো জার্মাণ ডাক্তাররা নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে হত্যার জন্যে তাদের মনোনয়ন করতো।

পরীক্ষার জন্যে বন্দীদের দেহে কৃত্রিম উপায়ে ম্যালেরিয়ার বীজ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হতো। কৃত্রিম উপায়ে মেয়েদের গর্ভ সঞ্চার করা হতো। এই সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্যে গিনিপিগের মতন

যে সকল পুরুষ ও নারীকে ব্যবহার করা হতো, হয় তারা অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে মারা যেতো বা চিরজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যেতো। আউশভিৎসের একজন লোক সাক্ষ্যে বলে "আমি চিকিৎসকের সহকারী হিসাবে কাজ করতুম এবং জার্মাণরা আমাকে নানানপ্রকার ইঞ্জেক্শান ও নানারূপ চিকিৎসা করবার জন্যে আদেশ করতো। আমি জানি অনেক বন্দীর পায়ের ডিমে অসংস্কৃত তেল ইঞ্জেকশান করা হতো। অনেক সময় চামড়ার ওপর শতকরা ৮০ ভাগ এলুমিনিয়াম এসেটিকাম ব্যবহার করা হতো। পরে চামড়ার ঐ অংশটুকু কেটে নিয়ে পরীক্ষা করা হতো। অনেক সময় আঘাত যদি গভীর হতো তবে চামড়ার সঙ্গে খানিকটা মাংসপেশীও তুলে আনা হতো।

সসনোভ্স্কা তাঁর বক্তৃতা "কাঁটা তারের ভিতর নারীর জীবন" সম্বন্ধে বলেন যে একবার তিনি হার্টে ফেনোল ইঞ্জেকশান দেখেছিলেন। তিনি যে ঘরে ছিলেন এবং যে ঘরে রোগী ছিলো, এই দু ঘরের মাঝখানে একটী পাতলা পর্দা ছিলো। পাশের ঘর থেকে রোগীর কাতর মিনতি, রোগীর যন্ত্রণায় চীৎকার এবং সর্বশেষে রোগীর মৃত্যু আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলেন। কয়েক মুহূর্ত বাদে হতভাগ্যের মৃতদেহ সরিয়ে নেবার আদেশও তিনি শুনেছিলেন। এরকম ভাবে কত গর্ভবতী মাতা এবং কত শিশু সন্তানের জননী প্রাণ হারিয়েছে!

ডাক্তার অকোলস্কি বলেন বন্দীদের এভিপান খাইয়ে বা শিরার ভেতর পেট্রোল অথবা ফেনোল ইঞ্জেকশান করে মারা হতো। ডাক্তার অকোনস্কি বলেন "এ ব্যাপার নিম্নলিখিতভাবে হতো: কোন জার্মাণ ডাক্তার যে সব রোগী সেরে উঠছে তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে বেছে নিতো। তাদের তৎক্ষণাৎ অপারেশান থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে পূর্বোক্ত প্রণালীতে চিকিৎসা করা হতো।" প্রথম প্রথম ডাক্তার নিজেই এ কাজ করতো, পরে তার সহকারীরা।

ডাক্তার ডেরিং, আউশভিৎসের আর একজন বন্দী, বলেছে সে একবার একজন জার্ম্মাণ ডাক্তারকে দেখে এক বন্দীর শিরায় বাতাস ঢুকিয়ে দিতে। এই প্রণালীটি অত্যন্ত বিপদজনক। মনে করা যায় এর ফলে

মৃত্যু অনিবার্য কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো খারাপ ফল হয়নি। এই ডাক্তারই আর এক রোগীর শিরায় ইথার ইঞ্জেকশান করেছিলো। এর ফলে রোগীটি বিমূঢ় হয়ে পড়ে, অন্য কোনো খারাপ ফল হয়নি। যাদের শরীরে অসংস্কৃত তেল ইঞ্জেকশান করা হতো তাদেরই অবস্থা খারাপ হতো।" তাদের প্রতিটী গাঁটে ঘা হয়ে চলাফেরা একেবারে অসম্ভব হতো। শিরায় পেট্রোল ইঞ্জেকশানের ফলে অনেকসময় মৃত্যু ঘটেছে। ১০ সি, সি কার্বলিক এসিড শিরায় দেওয়ার ফলে তৎক্ষণাৎ অনেকের মৃত্যু হয়েছে। ইঞ্জেকশান দেবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে যায়, তার দেহ বেঁকে যায় এবং একটী ক্ষীণ আর্তনাদের পরই মৃত্যু ঘটে। দুজন বন্দীকে চেয়ারে বসান হয়েছিল। দুটো চেয়ারের পেছন একসঙ্গে লাগান ছিল। রোগীর পরিদর্শকটী নিপুণভাবে হার্টে ইঞ্জেকশান করে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু আসে।

ডাক্তার, এফ, ফ্রিডমান তার "এই হলো অসভিয়েচিম" বইয়ে লিখছেন যে জার্মাণ ডাক্তাররা, টাইফাস রোগের জীবাণু পুর্ব ও পশ্চিমের ইউরোপীয়ান ইহুদীদের ওপর কিভাবে কাজ করে তার পরীক্ষা করতো। পুর্ব ইউরোপীয়দের চেয়ে পশ্চিম ইউরোপীয় ইহুদীরা এই জীবাণু দ্বারা বেশী আক্রান্ত হতো। মনোওয়াইসে ডাক্তার ফোয়েনিগ এক পরীক্ষা করেছিলেন—মানবদেহে তড়িৎ শক্তির প্রভাব। তিনি বন্দীর মাথার খুলির ভেতর তড়িৎ শক্তি পাঠাতেন। অনেকেই মারা যেতো। ডাক্তার ফ্রিডম্যান আরও বলেন যে আউশভিৎসে যুবকদের অনুর্বর করার কাজ খুব বেশী হতো, এক্সরের সাহায্যে তাহাদের অণ্ডকোষে আলোকপাত করার পর তাদের মুষ্কচ্ছেদন করা হতো। মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষার জন্য এই অণ্ডকোষগুলি Wroclawতে পাঠানো হতো। ওয়ালিগোরা বলে এক বন্দী বলেছে যে বারকেনাউতে ১৮ থেকে ৩০ বছর অবধি ছেলেদের মনোনীত করা হতো, প্রায় ২০০ জন ছেলেকে অনুর্বর করা হয়। ২ মাস বাদে ওয়ালিগোরার মুষ্কচ্ছেদন হয়।

প্রফেসের কনবার্গ যে হাসপাতাল চালাতেন সেই হাসপাতালে মেয়েদের কেনা হ'তো। প্রত্যেক মেয়ের জন্য সপ্তাহে ১ মার্ক দেওয়া হ'তো।

মেয়েদের ওপর যে পরীক্ষা হ'তো তার প্রথম প্রণালী ছিল—তাদের গর্ভাশয়ে ও ওভারিতে এক প্রকার অস্বচ্ছ পদার্থ ইনজেকসান করা, পরে এক্সরে দ্বারা মেয়েদের সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করা। এই পরীক্ষা অত্যন্ত নির্ম্মম ভাবে ও অবহেলার সহিত করা হ'তো। যদিও যন্ত্রপাতিগুলি পরিশোধন করা হ'তো, হাতগুলি কোনদিনই ধোওয়া হতনা। ইনজেকশানের পর রোগীর খুব জ্বর আসতো এবং যন্ত্রণায় ছটফট করতো। স্যালপাইনজাইটিস, স্যালপাইঙ্গো-উফোরাইটিস, পেরিটোনাইটিস প্রভৃতি জটিলতার সৃষ্টি হ'তো। প্রফেসর কনবার মেয়েদের টেম্পারেচার চার্ট দেখা ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা করতেন না। এরপর রোগীরা ডাঃ 'ক্রুডা'র চিকিৎসায় চলে যে'ত। সব বয়সের মেয়েদের পরীক্ষার জন্য নেওয়া হ'তো। এদের মধ্যে বয়স্থাও ছিলো এবং ছেলেমানুষও ছিল, কুমারীও ছিল এবং সন্তানের জননীরাও ছিল। সবশুদ্ধ ৩০০ জন মেয়ে ছিলো। প্রফেসরের ইচ্ছা ছিলো এদের উপরে কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ সঞ্চারের পরীক্ষা করবেন। ২৫০ মেয়ে এবং ৪০০ পুরুষের জন্য একটি বিশেষ বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল। প্রফেসর যেসব নোট করেছিলেন এবং পরে যেগুলো মিত্রশক্তির হাতে পড়ে তার থেকে জানা যায় কারও উপর কৃত্রিম উপায়ে এবং কারও উপর স্বাভাবিক উপায়ে গর্ভসঞ্চারের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। প্রথম সহবাসের দিনগুলি থেকে এক্সরে ফোটোগ্রাফ নেবার কথা হয়েছিলো, যাতে গর্ভসঞ্চারের প্রথম দিক থেকেই সব ছবি পাওয়া যায়। জার্ম্মানীর পরাজয় আসন্ন হওয়াতে বার্লিন থেকে এই পরীক্ষা করার জন্য কোনোরূপ আদেশ আসেনি।

আর একজন প্রফেসর ডাঃ 'সুম্যান' ১৮ থেকে ২৫ বছরের ছেলেদের ও ১৫ থেকে ১৯ বছরের মেয়েদের উপর পরীক্ষা করতেন। তিনি প্রায় ৬০ জন অতি সুন্দরী ও ছেলেমানুষ মেয়েদের বেছে নিয়েছিলেন। সেখানে ৭০০ জন পুরুষ ছিলো। ডাঃ সুম্যান ষ্টেশানের প্ল্যাটএর্ম্মে গিয়ে যেসব গ্রীক ইহুদীরা এসেছিলো তাদের কাছ থেকে 'পদার্থ' সংগ্রহ করেন। ৫০ বৎসর বয়স্ক প্রফেসর সুম্যান একদমই জানতেন

না কি ভাবে এক্সরের দ্বারা মেয়েদের ওভারিকে নষ্ট করা যায়। 'বার্কেনাউর' ব্যারাকে মেয়েদের উপর এক্সরে ব্যবহার করা হ'তো। পাঁচ কি ছয় সপ্তাহ বাদে একদল মেয়ের ডানদিকের ওভারি এবং দ্বিতীয় দলের বাঁদিকের ওভারি অপারেশান করা হয়েছিল। পরীক্ষার জন্যে এই ওভারীগুলি হামবুর্গ'এ পাঠান হয়েছিলো।

গ্যাস চেম্বারে যাবার আগে মেয়েরা অসহ্য যন্ত্রণা পেতো ভুলভাবে এক্সরের ব্যবহারের জন্য। এই ক্ষত গুলি থেকে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ বেরুতো এবং ঘরে গ্যাসের সৃষ্টি করতো। যদিও উঠানের দিকে ঘরের তিনটি জানালা খোলা থাক'ত তবুও ঘরের গন্ধ অসহ্য হয়ে উঠতো। অপারেশানের তিনমাস বাদে ক্ষত শুকোতে আরম্ভ করতো। মেয়েরা অত্যন্ত দুর্বল এবং কঙ্কালসার হয়ে যেত। বেশীর ভাগ মেয়েদেরই জরায়ু সংক্রান্ত গোলমালের সৃষ্টি হতো, মাথায় রক্ত উঠে যাওয়া, মাথা ব্যথা, হঠাৎ ঘাম হওয়া প্রভৃতি নানারকম অসুখের সৃষ্টি হ'তো। ১৫ এবং ১৬ বছরের দুটি মেয়ের উপর পরীক্ষা হয়েছিলো। প্রায় ৮ মাস ধরে দুজনে পেট খোলা ছিলো এবং খারাপভাবে এক্সরে দেওয়ার ফলে তাদের বহু স্থানে পুড়ে গেছলো। মেয়ে দুটি খালি পাশ ফিরে শুতে পারতো। অনেকদিন ধরে তারা কষ্ট পেয়েছিলো।

অন্যান্য অপারেশানের মধ্যে জরায়ুর মুখ অপারেশান করা হ'ত।

তিনি ব্যারাকের প্রত্যেক মেয়েকে পরীক্ষা করতেন এবং জরায়ুর মুখে সামান্যতম পরিবর্তন দেখলেই অপারেশান করতেন। অনেক সময় খুব বেশী রক্তস্রাব হ'তো। কাটা অংশগুলি কাটগাট'এ ঝুলিয়ে হামবুর্গের ল্যাবোরেটরিতে পাঠান হ'ত। পরীক্ষার ফলে ক্যানসার না পাওয়ায় এই এক্সপেরিমেণ্টগুলি বন্ধ হয়েছিল। মেয়েরা বার্কেনাউতে ফেরার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাদের দাহস্থানে পাঠান হ'তো।

"মানুষের নৃশংসতা ও জার্মানদের নৃশংসকাজের নমুনা" অধ্যাপক প্র্শিভো দোমব্রাউস্কি।

১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসের প্রথমদিকে সোভিয়েট সৈন্যদলের অগ্রগতির ফলে 'ক্রাকোভপ্লাশোভ্ বন্দীশিবির খালি করবার আদেশ এলো। বেশীর ভাগ মেয়েদের আগে পাঠান হয়েছিলো। তাদের মধ্যে আমার মা ছিলেন। ১৩৫ জন মেয়েদের সঙ্গে তিনি যখন রান্নাঘরে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তখন আমি তাকে ফল খেতে দিয়েছিলাম। পরের দিন ৫,০০০ লোকের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। প্রায় ৩ দিন ৩রাত্রি প্রচণ্ড গরমে এক ফোঁটা জল না খেয়ে এ ওর ঘাড়ের উপর পা ছড়িয়ে বসেছিলুম। আমরা যখন 'মাউতাউসেন'এ পেঁাছলুম মালগাড়ী থেকে অনেক মৃতদেহ বার করতে হয়েছিল। তৃষ্ণা কাকে বলে আমি তখনই বুঝতে পারলুম, তৃষ্ণায় মানুষ প্রস্রাবও খায়। তৃষ্ণার্ত হয়ে আমরা যখন পেঁাছলুম তারপরও তিনদিন প্রচণ্ড রোদে থাকতে হয়েছিলো। এরপর আমাদের সামান্য একটু করে বাঁধাকপির সুরুয়া ও একটুকরা করে রুটি দেওয়া হয়েছিলো।

তিনদিন ধরে আমাদের জার্মানীর এক ভীষণতম প্রস্তর খনিতে পাথর বহন করতে হয়েছিল। এই খনিতে ১৮৬ টা সিঁড়ি ছিল। এই সিঁড়ি দিয়ে দিনের মধ্যে প্রায় ৭বার আমাদের উঠানামা করতে হতো। আমাদের মারা হতো। কখনও কখনও গুলি ছোঁড়াও হ'তো। আমরা যখন পাথর বইতাম তখন গার্ডরা দাঁড়িয়ে থাকত, প্রখর রৌদ্রে আমাদের মুণ্ডিত মস্তক প্রায় পুড়ে যেতো। খোয়াতে পা কেটে যেতো। এইখানে আমার আমাশায় হয়েছিলো। কেননা জল পচে একেবারে সবুজ হয়ে গিছলো। গার্ডদের মারধোর সত্ত্বেও তৃষ্ণার

সময় আমরা ঐ জল পান করতুম। এইখানে অনেক লোক পেরিটোনাইটিস ও অন্ত্র ছিন্ন হওয়াতে মারা গিয়েছিলো। এই হতভাগ্যরা অপরিসীম যন্ত্রণায় গার্ডদের কাছে মৃত্যুভিক্ষা করতো। গার্ডরা হেসে বলতো তোমাদের মারা মানে পয়সা খরচ করে গুলি নষ্ট করা। কয়েক মুহূর্ত বাদেই এই গার্ডরাই সুস্থ লোকেদের গুলি করে মেরেছিলো। খনিতে কাজ করার তিন দিন বাদে আমাদের মাউতউসেন থেকে চার মাইল দূরে দু নম্বর গুসেন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো।

আমরা দিনে ১২ ঘণ্টা খাটতুম। সকালে সাড়ে তিনটের সময় উঠে আমরা কাজে লাগতুম ও রাত দশটা অবধি এক একদিন কাজ করেছি। সমস্তদিন না খেয়ে ঠাণ্ডায় বর্ষায় ভিজে, মার খেয়ে আমাদের কাজ করতে হতো। সব চেয়ে কষ্ট দিত উকুনরা। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি অবধি এই অবস্থা চললো। এর পরে লাথি খেয়ে আমার পায়ে ঘা হয়ে গিছলো। আমি রুটী খেতুম না, কেবল অল্প একটু সুপ খেতুম রুটীর বদলে। আমি কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলুম। কয়েকদিন বাদে আমি এত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম যে একটুকরো করে রুটী খেতে বাধ্য হলাম এবং পরদিনই আমাকে কাজে যেতে হয়েছিলো। কাজ থেকে আমাকে প্রায় হিঁচড়ে আনতে হতো, গার্ডরা অসম্ভব মারতো। আবার আমি না খেয়ে, ব্যারাকে শুয়ে রইলাম। আর কয়েকদিন হলে আমার পা সম্পূর্ণ সেরে যেতো, এমন সময় একদিন ১লা ডিসেম্বর ৬টার সময় আমাদের ব্লকের পাণ্ডা স্ত্রিবার এসে বললে যে পরের দিন সকালে আমায় কাজে যেতে হবে। কাজে না গেলে আমাকে মারের চোটে শেষ করা হবে। সকাল ৮টার সময় অন্যান্য বন্দীরা এসে আমায় বলে "তোমার কপাল ভাল, যারা অসুস্থ আর দুর্বল তাদের গ্যাস চেম্বারে পাঠানো হচ্ছে, তোমাকেও পাঠানো হচ্ছিলো খুব বেঁচে গেছো।"

১৯৪৪ সালের ১লা ডিসেম্বর আমার জীবনের এক ভয়াবহ দিন গেছে। বন্দীদের ডোরাকাটা সুতীর একটা স্যুট পরে, ইজের, বুট বা টুপী কিছুই ছিলনা, আমি সকাল ৮টা থেকে রাত ১টা অবধি

জল কাদা ভেঙে, বরফে ভিজে কাজ করেছি। হু হু করা ঠাণ্ডা বাতাস দেহের চামড়া ভেদ করে যাচ্ছিলো। আমার সমস্ত পা'টা বেলুনের মতো ফুলে গিছলো, গায়ে জ্বর, পায়ের আঙুলগুলো অসাড় হয়ে গিছলো। আমাদের একটা ব্যারাকে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল, কোনো রকম চিকিৎসা হয়নি, ক্ষতস্থানও ধোয়া হয়নি বহুদিন ধরে। আমাদের অসুখের ইতিহাস পরে পাঠানো হয়েছিলো। আমি প্রায় ২ মাস অসুস্থ ছিলাম।

১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি ক্যাম্পে সকলকে অনাহারে কাটাতে হয়েছিল। প্রায় ২২দিন ধরে কাউকে রুটী দেওয়া হয়নি, কেবল মাত্র একটু শালগমের সুপ দেওয়া হয়েছিলো, তাতে ময়দা মাখন বা নুনের চিহ্ন মাত্র ছিলনা অথচ রান্নাঘরের সামনের রাস্তায় নুন ছড়ানো হয়েছিলো।

পূর্বদিকের সকল ক্যাম্প থেকে লোক সরানো আরম্ভ হলো, আউশভিৎস, গ্রস্ রসেন এবং অন্যান্য ক্যাম্প থেকেও। রোগীদের ওয়ার্ড সবসময় ভর্তি থাকতো। আমরা চারজন করে এক বিছানায় শুতাম। সবলরা দুর্বলদের মেরে ফেলতে লাগলো। লোকে এখানে মরতে আসতো চিকিৎসা করতে নয়। আমিও অনেকদিন আগেই মরে যেতাম, যদি না আমার এক বন্ধু গোপনে আমায় খাদ্য যোগান দিতো। একজন ডাক্তার ছিলো, সে আমাকে ঠিক সময়ে একটা কাজ যোগাড় করে দিয়েছিলো, তাঁকে আমার অশেষ ধন্যবাদ।

বহু দিন গেল চলে এমনি করে। এপ্রিল মাসের প্রথমে অনাহারের দ্বিতীয় পর্ব এলো। বন্দীরা নিজেদের বিষ্ঠা খেতে লাগলো, দু'জন লোক মানুষ খেয়েছিলো। ৫ই মে যখন আমেরিকানরা আসে ততদিন অবধি আমরা অনাহারে কাটিয়েছিলুম।

বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাবার কিছুদিন পুর্বে আমাদের দু'হাজার সহবন্দীদের গ্যাস দিয়ে মারা হয়। কি আশ্চর্যজনক ভাবে আমি বেঁচে গেছি তা' বলা যায়না।

এই ঘটনার বিবরণ যখন আমি লিখছিলুম তখন আমার একটা

ছেলেদের খেলার কথা মনে পড়ে গিছলো। একটি ছোট ছেলে এক মুঠো বালি নিয়ে বলে "আমার এতগুলো ছেলে ছিল।" ছেলেটা তারপর বালিগুলো মাটির ওপরে ছুঁড়ে দেয়, কিছু বালি মাটীতে পড়ে যায়। তখন সে বলে "এতগুলো মারা গিছলো।" বাকী বালিটুকু হাতদিয়ে ধরে ছেলেটা বলে "এতগুলো বেঁচে রইলো।"

পাঁচ বছর ধরে আমাদের এরকম ভাবে ছোঁড়াছুঁড়ি আর বাছাবাছি করা হয়েছিলো।

"অজ্ঞাত রোজনামচা"

ক্র্যাকোভে "সুপ্রীম স্টেট ট্রাইবুনালের" সামনে আউশভিৎস ক্যাম্পের চল্লিশ জন কর্মচারীর মামলা হয়। এই মামলার ১৭ দিনের দিন বহু জনসাধারণ কোর্টে উপস্থিত ছিলো।

প্রায় ১৫০০ লোককে জায়গার অভাবে কোর্ট রুম থেকে ফিরে যেতে হয়েছিলো। বৈদেশিক দর্শকদের আসনও জনসাধারণ দখল করেছিলো। এই বিচারে সোভিয়েট ইউনিয়ানের কন্সাল, রিপাবলিক অব ফ্রান্সের কন্সাল এবং বৈদেশিক দুতাবাসের উচ্চ কর্ম্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল কুদ্রিয়াভ্ৎসেভ্ যিনি নাৎসী অপরাধের অনুসন্ধান করবার জন্য যে কমিশন বসেছিল তার চেয়ারম্যান ছিলেন তিনিও মস্কো থেকে এসেছিলেন।

বিচারের সময় যে সকল ফরাসী সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন তার মধ্যে বিখ্যাত প্রফেসর লাঙ্গেভিনের কন্যা ছিলেন। তিনি ট্রাইবুনালের সামনে জার্মানদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন যে সমস্ত জার্মান জাতির নিষ্ঠুরতার প্রতীক ছিলো আউশভিৎস।

প্রথম সাক্ষ্য দেন জেনারেল চার্লস ফারবি। ইনি ফরাসী আপীল কোর্টের প্রেসিডেণ্ট। ফরাসী অধিকৃত জার্মানীতে যে বিচার বিভাগ ছিলো; তারাই এঁকে পাঠিয়েছিলো জার্মানদের অপরাধের অনুসন্ধানের জন্য।

এই পারদর্শী সাক্ষী বলেন যে তিনি ফ্রান্সের এবং বিশেষ করে ফরাসী বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে এসেছেন সমগ্র ফরাসী জাতি যাতে সুবিচার পায় সেই জন্যে।

জেনারেল ফারবি বলেন "আমার যে সকল সহকর্মী আউশভিৎস থেকে আর ফেরেননি, আমি আজ তাদের হয়েও বলতে এসেছি।"

জেনারেল ফারবি, ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে পোলিশ সরকারকে ধন্যবাদ জানান এই মহৎ কাজ করবার জন্য তাঁরা তাঁকে যে সকল সুখ সুবিধা দিয়েছেন তার জন্য।

ফরাসী দেশের অধিকৃত অঞ্চলে যে মাউতাউসেন, নাৎসওয়েলার প্রভৃতি জার্মান ক্যাম্প ছিলো তাদের বিষয় বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করবার পর সাক্ষী জোর দিয়েই বলেছিলেন যে আউশভিৎসের মতন বীভৎস ক্যাম্প আর কোথাও ছিলনা। আউশভিৎসের যে ১২০,০০০ লক্ষ ফরাসী বন্দী ছিলো তার থেকে মাত্র ৩০০০ বন্দী ফ্রান্সে ফিরে এসেছিলো।

জার্মান ছাড়া অন্য যে কোনো জাতকেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হতো। আউশভিৎসে জার্মানদের এই উদ্দেশ্য সর্বপ্রকারে সফল হয়েছিলো।

যদি না ঠিক সময়ে লাল ফৌজ আসতো এবং মিত্রশক্তি এই অমানুষিক অত্যাচার বন্ধ করতো, পৃথিবীর বুক থেকে জার্মানদের তথাকথিত সমাজতন্ত্র সকল জাতকে মুছে দিতো। নাৎসীবাদ এমন একদল মানুষ তৈরী করেছিলো যারা অহমিকায় মত্ত ছিলো, যাদের মনে কোনোরূপ সঙ্কোচ ছিলনা। মানুষের আধ্যাত্মিক যে মূল্য আছে নাৎসীরা একেবারেই ভুলে গিছলো। এইসব লোকেরা শুধু মানুষের দেহ নয় তার আত্মাকেও হত্যা করে ছিল।

জেনারেল ফারবির সাক্ষীর পর হেলেন লাঙ্গেভিন সলোমান, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জ্যাকোয়ে সলোমনের বিধবা স্ত্রী, ফরাসী ন্যাশনাল এসেম্বলীর পূর্বতন সহকারীকে ট্রাইবুনালের সামনে ডাকা হয় সাক্ষ্যদানের জন্য। ১৯৪২ সালে যে বহু লোককে বন্দী করা হয় তিনি তার বর্ণনা দেন।

বন্দীর স্বামীকে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে জার্মানরা হত্যা করে। ঐ বছরে মার্চ মাসে প্রথম বন্দীদলকে ফ্রান্স থেকে আউশভিৎসে পাঠানো হয়, দ্বিতীয় দল জুন মাসে, এবং এর পর প্রতি সপ্তাহে ট্রেণ ভর্তি করে বন্দীদের আউশভিৎসের মৃত্যুপুরীতে পাঠানো হয়।

১৯৪৩ সালে জানুয়ারী মাসে হেলেন লাঙ্গেভিন সলোমন বন্দী হয় আউশভিৎসে। সাক্ষী বলেন চৌদ্দবৎসরের কম বয়স এর প্রায় ৮৪৫০ ফরাসী ছেলেমেয়েদের বন্দী করা হয়। ক্যাম্পে তাদের কাছে জার্মানরা অঙ্গীকার করে যে শীঘ্রই তারা পিতামাতার সঙ্গে মিলিত হবে। সাক্ষী খুব জোর দিয়ে বলেন "সেবার জার্মানরা নিজেদের প্রতিজ্ঞা বজায় রেখেছিলো কেননা ঐ সব ছেলেমেয়েরা তাদের পিতামাতার সঙ্গেই গ্যাস চেম্বারে প্রবেশ করেছিলো, একজনও বেঁচে থাকেনি মুক্তি পাবার জন্যে।"

সাক্ষী অনেক বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক ও তাঁদের পরিবারবর্গের কিভাবে আউশভিৎসে ক্যাম্প মারা যান তার বর্ণনা দেন।

ফ্রান্সের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও কত শ্রেষ্ঠ ফরাসী সন্তানের নাম যে এই মৃত্যু তালিকায় ছিলো তার ইয়ত্তা নেই। সাক্ষী বলেন যে জার্মানরা তাঁর দেশের সমস্ত মনীষিদের নষ্ট করে দিতে চেয়েছিলো।

"আউশভিৎস ক্যাম্পে এই সব কটি প্রণালীই প্রয়োগ করা হয়েছিলো। আউশভিৎস ক্যাম্প যে শুধু কনশেনট্রেশান ক্যাম্প ছিলো তা নয় এটা একটা বিরাট মৃত্যুর কারখানা ছিল যেখানে অসংখ্য লোককে একসঙ্গে মেরে ফেলা হতো। শুধু তাই নয় এদের দেহের প্রতিটী অংশ জার্মান রাইখের কাজে লাগানো হতো। যাদের হত্যা করা হতো তাদের দেহের ভস্মাবশেষ জার্মাণ কৃষি শিল্পে প্রয়োজন হতো; মেয়েদের মাথার চুল জার্মাণ শ্রমশিল্পে লাগানো হতো, বন্দীদের জুতো, ইজের ও অন্যান্য কাপড়চোপড় জার্মান জনসাধারণের প্রয়োজনে ব্যবহার হতো, এই কাপড়গুলিতে রক্তের চিহ্ন থাকা সত্বেও এবং মানুষের মর্মন্তুদ দুঃখের এই চিহ্নগুলি জার্মাণ জনসাধারণ ব্যবহার করতো।"

"সোভিয়েট জনসাধারণের অভিমত ছিলো যে, এই সোভিয়েট ষ্টেট কমিশনের গৃহীত সকল তথ্য পোলাণ্ডের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে জানানো প্রয়োজন কেননা আউশভিৎস ক্যাম্পে ২১টী দেশের লোক মারা গিয়েছে তার মধ্যে বেশীর ভাগই পোলাণ্ড ও সোভিয়েট ইউনিয়নের লোক। জার্মানীর অন্য প্রদেশের যত কনশেনট্রেশান ক্যাম্প ছিলো সে সব জায়গা থেকে

বন্দীদের আউশভিৎস এ পাঠানো হতো বিনাশের জন্য। কেননা অন্যান্য ক্যাম্পে আউশভিৎসের মতো তাড়াতাড়ি মানুষকে মারা যেতোনা।"

"এই বিশেষ সোভিয়েট ষ্টেট কমিশন, আউশভিৎসে অনুসন্ধানের সময় প্রায় ২০০ জন সাক্ষীর জবানবন্দী নিয়েছেন। এতগুলি লোকের বিবরণ থেকে নিশ্চয়ই আউশভিৎসের একটা সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যেতে পারে।"

প্রফেসর আরো বলেন "সব বন্দীকেই সোজাসুজি হত্যা করা হতোনা। বেশীর ভাগ লোককে অত্যন্ত শ্রমজনক কাজ দিয়ে আস্তে আস্তে শেষ করা হতো। বিশেষ করে আই, জি ফারবেন ইণ্ডাষ্ট্রীর এক বিরাট কারখানা তৈরী করতে এদের প্রয়োজন হতো। এই কারখানা তৈরী করতে সোভিয়েট, পোলিশ, চেকোশ্লোভ, গ্রাক ও ডাচ যুদ্ধ বন্দীদের ব্যবহার করা হ'ত।

যে সব সাক্ষী এই বিশেষ কমিশনের সামনে এজাহার দিয়েছিলো, তার থেকে প্রফেসার একটী বিশেষ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এই সমস্যা হচ্ছে—১৪০০ সোভিয়েট যুদ্ধবন্দীর যারা তিনমাসের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা পেয়ে মারা গিছলো।

দ্বিতীয় দল যাতে ৭০০০ বন্দী ছিলো তাদের সকলকেই গ্যাস চেম্বারে পাঠানো হয়। ক্যাম্পে পৌছোবার সঙ্গে সঙ্গেই সকল বন্দীকে মারা হতোনা। বিশেষ কমিশনের হাতে যে দলিলপত্র আছে তার থেকে এ তথ্য প্রমাণিত হয়।

এই দলিল ১৫ই নভেম্বার ১৯৪১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে হিমলার সোভিয়েট যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করবার আদেশ রদ করেছিলো, কেননা এই বন্দীরা অতি শ্রমসাধ্য কাজ করতে পারতো।

সাক্ষীদের এজাহারে প্রকাশ, ২০০ জনের মধ্যে ১৫০ জন সোভিয়েট বন্দীকে রোজ হত্যা করা হতো। মৃতদের সহিত আহত বন্দীদেরও দাহস্থানে পাঠানো হতো। প্রফেসর আরও বলেন যে আসামী বন্দীদের ওপর অত্যাচার করবার আদেশ দিতো সানন্দচিত্তে। সাক্ষী লাইবেহেনসেলের আদেশ পত্র যেটা ১৯৪৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী জারি হয় সেটা থেকে পড়ে শোনান :

"আমাদের হাতে যত মানুষ আছে সকলের মিলিত শক্তি জার্মান সৈন্যদলের প্রয়োজনের জন্যে ও জার্মান অগ্রগতির জন্য ব্যবহার করতে হবে। আমি বহুদিন ধরে গভীরভাবে অনুসন্ধান করে দেখেছি যে আমাদের সকল ব্যবসা বাণিজ্যে বড় বেশী বন্দীদের লাগানো হয়।"

"মানুষের এই শক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে কাজে লাগানো হচ্ছে না। ঠিক মতো পরিদর্শনের অভাবই এর কারণ। আমাকে এরকম অবস্থার শেষ করতে হবে। আউশভিৎস ক্যাম্পের লোক বাঁটোয়ারা করবার ক্ষমতা যখন সব আমার, তখন আমি নিজে সব কাজের জন্যে এমন কি আউশভিৎসে ক্যাম্পের কাজের জন্যেও লোক বাঁটোয়ারা করে দেবো। যাই হোক আমি যখন কোনো কাজের ব্যবস্থা করবো তখন আমার প্রধান উদ্দেশ্য হবে যাতে অল্প সংখ্যক লোক দিয়ে যে কোনো অবস্থাতেই বেশী কাজ করানো যায়।" স্বাক্ষরিত—লাইবেহেনশেল

প্রফেসর আরও বলেন "আমি যে দলিল এখন পড়লুম তার থেকে বিশেষ কমিশন এই তথ্য উপলব্ধি করেছেন যে সহকারীরা যে অত্যাচার, অন্যায় ব্যবহার করেছে তা অচিন্ত্যনীয় ও অবর্ণনীয়।"

প্রফেসর কয়েকজন সাক্ষীর এজাহারের কথা বলেন, যা থেকে জানা যায় যে ১৯৪৩ সালে আউশভিৎসে ক্যাম্পে যে ৩৯১ জন কমিউনিষ্ট পার্টির মেম্বার এসেছিলো, তারা সকলেই অনাহারে মারা যায়। নানান্ কনশেনট্রেশান ক্যাম্প থেকে সোভিয়েট যুদ্ধবন্দীদের আউশভিৎসে নিয়ে আসা হয় মেরে ফেলার জন্য—৪০০ থেকে ৫০০ বন্দী রোজ মারা যেতো। নাৎসীরা এই সোভিয়েট নাগরিকদের এত ঘৃণা করতো যে সমস্ত ক্যাম্পের সামনে তাদের হত্যা করা হতো।

বন্দীদের ওপর যে ডাক্তারী পরীক্ষা হয় প্রফেসর সে কথাও বলেন। সব জাতের বন্দীরা বিশেষ করে রাশিয়ান, পোল, চেক, যুগোস্লাভ এবং ফরাসী বন্দীদের এক্স-রের সাহায্যে অনুর্বর করে দেওয়া হতো। এদের নিষ্ঠুরভাবে পঙ্গু করে দেওয়া হতো। তাদের পরে গ্যাস চেম্বারে পাঠাতো। বিশেষ কমিশন অনেক অনুসন্ধানে জানতে পেরেছে যে বন্দীদের পেট্রোল ইঞ্জেকশান করা হতো ও জীবন্ত অবস্থায়

তাদের গায়ের মাংস তুলে ফেলা হতো—গবেষণামূলক পরীক্ষার জন্য। এই সকল নিষ্ঠুর কার্য্যে ডাক্তারদের সঙ্গে ক্যাম্পের অন্যান্য কর্মচারীরাও অংশ গ্রহণ করতো। এইভাবে তারা জার্মান রাইখ গবর্ণমেন্ট, জার্মান আর্মি হাই কমাণ্ড, ক্যাম্পকমাণ্ড ও গেষ্টাপোদের অপরাধমূলক কাজে সাহায্য করতো।"

জার্মানরা নিজেদের অপরাধের চিহ্ন কি করে নিঃশেষে মুছে দিতো সেই কথা আলোচনা করতে গিয়ে প্রফেসার আউশভিৎসে ক্যাম্পের লোকেদের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয় সে সম্বন্ধে বলেন। যদিও বিশেষজ্ঞরা গুণে বলেছেন যে প্রায় চল্লিশলক্ষ লোক এই আউশভিৎস ক্যাম্পে মারা গিয়েছে, তথাপি এই ক্যাম্পের পুর্বতন বন্দীরা বলে যে এই সংখ্যার চেয়ে বেশী লোক মারা গিছলো, কিন্তু জার্মানরা সে সব প্রমাণ লোপ করে দিয়েছে। আউশভিৎস্ দাহস্থানের সব ভস্ম নাৎসী ভিশ্চুলা ও সোলা নদীতে নিক্ষেপ করেছিল। তারা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলো ন্যায়ের দণ্ড একদিন তাদের ওপর নেমে আসবে।

প্রফেসর বলেন "মিত্রশক্তির সমবেত চেষ্টার ফলে আমরা আজও বেঁচে আছি। এ চেষ্টা সফল না হলে যে লক্ষ লক্ষ লোক আউশভিৎস ও মাইদানেক এ প্রাণ হারিয়েছে, আমাদেরও সেই অবস্থা হতো।"

প্রফেসর অনেক দলিলপত্রের দ্বারা প্রমাণ দেখান যে মানুষের দেহের অস্থি ও ভস্মও জার্মান শ্রমশিল্পের জন্যে পয়সা দিয়ে কেনা হতো।

সাক্ষীদের এজাহারের পর ট্রাইবুনাল আসামীদের বক্তব্য বলতে অনুমতি দেন।

আসামী লাইবাহেনসেল ট্রাইবুনালকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে যে সে তার উর্ধ্বতন কর্ম্মচারীর সহকারী হিসাবে নানাপ্রকার দলিলপত্রে সই করত; এই দলিলগুলিতে কি ছিলো সে জানতোনা। এখন এই দলিলগুলো দেখে তাদের বক্তব্য সম্বন্ধে আসামীর সন্দেহ জাগছে।

ম্যাকেল বলে মেয়ে আসামীটি বলে যে হত্যার জন্য মেয়েদের মনোনয়ন করে যে তালিকা প্রস্তুত করা হয় সেই তালিকা একজন ডাক্তার করেছিলো, সে মোটেই করেনি। ম্যাকেল এও বলে যে পোলদের ওপর পরীক্ষা

হয়েছে বলে সে জানেনা। ম্যাকেল বলে অপর একজন আসামী বলে যে সে কোনোদিনই সমগ্র কনশেনট্রেশান ক্যাম্পের তত্বাবধায়ক ছিলোনা।

আসামী মেরিং অস্বীকার করে যে সে কোনোদিন দুর্বল ও রুগ্ন বন্দীদের গ্যাস চেম্বার পাঠিয়েছিলো। গেহরিং ও ক্রাউস্ নামক আসামীদ্বয় বলে তারা কোনোদিনই বন্দীদের ওপর অত্যাচার বা গুলী করে হত্যা করেনি। আসামীদের বিবৃতির পর সে দিনের মতো মামলা মুলতুবী থাকে।

বিচারের ১৮ দিনের দিন সকালবেলায় আউশভিৎস ক্যাম্পের কর্মচারীদের বিচার হয়। প্রফেসর ডিমিট্রি কুদ্রিয়াভ্ৎসেভ্ যিনি নাৎসী অপরাধের অনুসন্ধানের জন্য সোবিয়েৎ কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁর সাক্ষ্য নেওয়া হয়। এই সাক্ষ্যদান কাজ প্রায় ঘণ্টা চারেক ধরে চলেছিলো। প্রফেসর বলেন "এই অনুসন্ধানের ফলে যে সব তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি সেগুলো দাখিল করার আগে আমি সাধারণ ভাবে কিছু বলতে চাই। সোবিয়েৎ কমিশন এই তথ্য আবিষ্কার করেছেন যে যেখানে যেখানে জার্মান সৈন্যের পা পড়েছে সেখানেই রক্তের স্রোত বয়েছে, এবং মাটী শুকিয়ে মরুভুমি হয়ে গেছে। শান্তিপ্রিয় জাতিদের ওপর যে অপরাধ করা হয়েছে আউশভিৎসের অপরাধ তারই অংশ মাত্র। নাৎসী জার্মানীর পক্ষে যে সকল লোক অপ্রয়োজনীয় তাদের কিরূপ সুষ্ঠু প্রণালীতে হত্যা করা যায় আউশভিৎস তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই বিশেষ কমিশন এই তথ্য প্রমাণ করেছে যে যুদ্ধ ঘোষণা হবার বহু পুর্বেই এই সকল জাতিকে বিনাশ করার সব ব্যবস্থাই ঠিক ছিলো। এই প্রমাণ আমরা পাই হিটলারের সৈন্যদলের পশ্চাদপসরণের পর কিয়েভে প্রাপ্ত দলিলপত্র থেকে। এই দলিলপত্র থেকে বেশ বোঝা যায় যে অপরাধী নাৎসী সরকার ও হিটলারের সৈন্যদলের হাইকমাণ্ড আদেশ দিয়েছিলো এমন একটী তালিকা তৈয়ারী করবার যাতে সেই সব দেশের নাম থাকবে যারা জার্মানীর অগ্রগতির পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বা বাধাস্বরূপ।"........ ....

চতুর্দিকে অবস্থা এমন থাকে সকালে যে তখন প্রার্থনা করাটা সহজ নয়।......সকলের আগে প্রার্থনা সারত ফেলেক্।.........এত ডাকি ভগবানকে......তিনি কি নেই...আর কতদিন কন্‌সেন্‌ট্রেশান্ ক্যাম্পের এই মৃত্যুযন্ত্রণা সইবো ? ফেলেক'এর বিশ্বাস ভগবান তাঁকে বলেছে সে বাঁচবে এবং কবে....... ! প্রতিদিন হাজারে হাজারে মরছে.......আরও মরবে.... নৃশংসভাবে হত্যা হ'বে.......তবু চামচ আর রুটি নিয়ে কি ঝগড়া !.......

কি জঘন্যতা !........গ্যাস দিয়ে মারা বুড়ো আর যোয়ানদের মৃতদেহে রাসায়নিক পেন্সিল দিয়ে নম্বর লিখে শ্মশানে পাঠানো.......আর অন্যান্য কাজ !!........

আর্দালিটি অম্লান বল্‌তো ইহুদীগুলো ত মরবেই ওদের আর মার্গারিন খাইয়ে জিনিষ নষ্ট করা কেন। তা'র দাঁড়ি কামাতে কামাতে ইহুদী ক্যামিওনের শিউরে উঠ্‌ত। মৃত্যুপথযাত্রী তার কত ইহুদী আত্মীয়কে সে নিজের হাতে চুল কামিয়েছে !!

ক্যামিওনের ফেলেক্'কে জিজ্ঞেস করত—এটা কি ন্যায়বিচার চলছে ? ফেলেক্ বল্‌ত অতীতে ইহুদীরা কত পাপ করেছে—শাস্তি হ'বে না ? ক্যামিওনের তীক্ষ্ণভাবে বল্‌ত—"তুমি শিক্ষিত একজন ব্যারিষ্টার হয়ে আমার মত একটা সামান্য নাপিতকে এই কথা বল্‌ছ ?" মনে মনে ভাবত তাদের মত কুচোকাচা ইহুদীদের হিট্‌লার নিঃশেষ করলেও বিলাত-আমেরিকার জাদরেল ইহুদীরা ত থাকবে—তারাই এর প্রতিকার একদিন চাইবে।

ইয়ান মুসদফ শুধু শুন্‌ত। সে ছিল যুদ্ধপূর্ব পোলাণ্ডে ফ্যাসিপন্থী জাতীয় র‍্যাডিক্যাল দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তা'র পাশের তাকে

শুতো বেলজিয়ান্ সোশাল ডেমোক্রাট—এমিল জ্যানসেন্। সে ছিল আইনসভার প্রাক্তন সভ্য এবং স্পেনে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে লড়েছিল। কিছুটা মোহ ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে ছিল। মুসদর্ফ জার্মান ফ্যাসিবাদের সমর্থক ছিল। সে ছিল ক্যাথলিক ও ইহুদী বিরোধী।

ইওজেক্ বল্‌তো ক্যাম্পে সকলকে এক করতে হ'বে নয়া-হুনদের বিরুদ্ধে। মুসদর্ফ বলতো, সে আগে পোলদের সাহায্য করবে কিন্তু ইহুদীদের করবেনা। তবে এটা বুঝতে পারে যে ইহুদীদের বিরুদ্ধে কিছু করা ঠিক হবেনা। এই হোলো চুক্তি আমার সঙ্গে। বন্দী ডাক্তার ডি. চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাদবিচার করতে চাননা কিন্তু ইহুদীদের দুচক্ষে দেখ্‌তে পারতেননা। ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। জার্মান সহবন্দীদের তিনি ঘৃণা করতেন। চেক্‌দের অপছন্দ করতেন, ফরাসীদের বাজে বলতেন আর অষ্ট্রীয়ানদের বিশ্বাস করতেননা। মুস্‌দর্ফ যেহেতু পোলিশ-জনজীবনের একটি চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করতেন, তাই তাঁর পরিবর্তন আমাদের ভাল লাগ্‌ল। তাঁকে দেখিয়ে ডাক্তারসাহেবকে নিরস্ত করা গেল অন্ধ ইহুদী বিরোধিতা থেকে।

ক্যাম্পে যা'রা অসুস্থ তারা রোজ সুস্থ থাকার ভাণ করত। তা না হ'লে গ্যাস দিয়ে মারা হ'ত। একদিন একটি যোয়ান সুস্থ ছেলেকে অসুস্থ প্রমাণ করে তালিকাভুক্ত করা হোল গ্যাস দেবার জন্য। আমরা কিছুই করতে পারলামনা। যুবকটির কি কাকুতিমিনতি..........কি হৃদয়বিদারক সে দৃশ্য। মুসদর্ফ অনেক চেষ্টা করেও তা'কে বাঁচাতে পারলনা। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পেশীবহুল যুবকটিকে নিয়ে গেল আরও অনেকের সঙ্গে গ্যাসকুঠুরিতে। খুব অল্পলোকই চেঁচামেচি করত। বাকি সকলে নির্বিকার—মৃত্যু আর জীবনের সমস্ত তফাৎ তারা হারিয়ে ফেলেছে। নির্বিকারভাবে তারা মড়া ঠেলেছে। তারপর নিজেরা গ্যাসকুঠুরিতে গিয়ে ছাই হয়ে গেছে।........মুসদর্ফ মুখ ঘুরিয়ে নিল................মুখে তার এ কি ভাব। তারপর থেকে তার অবস্থা অন্যরকম। ক্যাম্পে এখন "লাল"দের সঙ্গে অন্য মতাবলম্বীদের সন্ধি। মুস্‌দর্ফের নামে ক্যাম্প-গুপ্তচরের কাছে তারই স্বজাতীয় জেনেক্ লাগাল এই বলে যে মুসদর্ফ

ইহুদী আর সাম্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। মুস্দর্ফ শুধু মন্তব্য করেছে— "কি ভাবেই মানুষ হয়েছে জেনেক্" !! তারপর একদিন মুস্দর্ফকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুলী করে মারল। ক্যামিওনের দেখল অন্যান্য মড়াগুলোর সঙ্গে মুস্দর্ফের মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলা হোল লরীতে। নিরীশ্বরবাদী ক্যামিওনের মুস্দর্ফের আত্মার শান্তি কামনা করল।

"ইয়ান্ মুস্দর্ফ-এর সন্ধি"
তাদিয়ুশ খলুই

খাস্ আউশভিৎজ্ শিবির যেখানে অবস্থিত ছিল সেখানে একটা প্রকাণ্ড সংগ্রহশালা গড়ে উঠ্ছে। অবশ্য একে শুধু সংগ্রহশালা না বলে স্মৃতিমন্দির বলাই ঠিক।

এ ধরনের কথা উঠেছে যে, এখানে "শিশু সহর" এর মত করে জীবন্ত স্মৃতিমন্দির গড়ে তোলা হো'ক যেখানে কারিগরি বিদ্যালয় ইত্যাদি থাকবে।

মানুষকে সত্যটুকু দেখালেই যথেষ্ট। আর ঠিক এই কারণেই আউশ্ভিৎজ শিবির যেমন ছিল ঠিক তেমনি রেখে দেওয়া উচিত। কঠোর সত্য এখানে স্বতোদ্ভাসিত। বিয়োগান্তক, বিষাদময় এই সব তথ্যকে সংযোজিত করা বা জোর করে ফুল ফোটাবার মত করে কৃত্রিমভাবে ফুটিয়ে তোলার কোনো সার্থকতাই নেই। অনেক সময় কোনো মৌলিক শিল্প-সৃষ্টিও নির্মম বাস্তবতার উদ্ভাসকে দুর্বলই করে। তাই এই ভ'বে "এফেক্ট" সৃষ্টি করতে গেলে এই জায়গার ছন্দপতন ঘটাবে ও এর গম্ভীর আবহাওয়ায় ব্যাঘাত আনবে।

সংগৃহীত দ্রষ্টব্যগুলি সংগ্রহশালায় ঠিকভাবে সাজালে দর্শকরা অভিভূত হয়ে পড়ে, এবং দুঃস্বপ্নের নিদারুণ জগতে চলে যায়। এসব, দুঃস্বপ্ন একদিন সত্যিই এখানে বাস্তব ছিল। কিন্তু শুধুকি তাই! অতীতের সেই বীভৎসতার এ শুধু অস্পষ্ট ছবি। একটা মোটামুটি ধারণা এর থেকে দানা বাঁধতে শুরু করে; শুধু সবে সেই জগতের আঁচ হতে থাকে। সে বাস্তবতার দরজা তখনই খুলে যায়, যখন বার্কেনাউ'র পাহারা-চৌকি থেকে সামনের বিশাল শিবিরশ্রেণীরদিকে চেয়ে দেখি, যখন চেয়ে দেখি সেই শিবির শ্রেণীর পেছনে সারি সারি ভাঙ্গাচোরা চিম্‌নির দিকে;

আর যখন সেই বিশাম শিবিরশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী পথদিয়ে চলতে থাকি। সে পথ আজ নরস ঘাসের গালিচায় ঢাকা এবং তার মাঝে নামনাজানা ফুলেরা করুন গাথা গেয়ে চলেছে।

এমন অনেকে আছেন যারা এই ঐতিহাসিক স্থানের এইভাবে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দিহান। তাদের সম্পর্কে বলবো হয় তারা এই পবিত্র স্থানে আসেননি আর না হয় তারা তাদের মনস্তাত্বিক মূঢ়ভাবে অস্বীকার করবার জন্যই এই ধরণের সন্দেহ প্রকাশ করেন।

যেসব লোক তেমন অনুভূতিশীল নয়, যারা এসব ব্যাপার তেমন অনুভব করতে পারেনা, তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, তারা যেন কখনও নিজেদের ধরণধারণ অন্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে না চায়। আগামী কালের দুনিয়া একে অন্যভাবে বিচার করবে। তথ্য যদি কালজয়ী হয় তবে বলব আজকের দুনিয়াই এর ভিন্ন পর্য্যালোচনা করতে সুরু করেছে।

পূর্বতন আউশ্ভিৎজ্ শিবিরের স্থিতিস্থল আগামীদিনের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হবে, সারা দুনিয়া থেকে এখানে লোক আসবে।

সুতরাং এতে আর একটি সমস্যার উদ্ভব হবে। তা হ'ল বহিরাগত দর্শকদের স্থান করে দেওয়ার মত যাত্রীনিবাসের ব্যবস্থা করা। স্বভাবতই এই মাটির উপর প্রচুর যাত্রীনিবাস, হোটেল ইত্যাদি গড়ে উঠবে। এই গড়ে ওঠার ব্যাপারটিকে খুব ভাল ভাবে মর্য্যাদা সম্পন্ন উপায়ে বিচার করতে হবে ; যাতে এই স্থানের গাম্ভীর্য্যপুর্ণ মহিমা ক্ষুন্ন না হয়।

এই ঐতিহাসিকভূমি নাৎসী নৃসংশতার এক জঘন্য নিদর্শন। জার্মানরা সত্য গোপন করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিল। সেই কারণে তারা চলে যাবার আগে, শবচুল্লিগুলিকে বোমা দিয়ে বিধ্বস্ত করে দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ সত্যকে অনন্তকালের জন্য জাগরুক করে রাখতে হবে। তাই এর মধ্যে অন্তত একটা শবচুল্লিকে সমগ্র বন্দীনিবাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে আগের মত অবস্থায় পুনর্নির্মিত করা উচিত। দুনিয়ার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যাতে এখানে এসে দেখতে পায় যে সমগ্র ইউরোপের উপর রাজনৈতিক প্রভুত্বকামী নাৎসীদের অপরিহার্য্য অস্ত্র মৃত্যুর কারখানা' কি বস্তু। পশ্চাদপসরণ করবার সময় নিজেদের অপরাধের 'চিহ্ন তারা মুছে ফেলতে চেয়েছিল। তারা নৃসংশতাকে রূপকথায় পর্য্যবসিত

করতে চেয়েছিল যাতে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কোনোদিনই এর রহস্যোদ্ধার করতে না পারে। শবচুল্লির পুনর্গঠন তাদের সে অভিসন্ধিকে নিষ্ফল করবে। প্রভাত সূর্য্যের মত প্রতিভাত হবে যে, "মৃত্যুর কারখানা" ছিল নিষ্ঠুর সত্য—রূপকথা নয়—।

"সংগ্রহ শালার প্রকোষ্ঠগুলিতে যে সব অবশিষ্টাংশ সংগৃহীত হয়েছে তা ঐতিহাসিক; তার বিহ্বলকারী সত্যপ্রকাশনীশক্তি স্বতোৎসারিত। যেমন ১ নম্বর ঘরে দাঁতমাজার বুরুষ এর বিশাল স্তূপ, তারপর ছোট ছোট কাঁচি, বিভিন্ন ভাষায় ছাপ মারা জুতার কালির কৌটা, দাঁড়ি কামাবার ক্ষুর এবং বুরুষ, খালি সুটকেশ, এবং এই ধরনের বহু জিনিস। একটা ব্যারাকের সারাটা মেঝে বুট্‌জুতোর পাহাড়। এতো উঁচু যে উপরে চড়তে গেলে মইয়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সব চেয়ে ভাষাপূর্ণ হচ্ছে শিশুদের জামাকাপড় ও কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি। সেগুলি গ্যাস কুঠুরিতে পাঠাবার আগে বিকলাঙ্গদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। অন্য আর একটি ঘরে রক্ষিত আছে নিহত মেয়েদের চুল। অবশ্য অবশিষ্ট সামান্য চুলই আমরা এখানে দেখতে পাই। কারণ জার্মান কর্তৃপক্ষ ওই চুল গদীর ভিতর ভরার কাঁচামাল হিসাবের ও সেনানিবাসের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করেছে। এখন এখানে মাত্র ৪,৪০০ পাউণ্ড মনুষ্যকেশ রাশিকৃত হয়ে পড়ে রয়েছে।

সংগ্রহ শালায় উৎকীর্ণ করা কিছুই নেই। নীরবতা এখানে গভীর অর্থপূর্ণ। তথ্য যেখানে মুখর সেখানে কোনো লিখিত পরিচিতি অপ্রয়োজনীয়। প্রত্যেকটি দাঁত মাজা ব্রাশ, প্রত্যেকজোড়া জুতো, একজন হতভাগ্যের জীবনদীপ নির্বাপিত হওয়ার করুণ ইতিহাস ব্যক্ত করছে। সুরুচি ও বাস্তববোধের সঙ্গে এই সাজানো সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। একটি ব্যারাকের ভূনিম্নস্থ ঘরকে অস্থি-গুহায় (catacomb) পর্যবসিত করা হয়েছে এবং শবচুল্লী ও মৃত্যু-খাদ থেকে সংগৃহীত ছাই সেখানে সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। অন্য আর একটি ব্যারাকে আছে আউশ্‌ভিৎচ শিবিরে নিহত বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর প্রতীক চিহ্ন।

—"আউশ্‌ভিৎজ্‌ সমস্তা"
স্তানিস্লাভ্‌ ভোমা